বামনের চন্দ্রস্পর্শাভিলাষ

প্রথম পর্ব

রীডার্স কর্নার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ—রাসপূর্ণিমা, ১৩৬৩

প্রচ্ছদ

শ্রীসমর দে

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

গৌ র চ ন্দ্রি কা

কোনোকালেই ভাবিনি যে লেখক হব, আমার লেখা পত্রপত্রিকায় বেরোবে এবং উঠতি লেখকের যেটা স্বপ্ন, বই বেরোনো, তাই সম্ভব হবে। অন্যান্য সব আর্টের মতোই লেখাও একটা সাধনা—মনন-চিন্তন করবার বিষয়—তাতে আমার কোনো আগ্রহ, সময় বা স্বভাব-দক্ষতা ছিল না।

কিন্তু জীবনের একাত্তরটা বছর পেরোতে গিয়ে বহু বিচিত্র ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয়েছি, বহু বিচিত্র অথবা অসাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে, অনেক অবিস্মরণীয় স্থান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, যার সংখ্যাতীত স্মৃতিগুলির মধ্যে কতকগুলি রোমাঞ্চকর, কতকগুলি কৌতুকাবহ, কতকগুলি সুখদায়ক, আবার কতকগুলি বেদনাবিধুর। অভিজ্ঞতার পরিমাণ এতটাই যে, তার থেকে অনায়াসে এরকম দু'তিনটে বই বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু লিখবে কে?

ভালো গানবাজনার মতো ভালো লেখার ক্ষমতাকেও বহু পরিশ্রমে শান দিতে হয়, উন্নত করতে হয় তার প্রয়োগকৌশল এবং প্রকাশভঙ্গিকে, যেটা করবার সাধ্য বা সময় আমার ছিল না, আগেই বলেছি। তবে স্মৃতিগুলিকে রোমন্থন করবার যে বিস্তৃত ক্ষেত্র, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, সেটার মধ্য দিয়ে তাঁদের কাছে মধ্যে মধ্যে এগুলিকে উপস্থিত করেছি। অনেকেই আমাকে বলেছিলেন এই অভিজ্ঞতাগুলি লিপিবদ্ধ করতে, কিন্তু সময় ছিল না। তার ওপরে, যে লিখবে সে জন্মভীরু লোক, কোনো ব্যাপারেই সাহস করে এগোবার ক্ষমতা তার নেই। যে কোনো ব্যাপারে এগোতে গেলেই 'হবে না, পারব না'-র ধাক্কায় অচল হয়। মেয়েদের দেখলে রোমাঞ্চিত হয়েছে কিন্তু তারপরে আর একপাও অগ্রসর হবার হিম্মত ছিল না। গানবাজনা ও চাকরির ক্ষেত্রেও তাই, বুক ঠুকে

ধাক্কাধাক্কি করে এগিয়ে চলার ক্ষমতা তার নেই। লেখার ব্যাপারেও এই নির্জীবত্ব আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, প্রকাশকদের কাছে কিছু কিছু উঠতি লেখকের যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়, তার গল্প শুনে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতাম।

এই প্রস্তরীভূত অবস্থা থেকে আমাকে অহল্যা-উদ্ধার করলেন 'দিশা সাহিত্য' পত্রিকার কর্ণধারবৃন্দ। তাঁদেরই ধাক্কায় আমি কিছুটা চলমান হলাম। এখন কতদূর অবধি গড়াই সেটাই দেখার। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই।

উপসংহারে বইটির উৎসর্গের কথা। এতগুলি মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, দু-একজনের নাম করে থেমে গেলে অন্যায় হবে। আমার বাবা-মা, সংগীতগুরু, দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরুবৃন্দ, আমার পরিবারবর্গ, আত্মীয়স্বজন, বিশেষ করে আমার পিসতুতো ভাই সোমেশ রায়, যাঁর আঁকা স্কেচগুলি 'দিশা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় লেখাগুলির শ্রীবৃদ্ধি করেছিল, তা ছাড়া বহু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও হিতাকাঙক্ষী (যথা কুমারদা, বুদ্ধদেব গুহ মহাশয়) এঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী। তাই এই বইটি সকলের উদ্দেশেই উৎসর্গীকৃত হল।

বিষয়সূচি

প্র থ ম প রি চ্ছে দ

পূর্ববঙ্গ ও বিহার

বাবা-মা তাঁদের সাড়ে তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ১৯৩৭ সালের এক মিউজিক কনফারেন্সের প্রেক্ষাগৃহে, সংগীতরসে সিক্ত করার জন্য। স্থান: অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর শহরের টাউন-হল-জাতীয় একটি ঘর। কনফারেন্সের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন চিরস্মরণীয় সংগীতাচার্য জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। তাঁর অমৃতকণ্ঠের সংগীতসিঞ্চনে ছেলের কানে সা-রে-গা-মা'র অঙ্কুরোদগম যদি হয়—এই বোধহয় বাবা-মায়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

কিন্তু ফল হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ছেলে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদকে বলল, "চুপ করো! অত চ্যাঁচাচ্ছো কেন?"

কণ্ঠস্বর যথেষ্ট জোরালো হয়নি বোধহয়, সুতরাং কথাটা কারোরই বোধগম্য হল না। কিন্তু ছেলে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে নিজের বসবার চেয়ারটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিগুণ জোরে বলল, "বললাম না, চুপ করো! তবুও গোলমাল করছো?"

এবার জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তাকিয়ে দেখলেন। ব্যাপারটা অনুধাবন করে মুচকি হেসে আবার গাইতে লেগে গেলেন। কিন্তু শিশুশ্রোতাটিকে তার মা তৎক্ষণাৎ ছোঁ মেরে হলের বাইরে নিয়ে এলেন; কানমলা এবং চড়ও দু-একটা নিশ্চয়ই জুটেছিল তারপরে।

এই হল সংগীতের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। এবং পরিচয়। অধিকাংশ সংগীতশিল্পীরই বংশে বহুদিন প্রবহমান সংগীতের ধারা থাকে, থাকে জন্মাবধি ধমনীতে সংগীতের স্রোত। সেদিক থেকে বলার মতো আমার কিছুই নেই।

এটুকুই বলার আছে যে, আমার পিতামহ গানবাজনার নাম শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। পেশায় ছিলেন উকিল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, জাহান্নামে যাবার সব

থেকে সোজা রাস্তা হচ্ছে গানবাজনা। কেমন করে জানি না, বোধ হয় ঠাকুমার দিক থেকে আমার বাবার সংগীতের প্রতি কিছুটা আকর্ষণ ছিল। কিন্তু গান শেখা দূরে থাক, বাবা কোথাও গান শুনতে গেছেন জানতে পারলেই ঠাকুরদা প্রচণ্ড প্রহার সহযোগে ছেলের দেহ-মন থেকে সংগীতের হলাহল নিষ্কাশনে লেগে যেতেন। আমাদের কুষ্ঠিয়ার বাড়ির বারান্দার কোণায় একটি বয়োবৃদ্ধ জবাফুলের গাছ ছিল। তার অফুরন্ত ডালের এক-একটিকে উৎপাটন করে বাবার পিঠে ভাঙতেন তিনি।

বড়ো হয়ে কুষ্ঠিয়ার বাড়ির সেই জবাগাছটিকে আমি দেখে এসেছি। বলে এসেছি— "তোমার মাধ্যমে বাবা যে-কষ্ট পেয়েছিলেন, তার কথা মনে করেই বোধ হয় তিনি আমার সংগীতশিক্ষায় বাধা দিতে পারেননি। তোমাকে প্রণাম জানাই।"

যাই হোক, আমার গানবাজনার খানদানের কথায় ফিরে যাই। এর পরের পর্ব বছর-দেড়েক বাদে। বরিশাল শহরে। আমার বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে। কর্মোপলক্ষে তাঁকে মাঝে-মাঝেই স্থান পরিবর্তন করতে হত। সেবারে বদলি হয়ে এলেন বরিশালে, এসেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রথায় খুঁজে বার করলেন স্থানীয় গাইয়ে-বাজিয়েদের এবং প্রায়ই আমাদের বাড়ির বৈঠকখানায় সংগীতের বৈঠক হতে থাকল। এখানে আমার মায়ের একটু সেতার বাজাবার শখ হয় এবং ওস্তাদ এনায়েত খাঁর শিষ্য বা প্রশিষ্য কোনো একজন সেতার-শিক্ষক আমাদের বাড়িতে আসতে শুরু করেন। আর যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে দুই ভাইয়ের কথা মনে পড়ে, নাম পরে বলব। একজন বাঁশি বাজাতেন আর তাঁর ছোটোভাই তাঁর সঙ্গে তবলা সংগত করতেন। এই বাঁশির সুরও আমার মনে কতটা সংগীতপ্রেমের উদ্রেক করেছিল তা নিতান্ত সন্দেহের বিষয়, কিন্তু অন্য প্রকারের একটি বাসনা আমার মনে প্রবল আকারে দেখা দিল।

একদিন মায়ের সঙ্গে রথের মেলায় গিয়ে একটি বাঁশি কেনার বায়না ধরেছিলাম, কিন্তু ক্রমাগত তাতে মুখ দিতে হয়, সুতরাং অস্বাস্থ্যকর বলে মা কিছুতেই কিনে দিলেন না। এই ক্ষোভ আরো তীব্র আকারে দেখা দিল যখন দেখলাম যে 'বাঁশি-বাজানো-কাকাবাবু'র বাঁশি মোটে একটা নয়, বারো-চোদ্দোটা, একটা বাক্সভর্তি, আর আমার কিনা একটাও নেই? এ কী অন্যায়!

একদিন আর থাকতে পারলাম না। ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বলেই ফেললাম, "আপনার তো এতগুলো বাঁশি আছে, আমাকে একটা দেবেন?"

আমার মায়ের প্রবল আপত্তি, আমার অসভ্যতার জন্য তিরস্কার, লাঞ্ছনা—সবই বর্ষিত হল, কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে একটা বাঁশি দিয়ে দিলেন। মাকে বললেন, "বউদি, বাচ্চাটাকে আর বকাবকি করবেন না।"

সেই দাতা এবং দান দুটির কোনোটিরই মূল্যায়ন করার বয়স তখন আমার হয়নি। এই ভদ্রলোকই ছিলেন পান্নালাল ঘোষ। উত্তরকালে ভারতের অনন্যসাধারণ বংশীবাদক, বাঁশিকে যিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যান। আর তাঁর ভাই হচ্ছেন তবলা-শাস্ত্রজ্ঞ সংগীতাচার্য নিখিল ঘোষ। নিতান্তই দুঃখের বিষয়, বড়ো হয়ে পান্নালালবাবুর দেখা আর পাইনি। বাবা-মায়ের সঙ্গে তাঁর কয়েকবারই দেখা হয়েছে, প্রত্যেকবারই তিনি

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

পান্নালাল ঘোষ

আমার খোঁজ নিয়েছেন, কিন্তু আমার আর সুযোগ হয়নি তাঁর পাদস্পর্শ করবার।

বরিশালে প্রায় আড়াই বছর ছিলাম, তার মধ্যে এই দুই সাংগীতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয় ছাড়াও আরো দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমটি হচ্ছে পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় আমার উপনয়ন। বরিশাল এবং তারপরে ঢাকা-ময়মনসিংহ, এই দুটি জায়গার ভাষায় সামান্য তফাত থাকলেও মূলত সবই পূর্ববঙ্গের ভাষা, একই গাছের ডালপালা। খেলার সঙ্গীরা অধিকাংশই স্থানীয় লোকের ছেলেমেয়ে, তাদের সাথে মিশে আমার মুখ দিয়েও সেই ভাষা বেরোতে লাগল অল্পদিনেই। পরে ময়মনসিংহে গিয়ে সে-ভাষা এবং উচ্চারণ আরো পুষ্ট হল। এই ভাষাচর্চার আর-একটি জায়গা ছিল বরিশালের নদীর স্টিমারগুলি, যেগুলি প্রায়ই চড়তাম কলকাতা যাতায়াতের সময়। দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল আর একজন বিশাল ব্যক্তির দর্শনলাভ, অবশ্য দূর থেকে। তাঁর খ্যাতি ছিল গানবাজনায় নয়, অন্যদিকে।

এই স্টিমারে চড়ে বরিশাল থেকে খুলনা যাওয়া অথবা ফেরত আসার সময় (প্রায় বারো ঘণ্টা) সারা স্টিমার চষে বেড়িয়ে মাল্লা-খালাসি-ইঞ্জিনম্যান সকলের সঙ্গে আড্ডা মারা আমার কাছে এক বিশেষ লোভনীয় ব্যাপার ছিল। অবশ্য একা-একা নয়, আমার উৎকলবাসী পাহারাদার আনন্দদার কড়া নজরে। এই মানুষগুলি বড়ো-ছোটো যে-কাজই করুক না, নিজের কাজের প্রতি তাদের একটা সম্মানবোধ ছিল। ইঞ্জিনম্যানকে বললাম, "আমাকে ইঞ্জিন দেখাও না!" সে তো মহাখুশি। আমাকে যতটা সম্ভব উঠন্ত-পড়ন্ত সুপুরিগাছের গুঁড়ির মতো স্টিলের ডান্ডাগুলির (পিস্টন রড) কাছে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জিন বোঝাতে লাগল। একতলার ডেকের সামনে নোঙর তোলবার-ফেলবার যে ক্যাপস্ট্যান, তার চার্জে যে-খালাসিটি আছে তাকে ধরে আরো কিছু সময় বকবক করে কাটল। বিশাল বয়লারে যে লোকটা কয়লা দিচ্ছে, সে মধ্যে মধ্যেই অন্য সব খালাসিদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, "আস, আস, এইহানে খারাইয়া চুল্লিতে দুই ব্যালচা কয়লা দ্যাও, দেহি কার কত হিম্মত।" তারপরে স্টিমারের সম্রাট সারেং সাহেবের কোঠায়, যেখানে বিরাট

কাঠের চাকা ঘুরিয়ে স্টিমারকে ডানদিক-বাঁদিক ঘোরানো যায়। সাধারণত বেশ প্রবীণ পক্ককেশধারী লোকই সারেং-এর পর্যায়ে উন্নীত হত। তাদের 'দাদু' বলে সম্বোধন করলেই তারা বিগলিত—"আস, আস, খোকাবাবু, জাহাজ চালাইব্যা?" স্টিয়ারিং ঘোরাবার ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু ক্ষমতা বিলক্ষণ ছিল একটা দড়ি ধরে টানবার, যেটা টানলে স্টিমারের নাড়ি-কাঁপানো বাঁশি বেজে ওঠে। সুতরাং দাদুকে প্রচণ্ড খোশামোদ করে একবার-দুবার ওই দড়ি আমাকে টানতেই হবে। যখন-তখন বাঁশি বাজানোর নিয়ম ছিল না মোটেই। প্রত্যেকটা বাঁশির একটা-না-একটা কারণ ছিল, মানেও ছিল। একমাত্র সামনে কোনো অসাবধানী নৌকো দেখা গেলে তবেই সারেং-দাদু এই কীর্তিটি করবার অনুমতি দিতেন।

একবার খুলনা থেকে কলকাতায় আসছি। রাত্তিরের খাবার সময় হয়ে এসেছে। এই স্টিমারগুলি ছিল ব্রিটিশ কোম্পানির, সুতরাং সাহেবদের আরামের সব ব্যবস্থাই ছিল, যথা—ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস কেবিন এবং একটি রাজকীয় ডাইনিং রুম।

ডাইনিং রুমে গিয়ে দেখি শেরওয়ানি এবং ফেজ-টুপি-পরা বিশালবপু এক ভদ্রলোক একটা টেবিল একাই দখল করে বসেছেন। বাটলার-বেয়ারা সকলে তাঁকে ঘিরে কলরবে মুখর। এবং এমন পরিমাণে খাদ্যবস্তু তাঁর টেবিলে জমা হয়েছে যা দেখলে মনে হয় আমাদের কারো বোধহয় আর খাওয়া জুটবে না।

ভদ্রলোকের সামনে এক প্লেট-ভর্তি চিংড়ির কাটলেট। একটির পর একটিকে ল্যাজে ধরে মুখে চালান করছেন এবং বাটলারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ খোসগল্প করছেন বিশুদ্ধ পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় :

—ইদ্রিস, তর ছাওয়ালডা অহন মাদ্রাছায় পড়তে লইছে?

—আর কইয়েন না হুজুর, ছাওয়াল নয়, এক্কেরে ইবলিসের বাচ্চা। দিনভর গাছে-গাছেই থাকে। কিতাব ছোঁয় না, কয় ওই প্যাচমারা ল্যাহা পড়তে পারুম না। আমারে হদ্দ কইরা দিছে হুজুর।

—এ ইস্টিমারের সারেং কেডা?

—ফকরুদ্দিন হুজুর। অহনি আইত্যাছে আপনারে সালাম করনের লাইগ্যা।

ফকরুদ্দিন আভূমি ঝুঁকে সেলাম জানাতেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "কী রে ফকা, সারেং হইছস, আমারে খবরডা দিলি না?"

—এই হালেই হইছি হুজুর, দুই হপ্তা আগে। তারপরে আইজই আপনি আইলেন। আমি অহন বিরিজে যাই হুজুর। ঝালকাঠি আইয়া গেলে জাহাজ ভিড়াইতে লাগবো। আবার মোলাকাৎ করুম।

ঝালকাঠি খুলনা আর বরিশালের মধ্যবর্তী একটি স্টিমার স্টেশন। জাহাজ ভিড়বামাত্র জেটিতে লণ্ঠন-হাতে জনাকতক লোক "বড়োমিঞা আইছেন নি, বড়োমিঞা আইছেন নি" বলে চেঁচাতে লাগল। বড়োমিঞা চেয়ার ছেড়ে উঠে রেলিং-এর ধারে গিয়ে বললেন, "হ, হ, আইছি আইছি।" শোনামাত্র তারা দুড়দাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ডাইনিং হল-এ চলে এল। একজনের হাতে পেল্লায় একটি টিফিন কেরিয়ার।

—খানা আনছ বুঝি? এই তো খাইয়া ওঠলাম।

—দরিয়ার হাওয়া, দেইখ্যান, একঘণ্টা বাদে আবার ক্ষুদা পাইবো।

—ঠিক আছে, থুইয়্যা যাও। ফিরতি ইস্টিমারে ইদ্রিসের (বাটলার) থিকা লৈয়া লৈবা। এখন কও দেহি তোমাগো হাল-হকিকত।

অনন্তর ঝালকাঠির বাসিন্দাবৃন্দ এবং বড়োমিঞার মধ্যে হাল-হকিকত সম্বন্ধীয় কথোপকথন যা হতে লাগল, তা এইরকম :

—রমজানের ছুটু মাইয়াডার শাদি হইয়া গেছে মহরমের পরে-পরেই।

—সেলিমের লগে তার ফুফার মামলা বাধ্‌ছে, জমির ধারের ছয়ডা নাইরএল গাছ আর চাইরড্যা সুআরি গাছ লৈয়া। এ কয় গাছ আমার, ও কয় গাছ আমার। কেউরেই কেউ ছারান দিব না।

—বসিরের তিনডা বক্‌রি ওহাইব্যার (ওয়াহাব) ক্ষ্যাতে ঢুইক্যা পরছিল, ওহাইব্যা তাগো বাইন্ধা থুইছে, আর ফিরৎ দেয় না। কয়, সামনের ঈদে কোরবানি দিব।

—নকু বাইদ্যারে ইরফান হাটের মাঝে বাপ-মা তুইল্যা গালি দিছিল, নকু রাইত্রকালে হাঁরি কইরা কেউইট্যা সাপ আইন্যা ইরফানের জানালা দিয়া গলাইয়া দিছে। আল্লার মেহেরবানিতে সাপ কেউরে কাটতে পারে নাই। খুব বাইচ্যা গেছে! নকু ফেরার।

—নাসিমের ছাওয়ালেরে ন্যাবায় ধরছে। হেকিমের দাওয়াই কুনো কাজের নয়। সদরে নিয়া গিয়া হাসপাতালে দেখাইতে কই, তয় যদি বাচে।

—ঝগড়া-কাইজ্যা করতে করতে মকবুলের বিবি তার কান কামরাইয়া ধরছিল। মকবুল তারে তালাক দিছে।

অমৃতবর্ষী ভাষায় এই কথোপকথন চলতে চলতে অকস্মাৎ জাহাজের বাঁশি বেজে উঠল, এবার ছাড়বে। ঝালকাঠির দল আদাব করে দুড়দাড়িয়ে নেমে গেল।

আমাদের খাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে, আমরা উঠব-উঠব করছি, এমন সময়ে

শৈশবে সবাই আমাকে হাঁ-করা ছেলে বলেই জানত

ফজলুল হক সাহেব

বড়োমিঞা বিপুল বিক্রমে টিফিন কেরিয়ারকে আক্রমণ করলেন, দরিয়ার হাওয়া ঘণ্টাখানেক খেয়ে "ক্ষুদা" বাড়াবার অপেক্ষা না-করেই।

মা স্বগতোক্তি করলেন, "ভদ্রলোকের সমস্ত শরীরটাই একটা বিরাট পেট।" আমরা তাড়াতাড়ি ডাইনিং হল থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

পরে বুঝতে পেরেছিলাম এই ভদ্রলোক ছিলেন তৎকালীন বাংলার রাজনীতিতে সুবিখ্যাত মানুষ আবুল কাশেম ফজলুল হক বা সংক্ষেপে এ. কে. ফজলুল হক। বরিশালের মুকুটহীন সম্রাট। বহুদিন মন্ত্রী ছিলেন এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও (তখন অবশ্য প্রধানমন্ত্রী বলা হত) হয়েছিলেন। তাঁকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল 'শের-ই-বঙ্গাল' বা বাংলার বাঘ। বাঘই বটে!

নেতা বহু রকমের দেখা যায়, ইনি ঠাণ্ডাঘরে-বসা বিলিতি গাড়ি-হাঁকানো নেতা ছিলেন না, নিজের দেশের মানুষগুলির জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে গিয়েছিলেন এবং তাদের কেউ নিপীড়িত হলে সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করতেন। তারাও তাঁর জন্য জান লড়িয়ে দিত।

নদীমাতৃক বরিশাল ছিল পূর্ববাংলার শস্যভাণ্ডার। কলকাতা আসতে গেলে কোনো রেললাইন ছিল না, ছিল বিশাল বিশাল কয়েকটি স্টিমার। তাদের নাম এখনো মনে আছে—Florican, Garo, Mikir, Kiwi ইত্যাদি। তাতে চড়ে খুলনায় গিয়ে সেখান থেকে কলকাতার ট্রেন—তার নাম বরিশাল এক্সপ্রেস। অথবা ঢাকা। সেখান থেকে ময়মনসিংহ ইত্যাদি জায়গা। এই স্টিমারগুলো এবং তাদের মুরগির ঝোল-ভাত চিরকালের প্রবচন হয়ে আছে—আমি আর নতুন করে কিছু বলছি না। প্রতিদিন বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতে গেলে দেখা যেত কোনো একটি স্টিমার খুলনা অথবা ঢাকা যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন, মালপত্র উঠছে। আর উঠছে কাঠের বাক্সে বরফ দিয়ে প্যাক করা মন-মন মাছ।

বাবা বরিশাল থেকে ময়মনসিংহ (চলতি ভাষায় ময়মনসিং) বদলি হলেন, আমরা বাক্স-প্যাঁটরা-লটবহর নিয়ে Kiwi জাহাজে উঠে ঢাকায় নামলাম। সেখান থেকে ট্রেনে করে ময়মনসিং যাত্রা। যথারীতি ট্রেনের জানলা দিয়ে মুখ বাড়ানো, স্টিম ইঞ্জিনের ধোঁয়াবাহিত কয়লার টুকরো চোখে পড়ে হাঁউমাউ করে ওঠা, গুরুজনদের বকুনি, সবই চলতে থাকল। প্রতিটি রেলস্টেশনের নাম আমার কাছে নিতান্ত বিস্ময়ের বস্তু ছিল। অনেকগুলি নাম এখনো মনে আছে তাদের বৈচিত্র্য নিয়ে—কুর্মিটোলা, কাওরাইদ, জয়দেবপুর (বিখ্যাত ভাওয়ালের জমিদারি এখান থেকে যেতে হত) ইত্যাদি। অবশেষে ময়মনসিং, যেখানে আমার জীবনের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়—যার মধ্যে সর্বপ্রধান হল স্কুল।

স্কুল হচ্ছে ময়মনসিংয়ের নামকরা প্রতিষ্ঠান 'মৃত্যুঞ্জয় ইনস্টিটিউশন'। হেডমাস্টার (আমাদের ভাষায় হেডস্যার) চিন্তাহরণ মজুমদার। অন্যান্য মাস্টারমশাইদের উপাধি

গৌরীপুরের বাড়িতে পাখোয়াজ বাদনরত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

জানতাম না বা তার দরকারও ছিল না। সবাই স্যার। ইংরেজি-স্যার ছিলেন সুরেশবাবু, ভূগোল-স্যার ছিলেন চিন্তামণিবাবু, অঙ্ক-স্যার ছিলেন পিনাকীবাবু ইত্যাদি। তখনকার দিনে একটা ভয়াবহ ক্লাস ছিল 'ড্রিল'। নানাভাবে হাত-পা সঞ্চালন, মার্চ করা, আর ভুল হলে গাঁট্টা খাওয়া। বেশ শক্তসমর্থ লোক বেছে বেছে 'ড্রিল-স্যারে'র কাজে বহাল করা হত। এই সময়েই সুরেশ-স্যারের ইংরেজি ট্রানস্লেশন ক্লাসে আমার একটি দুর্ভাগ্য আবিষ্কৃত হয়। পেছনের বেঞ্চিতে বসে আমি সামনের ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা পড়তে পারছিলাম না। কয়েকদিন নিরীক্ষণ করে সুরেশ-স্যার সেটি আমার মা-বাবার গোচরে আনেন এবং তখন দেখা যায় যে আমার চোখ বেশ খারাপ। মাইনাস চার-সাড়ে-চার পাওয়ার। আমার তখন ক্লাস ফোর চলছে।

দুটি বিষয়ের সম্মুখীন হলেই চিরকাল আমার মস্তিষ্ক ঘেঁটে গেছে। প্রথমটি হচ্ছে অঙ্ক, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মেয়েরা।

অঙ্কের ক্লাসে সব থেকে মাথা গুলিয়ে যেত ব্র্যাকেট বা বন্ধনী নিয়ে। বলা হত Simplification করতে গেলে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ( ) কাজ আগে করবে। তারপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট { } এবং সবশেষে থার্ড ব্র্যাকেট [ ], কারণ সে সবার চেয়ে শক্তিশালী, অন্যান্য সব ব্র্যাকেটকে বন্দি করে রাখে। এটি আমার পক্ষে মানা সম্ভব ছিল না, কারণ পরিষ্কার দেখাই যেত—সেকেন্ড ব্র্যাকেটের শক্তি সব থেকে বেশি, সবসময়ই সে হাতের মাসল { } ফুলিয়েই রয়েছে। তার থেকে বেশি জোর থার্ড ব্র্যাকেটের কী করে হয়? জীবনে একটাও simplification-এর অঙ্ক 'রাইট' করতে পেরেছি বলে মনে হয় না।

মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার বেলায়ও ঠিক তাই। কীসের আগে বা পরে কী করা উচিত সেটা কোনোদিন ঠিকভাবে না করতে পেরে, ব্র্যাকেটের গোলমাল করেছি; ফলং ছত্রভঙ্গ!

যাক সে-কথা। এই সময় একদিন ক্লাসে খবর ছড়িয়ে পড়ল জার্মানির রাজা হিটলার

ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছেন। ক্লাসের অবসর সময়ে, টিফিন পিরিয়ডে আর কোনো আলোচ্য বিষয় রইল না। যুদ্ধ মানে যে কী, তার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান কারোরই না থাকায় নানারকম উপাদেয় তথ্যের পরিবেশন হতে লাগল। একজন বলল, জার্মানির তলোয়ারগুলো ইংল্যান্ডের তলোয়ারের থেকে হাত-খানেক লম্বা বেশি, সুতরাং জার্মানি জিতবেই। কে যে তলোয়ারগুলো মেপে এসেছে তার সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠল না।

তারপরে যুদ্ধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান বৃদ্ধি হলে, এই আলোচনাটা ঘুরে গিয়ে, কাদের কটা বন্দুক আছে, বন্দুকের গুলি ক-মাইল যায় ইত্যাদির ওপর গিয়ে পড়ল।

ঢাকা-ময়মনসিং-এ এবং পূর্ব ও উত্তরবাংলার বেশ কিছু জায়গায় অনেকগুলি জমিদার বংশ ছিলেন। তাঁরা অধিকাংশই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বহুলাংশে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ এবং শিক্ষাদীক্ষা ও কৃষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জমিদারের ছেলে বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে—এটা কোনো পরিবারেই হবার উপায় ছিল না। পড়াশুনো করতেই হবে (প্রায়শই M.A., B.L. পর্যন্ত), শিকার করতেই হবে, ঘোড়ায় চড়তেই হবে এবং কিছু-না-কিছু গানবাজনা করতেই হবে। এইসব বংশ থেকে বহু সংগীতসাধক ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক বেরিয়েছেন, বাংলাদেশের গানবাজনার ইতিহাসে যাঁদের দান এবং যোগদান চিরস্মরণীয়। যেমন গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর, বীরেন্দ্রকিশোর, বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী; কালীপুরের জ্ঞানদাকান্ত ও নীরদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী; ভবানীপুরের (কলকাতার ভবানীপুর নয়) জ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরী ও আরো অনেকে। ভারতের বহু বড়ো-বড়ো ওস্তাদ ও পণ্ডিত এঁদের আশ্রয়ে ও সহযোগিতায় জীবনধারণ ও সংগীতসাধনা করতে পেরেছেন। সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল, এত বড়োলোক হয়েও এঁদের জামা-কাপড়ে, কথাবার্তায়, আচার-আচরণে অহংকার ও আত্মম্ভরিতার লেশমাত্র ছিল না। আমি যে ক-জনকে দেখেছি, যে-কোনো সাধারণ মানুষের থেকে প্রথম দর্শনে তাঁদের পৃথক করা অসম্ভব ছিল।

আমার বাবা যথাসময়ে এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন এবং আমাদের 'পণ্ডিতপাড়া'র বাড়িতে শনি-রবিবার গানবাজনার আসর বসতে লাগল। বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—ওখানকার চলতি পরিভাষায় 'ছোটো হাকিম'। এইসব জমিদারেরা অক্লেশে তাঁর মতন চল্লিশজন কর্মচারী রাখতে পারতেন। কিন্তু বাবার সংগীতপ্রেমই ছিল একমাত্র qualification, যার জন্য তাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গণ্য করতেন।

ময়মনসিংয়ের গানবাজনার ব্যাপারে আর-একজনের নাম না-করলে ত্রুটি হবে—তিনি ছিলেন গায়ক পূর্ণচন্দ্র নন্দী, সকলের কাছে 'পচাবাবু' বা 'পচা ওস্তাদ' নামে পরিচিত। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরি, ভজন ও তৎকালীন বিবিধ সুগম-সংগীতের একজন আকর ছিলেন তিনি এবং সংগীত শিক্ষাদানে ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়েকে বিবাহোপযোগী করে তোলার থেকে পূর্ণাঙ্গ সংগীত শিক্ষাদান পর্যন্ত ছিল

তাঁর পরিধি। একটু সরু কিন্তু অসম্ভব জোয়ারি-সমৃদ্ধ ছিল তাঁর গলা। আমাদের কাছে গানের শেষ কথা ছিলেন তিনি।

তখনও যে আমার মধ্যে সংগীতপিপাসা বা গানবাজনা শেখার আগ্রহ খুব প্রখর হয়ে উঠেছিল তা নয়। কিন্তু অবসর সময়টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নিয়েই কাটত। সুতরাং গাঁজার আড্ডায় থাকলে ক্রমাগত গাঁজার গন্ধ নাকে যেতে যেতে যেভাবে কারো কারো গাঁজার প্রতি আকর্ষণ হতে পারে, সেইভাবে গানবাজনার প্রতি আমার interest কিছুটা দানা বেঁধে থাকবে।

একদিন পচা ওস্তাদ আমাদের বাড়িতে গান করছেন। হঠাৎ একটা প্রবল 'তান'কে 'তারসপ্তক'-এ ঠেলে নিয়ে যেতে গিয়ে তাঁর গলাটা ভেঙে একটা অসাংগীতিক আওয়াজ বেরোল। তাড়াতাড়ি জিভ কেটে পচা ওস্তাদ আমার বাবাকে বললেন, "মাপ কইর‍্যান, গলাডা দইরা গ্যাS গা।"

গ্যাS কথাটাতে S-এর ব্যবহার শ্রদ্ধেয় পরশুরামের পদাঙ্ক অনুসরণে করলাম, নইলে পূর্ববাংলার উচ্চারণ সঠিকভাবে বোঝানো অসম্ভব।

পচা ওস্তাদের এই 'তান', গলা ভেঙে যাওয়া, জিভ কাটা এবং মন্তব্যটি আমার মনে তীক্ষ্ণ রেখাপাত করল। যখন-তখন ওঁর এই ব্যাপারটা ক্যারিকেচার করতে লাগলাম। একদিন বিকেলে আমাদের বসার ঘরে আপনমনে পচাবাবুর এই ক্যারিকেচার করে উঠেছি—এই সময় প্রবল অট্টহাস্য। চমকে উঠে দেখি ঘরে ঢুকছেন বাবার বন্ধু, ভবানীপুরের জমিদার, সেতারি জ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরী।

আমাকে বললেন, "পচারে তুই গুইল্যা খাইচS। অহনে আমার স্যাতারটা ধরবি নাকি ক'!"

আমি সেখান থেকে হাওয়া।

প্রায় শনিবারই এই জমিদারবাবুরা আমাদের দরিদ্র বাড়িতে সন্ধ্যায় ও রাতে গানবাজনা করে যেতেন। আমার মা সামান্য যা-কিছু রান্না করতেন, তাই দিয়ে তাঁরা মহানন্দে কোনো-কোনোদিন আহার শেষ করে বাড়ি ফিরতেন। এই অন্তঃকরণ এবং বিনয় চিরকাল মনে রাখার ও শেখার মতো। বর্তমান দুনিয়ার দাম্ভিকতা ও হৃদয়হীনতার সম্মুখীন যখনই হই, তখনই ওই দিনগুলির, ওই মানুষগুলির কথা মনে পড়ে চোখে জল আসে, কিন্তু ওখানে তো আর কোনোদিনই ফেরত যেতে পারব না। মহাকাল সে-দিনগুলিকে নির্মমভাবে গ্রাস করেছে।

জীবনের প্রথম যে সাড়ে তিনবছর পেছনে সরিয়ে রেখে এই কাহিনি শুরু করেছিলাম সেই অধ্যায়ে এবার যাচ্ছি।

প্রদেশ বিহার, শহর ভাগলপুর, মহল্লা ভিখনপুর। সেখানে নন্দাশ্রম নামে একটি বাড়ি। তাতে বিহার হেল্‌থ সার্ভিসের ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র সেন থাকতেন। বাড়ির উলটোদিকে থাকতেন আর-এক ডাক্তার। তাঁর নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—

উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় 'বনফুল'। বয়সে তিনি কিছুটা ছোটো হলেও অবিনাশবাবুর সঙ্গে তাঁর খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল।

একদিন এক শীতকালের ভোরে বলাইচাঁদবাবুর বাড়িতে খবর গেল, অবিনাশবাবুর সেজোমেয়ের একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। তার মাথাটা একটু অস্বাভাবিক, ব্রহ্মতালুর ওপরে একটা ঢিপির মতন ফুলে রয়েছে। অবিনাশবাবু নিজেও ডাক্তার, কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন একবার দেখবার জন্য।

বনফুল গিয়ে দেখেন, বাচ্চাটা আর পাঁচটা বাচ্চার মতোই—হাত-পা ছুঁড়ছে, বিকট হাঁ করে চ্যাঁচাচ্ছে, তফাতের মধ্যে খালি মাথার উপরিভাগে একটা পিংপং বলের সাইজের ঢিপি। নবজাত শিশুদের মাথার ওপরে খানিকটা চামড়া নরম তুলতুলে থাকে, এটা অনেকেই জানেন। সেই চামড়ার তলায় কিছু একটা জলীয় পদার্থ জমে ঢিপির মতো উঁচু হয়ে আছে।

বাচ্চাটাকে দেখেই বনফুলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "বাঃ! এ তো দেখছি মাথায় চুড়ো বেঁধে এসেছে, সাক্ষাৎ বুদ্ধদেব!"

এই নামটাই আমার চিরকালের মতো রয়ে গেল। দেখেশুনে অভয় দিয়ে বললেন, "ওটা ভয়ের কিছু নয়, ক্রমশ বসে যাবে।" হলও তাই। মাথার ফোলাটা আস্তে আস্তে কমে সমান হয়ে গেল। কিন্তু বিধাতাপুরুষ বোধহয় তখনই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, মস্তিষ্কটি আজীবন ছিটগ্রস্ত থাকবে।

বনফুলের দেওয়া নামটা কিন্তু বাচ্চা বয়সে খুব স্বস্তিতে বিরাজ করেনি। একটা গুড়গুড়ে বাচ্চাকে ওইরকম গম্ভীর এবং ভারি নামে ডাকাটা গুরুজনদের অনেকেরই পছন্দ হল না, বুদ্ধদেব নামটার শেষাংশ 'দেব'টা শুধু ছেঁটেই ফেললেন না, উপরন্তু

বনফুল

জীবনসায়াহ্নে বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

প্রথমাংশটির তলায় একটি 'হ্রস্ব-উ'কার লাগিয়ে যে সম্বোধনটি তৈরি হল, হিন্দুস্তানি ভাষায় তার অর্থ 'অল্পবুদ্ধি', বিশেষ করে জাগতিক ব্যাপারে।

আমার পক্ষে খুবই সার্থক নাম। গুরুজনেরা, বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব এমনকী আমার স্ত্রীরও ধারণা তাই। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকল না। আমার স্নেহশীল মাতুলকুল কট্টর ঢাকাইয়া ছিলেন। তাঁরা আদরে আহ্লাদে জড়িয়ে নামটাকে করে তুললেন 'বুইধ্যা'। এই নামেই মামারা আমাকে চিরকাল ডেকে গেছেন। নামের এবংবিধ পিলে-চমকানো রূপান্তর সম্বন্ধে তাঁরাই অবহিত আছেন, যাঁরা নিজেরা ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ষাট-সত্তর বছরের কট্টর বাঙাল অথবা যাঁরা এই শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন।

আমি স্বকর্ণে শুনেছি, 'সত্য' হয়ে গেছে 'সইত্যা', 'জ্যোতি' হয়ে গেছে 'জোইত্যা', 'নীলু' হয়ে গেছে 'নীল্যা', 'ভানু'-'ভাইন্যা' এবং সবথেকে সাংঘাতিক 'শম্ভু' (আমার এক মামাতো দাদা) হয়েছিলেন 'শৈম্ভ্যা', যেটা উচ্চারণ করার সময়ে 'ঐ'-কারের মধ্যে একটুখানি 'উ'-এর আমেজও থাকবে। অর্থাৎ 'শউইম্‌ভ্যা', প্রাণ যায় আর কী! যদিও এই রূপান্তর আহ্লাদভিত্তিক, তবু আমার এইগুলি শোনামাত্র মনে হয় নামের অধিকারী একটি ভ্যাগাবন্ড এবং তাকে কান ধরে উঠ-বোস করাবার একটা প্রবল বাসনা এর পেছনে লেগে আছে।

মেয়েদের নামের পরিবর্তন কিন্তু যথার্থই আদরে-আহ্লাদে মাখানো ছিল। ইলা, শীলা, নীলা, বেলা-রা হয়ে যেতেন ইলু, শীলু, নীলু, বেলু। সুতরাং কোনো বাড়িতে যদি নীলু নামেব ছেলে এবং নীলা নামের মেয়ে থাকে, তবে নীলু বলে ডাকলে অবশ্যই মেয়েটি সাড়া দেবে এবং আক্ষরিক নীলুকে ডাকতে হলে 'নীল্যা' বলে চ্যাঁচাতে হবে। যাই হোক।

যে বিহারে আমি জন্মেছিলাম, সেই বিহারেই অল্পের জন্য জীবনান্তের হাত থেকে বেঁচে গেলাম বছর দেড়েকের মধ্যেই। মাতামহ অবিনাশচন্দ্র তখন চাকরিসূত্রে বদলি হয়ে মজফ্‌ফরপুরে বাস করছেন। সেখানে তাঁর সবকটি মেয়ে কিছুকালের জন্য বাপের বাড়িতে জমায়েত হতেন—একসাথে থাকার জন্য।

সেবার এমনই এক জমায়েতে খুবই আনন্দে দিন কাটছিল। অকস্মাৎ আমার পিতৃদেব ভগ্নদূতের মতো হাজির। তিনি নাকি পরে আর আসবার ছুটি পাবেন না। তাই পরের দিনই আমাকে এবং মাকে নিয়ে চলে যাবেন।

আজকালকার দিনের শ্বশুরবাড়ি হলে হয়তো জামাইয়ের এহেন অন্যায় প্রস্তাবের অল্প-বিস্তর প্রতিবাদ হত। কিন্তু তখনকার দিনে জামাইয়ের কথা ছিল হাকিমের হুকুম। মনের কষ্ট মনেই চেপে রেখে দাদামশাই-দিদিমা মেয়ে-নাতিকে বিদায় দিলেন। স্বপ্নেও ভাবেননি পরের দিন কী ঘটতে যাচ্ছে।

পরের দিন উত্তর বিহারের সেই ঐতিহাসিক বিধ্বংসী ভূমিকম্প। দাদামশাইরা একটি প্রাচীন জমিদার-বাড়ির একাংশে ভাড়া থাকতেন। সে-বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বসে দিদিমা এবং তাঁর কন্যারা সকলে তার তলায় চাপা পড়লেন। দাদামশাই তখন কর্মস্থলে, মামারা ইস্কুলে। তাঁরা দৌড়ে খোলা মাঠে গিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। তারপরে দৌড়তে দৌড়তে

বাড়ি গিয়ে দেখেন ততক্ষণে সেটি একটি ধ্বংসস্তূপ।

তখনকার দিনে ভাঙাচোরা কড়িবরগা-ইটপাটকেল সরাবার জন্য কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। লাঠি, শাবল, বাঁশ ইত্যাদিই ছিল সম্বল। আমার দিদিমা তাঁর ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাড়ির একদম বাইরের দিকে ছিলেন এবং মারাত্মকভাবে জখম হননি, অল্পক্ষণের মধ্যে উদ্ধার পেয়ে বেঁচে গেলেন। বাকি সকলকে বার করতে আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেল। যাদের মধ্যে ছিলেন আমার দুই মাসিমা, একজনের কোলে বাচ্চা।

মৃত্যুর আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ছেঁচে-যাওয়া শরীরের অবস্থা কী হয় তা সহজেই অনুমেয়। দিদিমা মেয়েদের একবার দেখতে চাইলে দাদামশাই তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "তুমি দেখলে সহ্য করতে পারবে না, আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠবে।"

দিদিমা বললেন, আমি ওদের দেখবই। তোমাকে কথা দিলাম কোনো চেঁচামেচি কান্নাকাটি করব না। মেয়েদের কাছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি তাঁদের ভালো করে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন। টুঁ শব্দটি করলেন না। কিন্তু এই ভয়ংকর বিভীষিকার স্মৃতি আটানব্বই বছর বয়সে মৃত্যুর দিন অবধি তাঁর বুকে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল।

এরপর অবিনাশবাবুর আর বিহারে মন টেঁকেনি। অল্পকাল বাদে রিটায়ার করবার পর তিনি কলকাতায় এসে বসবাস করেন।

আমি এরপর বাড়তে বাড়তে সাড়ে তিন বছর বয়সে পৌঁছই যখন, তখন দিনাজপুরে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে আমার সেই সাক্ষাৎকারটি ঘটে। তারপরে বরিশাল এবং তারপরে ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংয়ের যে-সমস্ত জমিদারির নাম করেছি, তার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য জায়গা হল কালীপুর এবং রামগোপালপুর। কালীপুরের জমিদার ছিলেন টোনাবাবু (টুলুবাবু), ভালো নাম নীরদাকান্ত লাহিড়ি চৌধুরী। রামগোপালপুরের জমিদার ছিলেন বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—গৌরীপুরের বীরেন্দ্রকিশোর নন, অন্য আর-এক বীরেন্দ্রকিশোর—ডাকনাম তিনুবাবু। তিনুবাবু এবং টোনাবাবু দুজনেই সেতার বাজাতেন, বিশেষত টোনাবাবু ছিলেন অতিশয় উচ্চকোটির সেতারবাদক, স্বয়ং এনায়েত খাঁর প্রিয় শিষ্য। এনায়েত খাঁ সাহেব বলতেন, বাংলাদেশে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন টোনাবাবু। এটুকু মনে করতে পারি, এই টোনাবাবু যখন বাজাতেন তখন আমি অন্য খেলাধুলো, বাড়ির কুকুরটার পেছনে লাগা, কী পাশের বাড়ির বন্ধু জ্যোতির সঙ্গে খুনসুটি করা—সব ফেলে স্থির হয়ে তাঁর সামনে বসে থাকতাম। যদিও গানবাজনার ব্যাকরণ বিন্দুবিসর্গ তখনও মাথায় ঢোকেনি। আওয়াজের মাধুর্যে পশুপাখিও বশ হয়, আমি তো অন্তত মনুষ্যশাবক! বোধহয় এই সময়েই প্রথম আমার গানবাজনাকে ভালোবাসার সূত্রপাত।

আমার সম্পর্কে একজন দাদা এই সময়ে একটি রেডিও এনে আমাদের বাড়িতে রাখলেন। নিয়মিত কলকাতার প্রোগ্রাম শোনা হতে লাগল তখনকার দিনের বহু দিকপালদের। তার মধ্যে টোনাবাবুও নিয়মিত বাজাতেন। একদিন বিকেলে ওঁর প্রোগ্রাম শোনবার জন্য উন্মুখ হয়ে রেডিওর সামনে বসে আছি, ঘোষক বললেন, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এখন যাঁর সেতারের অনুষ্ঠান ছিল, সেই নীরদাকান্ত লাহিড়ি

শৈশবে কোনো এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মায়েব সঙ্গে আমি

চৌধুরী মশাই আজই দুপুরে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে দেহত্যাগ করেছেন।"

টোনাবাবুর এই আকস্মিক মৃত্যুর ধাক্কা আমাদের এবং আমাদের বাড়ির গানবাজনাকে বেশ কিছুদিন স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

এরপর গৌরীপুরেব কথায় আসি। এখানকার ভূম্যধিকারীরা ছিলেন বিখ্যাত ব্রজেন্দ্রকিশোর, তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর এবং ভাগিনেয় বিমলাকান্ত। বীরেন্দ্রকিশোর বাবার কলেজের সহপাঠী ছিলেন। বীণ, রবাব ও সুরশৃঙ্গার বাদনে তাঁর ব্যুৎপত্তি সর্বজনবিদিত ছিল। শুধু বাজিয়ে হিসেবে নয়, সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ হিসেবেও তিনি বাংলার সংগীতজগতে চিরকালের উচ্চাসন করে নিয়েছেন। বিমলাকান্ত শুধু সেতারেই ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, ম্যাজিক এবং জ্যোতিষ এই দুটি বিষয়েও তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। সংগীত সম্বন্ধে কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ তিনি আমাদেব দিয়ে গেছেন, যার মধ্যে 'ভারতীয় সংগীতকোষ' এবং 'সংগীত ব্যাকরণ' যে-কোনো সংগীত শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য বলে আমি মনে করি। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর সম্পত্তি হারিয়ে এবং কিছু শোচনীয় পারিবারিক অঘটনের ফলে শেষজীবন তাঁর অত্যন্ত ক্লেশকর হয়ে পড়ে, কিন্তু মুখের হাসি এবং সংগীতপ্রিয়তা ও সেতারের (বিশেষত নিজের ঘরানা, যাকে তিনি এমদাদখানি ঘরানা বলতেন) প্রতি অনুরাগ ও নিষ্ঠা এতটুকুও মলিন হয়নি।

১৯৫৬ সালে আমার বিবাহ হয়। তখন বীরেন্দ্রকিশোর কলকাতাতে, গৌরীপুর এস্টেট কালগর্ভে বিলীন। সে-সময়ে রাজ্য সংগীত-নাটক-চারুকলা অ্যাকাডেমিতে কাজ করছেন। খুব সম্ভবত তখনই শরীর খারাপ হতে শুরু করেছে (চোখে গ্লকোমা হয়ে পরে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারান)। বাবা গিয়ে নেমন্তন্ন করাতে অসুস্থতা সত্ত্বেও ঠিক এসে উপস্থিত হলেন এবং বন্ধুর পুত্রবধূকে একগাছা সোনার হার দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন।

জন্মস্থান উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া হলেও প্রখ্যাত সেতারি ওস্তাদ এনায়েত খাঁ প্রায় সমস্ত শিল্পীজীবন এই গৌরীপুরেই কাটিয়ে গেছেন। রায়চৌধুরী বংশ তাঁকে মুখ্য সভাবাদক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং বাসস্থান দিয়েছিলেন। মেগাফোন রেকর্ডে খাঁ সাহেবের তিন-মিনিটের যে অসাধারণ সেতারবাদনগুলি আছে, তাতে বাজনার শেষে প্রায় প্রতিটিতেই তিনি ঘোষণা করেছেন 'প্রফেসর এনায়েত খাঁ অফ্ গৌরীপুর'—এটাওয়া বলেননি।

এনায়েত খাঁ সাহেবের এই বাজনাগুলি সুরমাধুর্য, বাদননৈপুণ্য ও হস্তকৌশলের এক অপূর্ব নিদর্শন। এখনকার সমস্ত উদীয়মান যন্ত্রীদের মন দিয়ে বারবার শুনতে অনুরোধ করি। ওঁর একটি খাম্বাজের দ্রুতগতের রেকর্ডে একটা জায়গা ছিল যেখানে এক-একটি চিকারি ও তারপর দুটি দুটি স্বরকে স্থাপন করে তিনি ছন্দ ও সংগীতের সমন্বয়ে নিতান্ত সহজ অথচ অভূতপূর্ব নকশার সৃষ্টি করেছিলেন, কয়েকবার উলটে-পালটে সেটাকে বাজিয়েছিলেন। অনন্যসাধারণ এক সংগীত সৃষ্টি, যেন পাখির বুলি। জানি না, আজকালকার শ্রোতা এবং যন্ত্রবিদদের মনে কতটা রেখাপাত করবে। এই রেকর্ডটাকে গ্রামোফোনে বাজাতে বাজাতে আমি সাউন্ড বক্সের পিনটাকে উঠিয়ে উঠিয়ে এই জায়গাটাই বারবার শুনতাম। শেষকালে ওখানটা ঘষে ঘষে অস্পষ্ট হয়ে গেল। বাবা বকাবকি করে আর একটা রেকর্ড কিনে এনে তালা দিয়ে রাখলেন, আমার গ্রামোফোন ঘাঁটা কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

টোনাবাবুর মৃত্যুর পরে আমার মা-র সেতার শিক্ষায় বেশ কিছুটা ছেদ পড়ল। মা নিতান্ত সহজ পর্যায়েই ছিলেন। খাতায় লেখা ছিল শুধু গৎ এবং ১নং, ২নং, ৩নং... ১৪নং ইত্যাদি তান ও ঝালা। কিন্তু এগুলির 'ধ্রুবত্ব' এতই বেশি ছিল যে উত্তরকালে আমি ইমদাদ খাঁ সাহেবের একটি ভূপালির রেকর্ড শুনে চমকে উঠে দেখি আমার মায়ের খাতায় সেই আস্থায়ীটি হুবহু লেখা আছে, একটি স্বর বা বাণীও এদিক-ওদিক হয়নি। বোঝা গেল তখনকার সংগীতজ্ঞরা একটি বন্দিশ-এর originality কতটা সযত্নে রক্ষা করতেন। আমরা আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো করে কোনো বন্দিশ মনে রাখি না। যেখানটা মনে নেই সেখানটা নিজের যা-মনে-আসে তাই দিয়ে ভর্তি করি। হিম্মত থাকলে নিজের বন্দিশ তৈরি করাই ভালো, তারপরে কালক্রমে দেখা যাবে স্রষ্টা না থাকলেও সেটা বেঁচে আছে কিনা। পূর্বসূরীদের বন্দিশকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধাসহকারে অপরিবর্তিত রাখাই শ্রেয়।

বাবাকে কাজকর্ম উপলক্ষে অনেক ট্যুর করতে হত। তাঁর সঙ্গে ময়মনসিংয়ের বহু জায়গায় ঘুরেছি। গৌরীপুরে গেলেই সেখানকার স্টেট গেস্টহাউসে থাকতাম, যেটি দেশি ও বিদেশি অতিথিদের সবরকম আদর-যত্ন-আপ্যায়নের উপযুক্ত করে গড়া হয়েছিল—আসবাবপত্র, দরজা-জানলার আভিজাত্য, শুভ্রকেশ হেড বাবুর্চির (নাম বোধহয় ইসমাইল) 'কী খাইব্যান হুজুরে' বলে আভূমি কুর্নিশ। নামের বৈচিত্র্যে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনেকগুলি জায়গাকে এখনো ভুলতে পারিনি। নেত্রকোনা, ভৈরববাজার, আঠারো বাড়ি (এখানকার জমিদারবংশের বোধ হয় ভবানীপুর থানার পিছন দিকে

একটা বাড়ি আছে), গাফরগাঁও ইত্যাদি। আরেকটা জায়গার নামের ঝংকার চিরকালের মতো মনে গাঁথা হয়ে আছে, 'জারিয়া জঞ্জাইল', ময়মনসিংহ জেলার উত্তর প্রান্তে গারো পাহাড়ের পাদদেশে।

আমার 'লঙ্গোটিয়া দোস্ত' ছিল পাশের বাড়ির ছেলে জ্যোতি, ভালোনাম সুবীরকান্ত চৌধুরী। জ্যোতির দুই দিদি—হাসি ও লক্ষ্মী। লক্ষ্মীদি পচা ওস্তাদের কাছে গান শিখতেন এবং প্রায়শই সন্ধেবেলায় বাতাসে ভেসে আসত সিঙ্গল রিড হারমোনিয়াম সহযোগে তাঁর সুরসাধনা। এর মধ্যে একটি গান আমার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে বসল—"না মানুঙ্গি, না মানুঙ্গি, না মানুঙ্গি"। প্রায়শই গুরুজনেরা লক্ষ্মীদিকে ফরমায়েস করতেন, "'না মানুঙ্গি'-খান গাইয়া ফালা"। আমি একদিন তাঁকে ধরে বললাম যে আমি ওই গানটি শিখতে চাই। লক্ষ্মীদি রাজি হয়ে গেলেন, কিন্তু প্রথমে আমাকে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন এসব গান খুবই মূল্যবান গান। পচা 'উস্তাদ' অনেক কষ্টে জোগাড় করেছেন এবং তাঁকে দিয়েছেন। সুতরাং শিখলে খুবই মন দিয়ে সমীহ করে শিখতে হবে এবং যেখানে-সেখানে যখন-তখন গাইলে চলবে না। আমি সবকিছুতেই রাজি। তখন লক্ষ্মীদি বললেন, "কথাগুলান তয় লেইখ্যা ল।" আমি কাগজ পেনসিল নিয়ে বসলাম। লেখা শেষ করে তাঁকে দেখাতেই তিনি চোখ কপালে তুলে চিৎকার করে উঠলেন। প্রথমে আমি লিখেছি 'না মানুঙ্গি×3', তারপর বাকি কথাগুলি। বারবার 'না মানুঙ্গি' কে লিখবে? কালি, কাগজ, সময় এবং পরিশ্রমের এহেন সাশ্রয় লক্ষ্মীদিকে বিন্দুমাত্র মুগ্ধ করল না, উলটে তিনি গানটাকে অশ্রদ্ধা কবার জন্য আমাকে হাঁকিয়ে দিলেন, কিছুতেই শেখালেন না। অনেক পরে হাতে-পায়ে ধরে তাঁর দয়া পেয়েছিলাম।

ময়মনসিং-এ আমাদের এক বিরাট প্রাপ্তি আমার 'জেলকাকাবাবু'। ময়মনসিং জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাবার সহপাঠী ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং হিন্দু হোস্টেলে, দুজনেই সাহিত্যের ছাত্র। কাজেই অবসর সময়ের অধিকাংশ একসঙ্গে সাহিত্যচর্চা করে

কালীপুরের নীরদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী
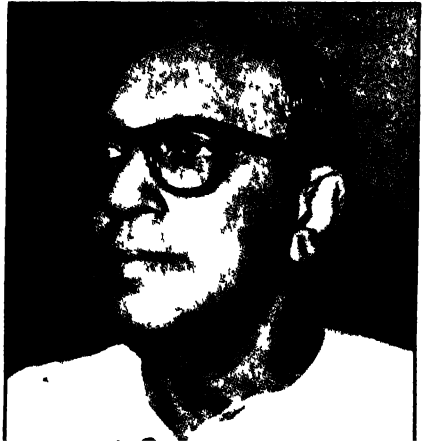
'জেলকাকাবাবু' জরাসন্ধ

কাটত। একবার দুজনে মিলে শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করতে গেছিলেন, সরস্বতীপুজোর উৎসবে সভাপতিত্ব করবার জন্য। শরৎবাবু প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, "তোমরা তো ইংরেজির ছাত্র, বাংলা পড়ো? আমার বই একটাও পড়েছো যে আমাকে সভাপতি করতে চাও?" বাবা শরৎবাবুর গোটাকতক বইয়ের নাম করে বললেন, "এই বইগুলির যে-কোনো জায়গা ধরুন, আমি মুখস্ত বলে দিচ্ছি।" চমৎকৃত শরৎবাবু আর 'না' বলতে পারেননি।

ময়মনসিং-এ জেলকাকাবাবুর বাড়িতে মধ্যে মধ্যে যাওয়া হত, বাড়ি মানে জেলখানারই সংলগ্ন কোয়ার্টার্স, সুতরাং সেখানে গেলেই উনি জেল দেখাতে নিয়ে যেতেন। দেখতাম, কতকগুলি কয়েদি গরাদের বাইরে ছাড়া আছে, তারা নানারকম কাজকর্ম করছে—কেউ সবজির বাগান দেখছে, কেউ বাঁশের চাটাই ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করছে, কেউ বেতের ঝুড়ি-মোড়া বুনছে, কেউ ঘানিতে সরষে পিষে তেল বার করছে ইত্যাদি। জেলে ঢোকবার আগে তাদের যার যা জীবিকা ছিল যথাসম্ভব সেই কাজে জেলকাকাবাবু তাদের লাগিয়ে রাখতেন, যাতে জেল-খাটা শেষ হলে তারা নিজের জীবিকায় ফিরে যেতে পারে। দেখতাম জেলকাকাবাবুকে কয়েদিরা ভীষণ ভালোবাসত ও ভক্তি করত। উনি গেলেই 'সাহেব এসেছেন, সাহেব এসেছেন' বলে সবাই তাঁর চারধারে জমায়েত হত।

কয়েকজন কয়েদি কিন্তু ছাড়া পেত না, সেলের ভেতরেই থাকত। এমনই একজনের গরাদের সামনে গিয়ে জেলকাকা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছো?" উত্তরে সে বলল, "আমি জল খাব, জল খাব!" একজন ওয়ার্ডার তাকে জল দিল। জেলকাকা তাড়াতাড়ি আমাকে সেখান থেকে নিয়ে গেলেন, কেন বুঝতে পারলাম না। পরে ওঁর বাড়িতে যখন আমি ওঁর ছেলেদের সাথে আড্ডা মারছি, তখন উনি বাবা-মাকে বললেন, "বুদ্ধদেবের সামনে আপনাদের কিছু বলিনি, ও শুনলে ভীষণ শক পাবে, এ লোকটি ফাঁসির আসামি। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, শুধু জল চাইছে। পরশুদিন ভোরে ওর এই যন্ত্রণার অবসান হবে এবং জেলার হিসাবে আমাকে দাঁড়িয়ে সে-দৃশ্য দেখতে হবে। আমার বরাতে এমনই একটি চাকরি জুটেছে, যাতে যেখানেই বদলি হয়ে যাই, সেখানেই এরকম কয়েকটি কেস থাকে এবং তার অন্তিম পর্বে আমাকে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। তিন-চারদিন খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না।"

ময়মনসিং ছাড়বার পরে বেশ কিছুদিন ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। পার্টিশনের পরে কলকাতায় আবার আমাদের দেখাশোনা, যাতায়াত শুরু হল। যখনই আসতেন তখনই ওঁর কাছে জেলখানা এবং কয়েদিদের বিবিধ স্মরণীয় এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা শুনতাম। এর মধ্যে একটি ঘটনা বিশেষভাবে মনে রাখার মতো। উনি যখন চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছিলেন তখন একটি ফাঁসির আসামী ওঁর জেলে আসে। তার সন্দেহ হয়েছিল, স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী, অন্য কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বাড়িতে একদিন ঢুকে, স্ত্রী যখন নবজাত শিশুটিকে স্তন্যদান করছিল, সেই অবস্থায় এককোপে তার মুণ্ডু কেটে ফেলে সেই মুণ্ডু নিয়ে থানায় উপস্থিত হয়, নিজের দোষ একবারও অস্বীকার করেনি। জেলকাকাবাবু তার প্রাণদণ্ড মকুবের জন্য উর্দ্ধতন কর্তাদের কাছে আবেদন করেছিলেন, তাঁরা কর্ণপাত করেননি।

বলেছিলেন, মা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে এই দৃশ্য দেখেও যার খুনের আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হয় না, সে লোকের বাঁচা উচিত নয়।

ফাঁসির আগের দিন লোকটির বৃদ্ধা মা ছেলেকে শেষবারের মতো দেখতে এলেন। ছেলে তাঁকে প্রণাম করতে যাবে, মা ছিটকে দূরে সরে গেলেন। বললেন, ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। তুমি পাপী হলেও আমাব ছেলে, এখান থেকেই আশীর্বাদ করছি, ভগবান তথাগত তোমার আত্মাকে শান্তি দিন!

ছেলে মাকে বলল, মা, বাড়ির পাশের জমিতে একটা বটের চারা লাগিও। রোজ সন্ধ্যায় তোমার এই হতভাগা ছেলের আত্মার শান্তি কামনায় সেখানে একটি করে প্রদীপ দিও!

ঘটনাটি আমাদের বলবার সময় দেখলাম, কাকাবাবুর ফরসা মুখটা একেবারে লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। বুঝলাম যে, উনি ওই মুহূর্তগুলির মধ্য দিয়ে আব একবার যাচ্ছেন।

জেলার অনেকেই ছিলেন এবং আছেন, তাঁরা অধিকাংশই সহৃদয় মানুষ, কিন্তু এতখানি দরদ এবং মমতা নিয়ে দণ্ডিত কয়েদিদের মনের মধ্যে, ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা বোধ হয় আর কেউ করেননি।

পাঠক নিশ্চয় আঁচ করতে পেরেছেন আমি এতক্ষণ কার কথা বলছি। ইনিই 'জরাসন্ধ', চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, যাঁর বর্ণিত এইসব ঘটনাবলী উত্তরকালে 'লৌহকপাট' বইটিতে প্রকাশিত হয়ে পাঠকসমাজকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এরপরে উনি অনেক বই লিখেছেন এবং প্রতিটি বই বাবা-মাকে উপহার দিয়ে গেছেন।

তারপরে একদিন শারীরিক অসুস্থতার জন্য ওঁর যাতাযাত কমে এল, আমরা মাঝে-মধ্যে ওঁর নিউ আলিপুরের বাড়িতে গেছি। শেষবারের মতো গেলাম, আমি একা। বাবা মারা গেছেন, তাঁর কাজের চিঠি দিতে।

বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমার চেহারা এবং বেশভূষা দেখে চমকে উঠে বললেন, এ কী! কে? বাবা, না মা?

উত্তর দিলাম, আজ্ঞে বাবা।

উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন, আমি যাব, আমি যাব। তারপরেই কেঁদে ফেলে বললেন, না, আমি যাব না! যাব না! যেতে পারব না! ওর ছবির সামনে, বউদির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না!

এরপরে নানা কারণেই ওঁর কাছে আর যাওয়া হয়নি, টেলিফোনেই খবর নিয়েছি। বছর সাতেক বাদে জরাসন্ধ ইহলোক ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পশ্চিমবাংলা

ময়মনসিংয়ের পরে দুটি জায়গায়—মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম—সংগীতের সঙ্গে কোনো সংস্রব ছিল না। কিন্তু ঝাড়গ্রামের সম্বন্ধে কিছু কথা বলবার আছে। ঝাড়গ্রাম তখন মহকুমা শহর হলেও শালের জঙ্গলে ভর্তি, এক পাড়া থেকে অন্য পাড়া যেতে গেলে পড়ত রাস্তার দু-ধারে ঘন জঙ্গল। সাপখোপ এবং শেয়ালের প্রাচুর্য ছাড়াও সেখানে মধ্যে মধ্যেই রাত্রিবেলা নেকড়ে অথবা হায়নার উপদ্রব ছিল। এই শ্রেণির জানোয়ারগুলিকে ওখানকার লোকেরা বলত 'হুরার'। রাত্তিরবেলা আমরা, বিশেষ করে ছোটো ছেলেমেয়েরা, বাড়ির বাইরে রাস্তায় একা বেরোতাম না। ওখানকার হাসপাতালে হুরারের পাল্লায় পড়ে জখম-হওয়া ছেলেমেয়ে বহুবার দেখেছি।

ঝাড়গ্রামে একজন রাজা ছিলেন, তাঁর নাম নরসিংহ মল্লদেব। বাবা ওখানকার মহকুমা শাসক, সবচেয়ে বড়ো গভর্নমেন্ট অফিসার। সুতরাং বাবাকে তিনি খুবই খাতির করতেন, মাঝে মধ্যে তাঁর প্রাসাদে আমাদের নেমন্তন্ন হত।

আমাদের বাড়ি ছিল বড়ো একটা বাগানের মধ্যে, বাংলো ধাঁচের। তার চারধারে শালের জঙ্গল। বাড়ির সামনে বিশাল একটি বারান্দা, তার একাংশ মজবুত লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। কেউ গরমকালে বারান্দায় শুতে চাইলে তাকে ওই জালে-ঘেরা অংশের মধ্যেই শুতে হত। কিছুকাল পূর্বে এই বাড়িতে এক মেমসাহেব খোলা বারান্দায় তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। বাচ্চাটিকে হুরারে নিয়ে যায়। ধুরন্ধর জানোয়ারটা এমন নিঃশব্দে এসেছিল এবং চলে গিয়েছিল যে, মেমসাহেবের ঘুমই ভাঙেনি। বাচ্চা ঘুম ভেঙে চেঁচাবার আগেই পগার পার। মেমসাহেব সকালে উঠে দেখেন বাচ্চা নেই। তারপর থেকে এই জালে-ঘেরা ব্যবস্থা।

রাজাবাহাদুর খুবই দক্ষ শিকারি ছিলেন। বাবার এই ব্যাপারে একটু-আধটু শখ থাকায় তিনি দু-একবার তাঁর সঙ্গে ছোটোখাটো শিকারে গেছেন কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। একবার কয়েকদিন হুরারের উপদ্রব খুবই বেড়ে গেল। বেশ কয়েকজন ঘায়েল হল। লোকজন গিয়ে রাজাবাহাদুরের কাছে ধর্না দিল। রাজাবাহাদুর বাবাকে খবর দিলেন। রবিবার ভোরে তিনি লোকজন নিয়ে বেরোবেন। সন্ধ্যা অবধি, এমনকী দরকার হলে রাত্রেও জঙ্গল পিটিয়ে ওদের কয়েকটাকে মারার চেষ্টা করবেন। বাবা কি সঙ্গে যেতে চান?

বাবা তো এককথায় রাজি। তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। রবিবার ভোরে একজন ওয়ার্ডার হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দিল, একজন কয়েদি জেল থেকে পালিয়েছে।

ব্রিটিশ আমলে জেলের থেকে কয়েদি পালানো মানে ওয়ার্ডারদের এমনকী জেলারের চাকরি নিয়ে টানাটানি। বাবাও খুব স্বস্তিতে থাকবেন না। বাবা তখনই জেলের দিকে দৌড়লেন, শিকারে যাওয়া শিকেয় উঠল।

পরের দিন সকাল সাড়ে আটটা-নটা। রাজাবাহাদুরের তিন-তিনটে বিরাট গাড়ি আমাদের কম্পাউন্ডে ঢুকল। সেকালের গাড়িতে ইঞ্জিনের বনেট এবং সামনের মাডগার্ডের মধ্যে বড়ো একটা খাঁজ থাকত। প্রত্যেকটা গাড়ির দু-পাশে সেই মাডগার্ডের খাঁজে গোঁজা রয়েছে দুটি করে হুরারের দাঁত-খিঁচোনো মৃতদেহ, মরা অবস্থায়ও যথেষ্ট ভীতিজনক। রাত্রির অন্ধকারে জ্যান্ত এরকম একটি জিনিসের সম্মুখীন হলে কী হত সে-কথা ভাবতে গিয়ে পাথর হয়ে গেলাম।

সেদিন থেকে হুরারের উৎপাত বেশ কিছুটা কমে গেল।

রাজাবাহাদুরকে শিকারি হিসেবে জেনেছিলাম কিন্তু তিনি যে একজন ভালো সংগীতজ্ঞ, শাস্ত্রীয় সংগীত গাইতেন এবং তবলা ও পাখোয়াজের একজন সুদক্ষ বাদক ছিলেন, সে-পরিচয় পাওয়ার অবকাশ আমার ছিল না। কারণ গান-বাজনার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই আমার তখনও হয়নি। উত্তরকালে যখন তা জানতে পারলাম তখন তিনি চলে গেছেন।

ঝাড়গ্রামের আমার আর-একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা জাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের আগমন। আমাদের বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। শুধু স্টেজে নয়, স্টেজের বাইরেও কথা দিয়ে মানুষকে সম্মোহিত করে রাখতে পারতেন।

সকালবেলা আমাদের বাগানে বসে চা খাচ্ছেন। আমরা কয়েকটা আট-দশ বছরের বাচ্চা তাঁকে উত্যক্ত করছি 'একটু ম্যাজিক দেখান না, একটু ম্যাজিক দেখান না' বলে। উনি বললেন, "সবসময় কি ম্যাজিক দেখাতে হয় রে। যখন-তখন ম্যাজিক দেখালে ম্যাজিক পালিয়ে যায়।"

আমরা নাছোড়বান্দা। উনি নিরুপায় হয়ে তখন করলেন কী—আমাদের কারো কান মলে, কারো পেটে চিমটি কেটে, কারো মাথার চুলে হাত চালিয়ে এক-একটি রুপোর টাকা বের করে সবাইকে দিতে লাগলেন। আমাদের আহ্লাদ আর দেখে কে। আমি আমার

জাদুসম্রাট পি সি. সবকাব (সিনিযব)

ঝাডগ্রামেব মহাবাজা নবসিংহ মল্লদেব

টাকাটা হাফপ্যান্টের পকেটে রেখে দৌড়ে বাড়ির ভেতরে মাকে দেখাতে গেলাম। সেখানে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখি টাকার চিহ্নমাত্র নেই!

অত্যল্পকালের মধ্যেই বন্ধু-বান্ধবদের শুকনো মুখ দেখে বুঝলাম তাদের টাকাগুলিও উধাও হয়েছে। কখন, কীভাবে তা কেউ বলতে পারেনি।

জাদুসম্রাটের অসাধারণ সম্মোহনবিদ্যার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখা গেল তাঁর শো যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন। দর্শকদের মধ্যে, বলা বাহুল্য, রাজাবাহাদুরও ছিলেন। সবকার সাহেব তাঁকে গিয়ে বললেন, "আমার ম্যাজিক দেখে যদি আপনি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে আমাকে সেই মর্মে একটা সার্টিফিকেট দয়া করে লিখে দিন। আমার একটা মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে।" বলে একটা কাগজ আর কলম বাজাবাহাদুরকে ধরিয়ে দিলেন। রাজাবাহাদুর সানন্দে সার্টিফিকেট লিখে দিলেন।

সার্টিফিকেটের কাগজখানা হাতে করে জাদুসম্রাট স্টেজে গিয়ে উঠলেন। তারপর বললেন, "রাজাবাহাদুর, আপনি একজন দানবীর সে-কথা সবাই জানে। তাই বলে আপনি এমন কাণ্ড করবেন স্বপ্নেও ভাবিনি! যাই হোক, তাহলে কাল সকাল আটটার মধ্যে আপনি আপনার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, আর আমি গিয়ে তার দখল নিচ্ছি!"

সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত! পি. সি. সরকার তখন বললেন, "কাগজখানা আমি পড়লে আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আপনাদেরই কেউ এখানে এসে এটা পড়ুন, জোরে জোরে চেঁচিয়ে পড়বেন, যাতে সবাই শুনতে পায়।"

রাজাবাহাদুরেরই বন্ধু, একজন বয়স্ক দর্শক, স্টেজে গিয়ে পড়তে শুরু করলেন :

আমি শ্রীযুক্ত পি. সি. সরকারের জাদুবিদ্যা প্রদর্শনে এতই মুগ্ধ হইয়াছি যে পুরস্কারস্বরূপ আমার ঝাড়গ্রামের প্রাসাদটি তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে দান করিলাম। কাল সকাল আটটা হইতে এই দানপত্র কার্যকরী হইবে।

স্বা. নরসিংহ মল্লদেব

এরপর পি. সি. সরকার হতবাক রাজাবাহাদুরের কাছে গিয়ে বললেন, "শেষবারের মতো একবার কাগজটা দেখে নিন, যা লিখেছেন তা ঠিক কি না।" রাজাবাহাদুর কাগজটার দিকে তাকিয়েই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। নিতান্তই সাধারণ একটি সার্টিফিকেট, বাড়ি দান করার কথা তাতে কোথাও লেখা নেই!

এইরকম মাস-হিপনোটিজম্-এর খেলা উনি আরো দেখিয়েছেন। একবার অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে(তখন অবশ্য প্রধানমন্ত্রী বা প্রিমিয়ার বলা হত) দিয়ে লিখিয়েছেন যে, তিনি এবং তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করছেন, সে-জায়গায় পি. সি. সরকার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন।

চিনেও ম্যাজিক দেখাতে গেছেন জাদুসম্রাট। রেলের কর্তাব্যক্তিদের অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করালেন। রেলের দুটি লাইনের সঙ্গে তাঁর দুটি হাত হাতকড়া দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। লাইন দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে হংকং-কাউলুন এক্সপ্রেস।

শেষ মুহূর্তে এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন ড্রাইভার নিশ্চয়ই আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ভগবানকে ডেকেছিলেন। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে পিষে মারা, এমন কাণ্ড তাঁব জীবনে কখনো ঘটেনি।

ঝড়ের গতিতে এক্সপ্রেস ছুটে বেরিয়ে গেল। দেখা গেল জাদুসম্রাট লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে হাসছেন।

যে-সমস্ত বিশাল বাঙালির জন্ম আর হবে না তাদের মধ্যে জাদুসম্রাট নিঃসন্দেহে একজন। বহুকাল বাদে অকস্মাৎ যখন শুনলাম যে জাপানে তাঁর দেহাবসান ঘটেছে, তখন বাড়িশুদ্ধ সবাই এমন একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম, যেন একজন নিকট আত্মীয় মারা গেলেন।

আজ ষাট বছরেরও পরে কেউ যদি আমাকে হঠাৎ ময়মনসিংহ শহরে নিয়ে ফেলে দেয় তাহলে নিতান্তই দিশাহারা হয়ে যাব, কারণ ওখানে এতদিনে খালি জায়গাগুলিতে অনেক বাড়িঘর হয়ে গেছে। পুরোনো বাড়ি ভেঙে হয়তো নতুন বাড়িঘর হয়ে গেছে। হয়তো স্কাই স্ক্র্যাপারের বাচ্চাও দু-একটা হয়ে থাকবে। রেলস্টেশন থেকে বেরিয়ে শহরের মেরুদণ্ড যে-রাস্তাটি টাউনহল অবধি চলে গেছিল, সেটিকেও এখন নানা অলংকারভূষিত হবার জন্য চিনতে পারব না।

এই রাস্তার থেকেই একটা সরু গলি ধরে বেরিয়ে একটা পাড়ায় পৌঁছোনো যেত যেখানে আমাদের বাড়ি ছিল। পাড়ার নাম ছিল 'পণ্ডিতপাড়া'। ক'জন পণ্ডিত সেখানে থাকতেন জানি না, কিন্তু আমার কয়েকজন 'প্রাণের বন্ধু' ওখানে থাকত, যাদের কোনোদিনই ভুলতে পারব না—কতকগুলি ঘটনার জন্য। ঘটনাগুলি পরিণত মানুষদের কাছে তুচ্ছ, কিন্তু আমার কাছে অবিস্মরণীয়। তারই একটিকে উপস্থিত করছি।

রাজহাঁস শুধু কবিদের নয়, সর্বসাধারণের কাছেই একটি মনোরম পাখি, বিশেষত যখন জলে ভেসে থাকে। একে নিয়ে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে, চিত্রকবেরা ছবি এঁকেছেন, চাইকভ্স্কি সাহেব Swan Lake নামে অমর সংগীতের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই সমস্ত ছাপিযে আমার মনে রাজহাঁসের যে-চিত্রটি চিরকালের মতো গ্রথিত হয়ে

গেছে সেটি হল, একটি ক্ষিপ্ত রাজহাঁস আট-নয় বছর বয়সি একটি ধাবমান ছেলের পশ্চাদ্দেশ কামড়ে ধরে ঝুলে আছে, ঝুলতে ঝুলতে চলেছে, ছাড়ছে না।

ধরা যাক, ছেলেটির নাম ভুলু। তাদের বাড়িতে পুকুর, বাগান, হাঁসের পৈঠা, খরগোসের খাঁচা ইত্যাদি বহুবিধ দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল, যেখানে আমরা খেলা করতাম। হঠাৎ একদিন ভুলু আমাকে বলল, "রাজহাঁসের ডিম দেখবি?" বলে একটি রাজহাঁসের শয়নকক্ষ থেকে বিরাট সাইজের একটি ডিম বার করে আনল! বিস্মিতচিত্তে সেটিকে নিরীক্ষণ করছি, এমন সময় বিকট একটি আওয়াজ করে ডিমটির মাতৃদেবী পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলেন। থতমত-খাওয়া ভুলুর হাত থেকে ডিমটি ইট-বাঁধানো জমির ওপর পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

নিজের অনাগত সন্তানের এহেন পরিণতি দেখলে কোনো মা-ই স্থির থাকতে পারে না। রাজহাঁস আর-একটি বিকট আওয়াজ করে, ভুলু পিছন ফিরে পালাবার আগেই তার পশ্চাদ্দেশ কামড়ে ধরল। পশ্চাদ্দেশ মানে শুধু হাফপ্যান্টেরই পশ্চাদ্দেশ, না তৎসঙ্গে ভুলুরও কিছুটা পশ্চাদ্দেশ, তা বলতে পারব না। তারপরে যে কাণ্ডটি ঘটল তার বর্ণনা আগেই দিয়েছি। আমি পক্ষী-বিশারদ নই, রাজহাঁসের চঞ্চুতে কতটা জোর হতে পারে জানি না। মোদ্দা কথা, কামড় আর কিছুতেই ছাড়ে না, ভুলুও ধাবমান, পেছনে কামড়ে ধরে রাজহাঁসও ধাবমান। শেষে ভুলু তার হাফপ্যান্টুলটি খুলে ফেলে তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাঁচে।

এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আর কারো কোনোদিন হয়েছে কি না জানি না, কিন্তু একবার দেখলে আর ভোলা যায়? চোখ বুজলেই এখনো পরিষ্কার দেখতে পাই। ময়মনসিংয়ের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে এই ছবি।

তারপর কাঁথিতে প্রচুর গানবাজনা। যে ক-জন সংগীতজ্ঞের কথা মনে আছে, তার মধ্যে আমাদের সব থেকে অন্তরঙ্গ ছিলেন জহরকাকা—জহরলাল (পদবি ঠিক মনে নেই, সম্ভবত বন্দ্যোপাধ্যায়)। পাতলা, ফরসা, ব্যাকব্রাশ করা চুল, চোখে রিমলেস চশমা, দিলীপ বেদির ছাত্র। খেয়াল ভালো গাইতেন, কিন্তু তাঁর বাংলা রাগপ্রধান গান সব থেকে মর্মস্পর্শী ছিল। আর মধ্যে মধ্যে আসতেন পাঁচটগড় এস্টেটের মালিক দাস-মহাপাত্ররা—কেউ খেয়ালে, কেউ সেতারে, কেউ জলতরঙ্গে পটু।

কাঁথির কথা আরো একটি কারণে বিশেষভাবে মনে আছে—তা হল অগাস্ট

মুভমেন্ট। গান্ধিজি ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তে বলেছেন, তারাও হুংকার দিয়ে বলেছে যাবে না মোটেই। শহরে শহরে পিকেটিং, মিছিল। একদিন হঠাৎ স্কুলের গেটের সামনে গিয়ে বাধা পেলাম, ঢুকতে পারলাম না। আমি পড়তাম 'কন্টাই হাই ইংলিশ' স্কুলে। কয়েকজন খদ্দর-পরা লোক কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। জনা-কয়েক মাস্টারমশাই এলেন, ঢুকতে বাধা পেয়ে একটু তর্কাতর্কি করলেন, শেষে ফেরত চলে গেলেন। তারপরে এলেন হেডমাস্টারমশায়। তাঁকে আটকাতেই তিনি বললেন, ''লেখাপড়া বন্ধ করে দেশসেবা হয়, এটা আমি মোটেই মানি না। আমি ঢুকবই, তোমরা আমাকে আটকাও, মারধোব করো, যাই কবো।''

তাঁর গায়ে আর কারো হাত উঠল না, তিনি ভেতরে চলে গেলেন। এই সময় পুলিশ এসে পড়ল, পিকেটারদের ছত্রভঙ্গ করে কয়েকজন চাঁইকে অ্যাবেস্ট করে নিয়ে গেল। যাবাব সময় তারা চিৎকার করে উঠল, ''বন্দেমাতরম্''। কথাটি আগে শুনিনি। মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। সন্ধ্যাবেলায় বাবা অফিস থেকে ফিরলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''বাবা, বন্দেমাতরম্-এর মানে কী?''

উনি একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, ''মা, তোমাকে প্রণাম করি।''

''কংগ্রেসেব লোকগুলি যারা ইস্কুলের গেটে পিকেটিং করছিল তারা কেন এই কথাটা বলছে?''

''দেশকে ওরা মা বলে ভাবে। তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছে।''

সেদিন কথাটা আর বেশিদূর এগোল না। ক্রমশ আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে গেল। পুলিশও তৎপর হয়ে উঠল আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে।

মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন নিয়াজ মহম্মদ খান এবং এস পি ছিলেন মহম্মদ ওবেইদুল্লাহ্। পাঞ্জাবি মুসলমান। এই দুই মহম্মদ মিলে যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন, তা মেদিনীপুরবাসীর মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

কাঁথি মেদিনীপুরেরই একটি মহকুমা। এবং বাবা সেখানকার এস.ডি.ও.। কর্তাদের কাছ থেকে ইঙ্গিত এল, রোজ জনা কুড়ি-পঁচিশেক লোককে গুলি করে মারবে বিন্দুমাত্র অছিলা পেলেই। এবং সেই মৃতদেহগুলি সারাদিন কাঁথি হাসপাতালের সামনের মাঠে ফেলে রাখবে, যাতে শহরবাসী দেখতে পায়।

অকারণে মানুষ মারতে তাঁর বিবেকে বাধল। বাবা কোনো অছিলাই খুঁজে পেলেন না। কর্তাদের হুকুম তামিল হল না। হুংকার দিয়ে দুই কর্তা কাঁথিতে চলে এলেন, ওখানে ক্যাম্প করলেন। তারপর তাঁদের মনোমত শাসনকর্ম শুরু হয়ে গেল। বাবার নামে অত্যন্ত খারাপ কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট দিয়ে পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল। সে জায়গায় এলেন সমর সেন, আই.সি.এস.।

শুধু এই নয়, অল্পদিন বাদেই বাবাকে বদলি করে দেওয়া হল পার্বত্য চট্টগ্রামে, রাঙামাটিতে—'পানিশমেন্ট পোস্টিং'। জাপানি সৈন্যরা তখন বর্মা দখল করে ব্রিটিশ সৈন্যদের মারতে মারতে আকিয়াব পেরিয়ে প্রায় চট্টগ্রামের সীমানায়। বাবাকে একাই যেতে হল, কারণ ওখানে পরিবার নিয়ে যাওয়া যাবে না।

এর আগেই একবার বাবা এইরকম পানিশমেন্ট পোস্টিং-এর সম্মুখীন হয়েছিলেন মেদিনীপুরে। তখন আমার বয়স মাত্র ছয় মাস। বাবা মেদিনীপুর সদরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মি. বার্জ নামে এক সাহেব। একদিন বিকেলে তিনি বার্ষিক স্পোর্টসের প্রাইজ দিচ্ছেন, এমন সময় একটি প্রতিযোগী দু-হাত দূর থেকে আচমকা পিস্তল বের করে তাঁকে গুলি করে, বার্জ সাহেব ভূলুণ্ঠিত হন। তাঁর বডিগার্ডরা ছেলেটিকে গুলি করে মাটিতে ফেলে দেয়। কিন্তু গুলি খেয়ে খেয়ে নিশ্চল হবার আগে ছেলেটি হামাগুড়ি দিয়ে বার্জ সাহেবকে আরো দু-একবার গুলি করে, তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করবার জন্য।

ধুন্ধুমার বেধে গেল। মেদিনীপুরের বাড়ি বাড়ি ঢুকে তছনছ করে সব স্কুল-পড়ুয়া এবং তাদের সমবয়সি ছেলেদের পুলিশ ধরে নিয়ে আসুরিক অত্যাচার চালাতে থাকল।

দু-একদিন বাদে এক রবিবার এক ইনস্পেক্টর সকালবেলায় হাতকড়া-পরা একটি ছেলেকে এনে বাবার কাছে হাজির করল। বলল, "এস.পি. সাহেব পাঠিয়ে দিয়েছেন, এই ছেলেটা কনফেশন করেছে যে, সাহেবকে মারবার দলের মধ্যে ও ছিল। আপনাকে জবানবন্দি নিয়ে সই করে দিতে বলেছেন।" কেউ কনফেশন করলে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে করতে হয় এবং সেটা যে যথার্থই তার দোষস্বীকার সেটা ম্যাজিস্ট্রেট সার্টিফাই করে দেন, এটাই আইন।

বাবা ইনস্পেক্টরকে বললেন, "ঠিক আছে। তুমি বাইরে অপেক্ষা করো। আমি ওর জবানবন্দি নিচ্ছি। শেষ হলে তোমাকে ডাকব।"

ইনস্পেক্টর তিড়বিড়িয়ে উঠে বলল, "না না না স্যার, এস.পি. সাহেব আমাকে থাকতে বলেছেন, ও সবকিছু ঠিকঠাক বলছে কিনা দেখবার জন্যে।"

বাবা বললেন, "বটে! তুমি আমাকে আইন শেখাচ্ছ? আইন মোতাবেকই তোমায় বাইরে থাকতে হবে। ছেলেটার দায়িত্ব আমি নিলাম। ও যদি আমার কাছ থেকে পালায় তখন না-হয় আমাকে অ্যারেস্ট করে এস.পি. সাহেবের কাছে হাজির কোরো।"

জনাকয়েক কনস্টেবলকে বাইরে রেখে ইনস্পেক্টর এস.পি. সাহেবের কাছে খবর দিতে দৌড়ল—"দাশগুপ্ত সাহেব কেসটার সর্বনাশ করে দিচ্ছেন, স্যার।"

বাবা বন্ধ ঘরে ছেলেটাকে বললেন, "সত্যি করে বলো তো, তুমি দোষ স্বীকার করছো কিনা। আমার মনে হচ্ছে ওরা তোমাকে মারধোর করে স্বীকারোক্তি করাচ্ছে। হয়তো এও বলেছে যে, স্বীকারোক্তি করলে তুমি খালাস পেয়ে যাবে, আর-সকলে শাস্তি পাবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। তোমার স্বীকারোক্তি তোমারই বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং এই ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি করলে সর্বপ্রথম তুমিই ফাঁসিতে ঝুলবে। তারপরে অন্য সকলের কথা।"

ছেলেটি হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, "আমাকে রক্ষে করুন স্যার। এই দেখুন, ওরা আমাকে কী মার মেরেছে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আমি স্বীকারোক্তিতে রাজি হয়েছি। কিন্তু কী স্বীকার করব, ওদের সঙ্গে আমার কোনোদিন কোনো সংস্রব ছিল না।" বলে জামা খুলে দেখাল, অসংখ্য কালশিটের দাগ।

বাবা তখন রিপোর্ট লিখলেন, ছেলেটিকে মারধোর করে স্বীকারোক্তি করতে পুলিশ বাধ্য করেছে। এক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ওকে আর পুলিশের হেফাজতে রাখা চলে না, ওকে 'জুডিশিয়াল কাস্টডি'তে রাখা হোক। এ স্বীকারোক্তি নাকচ।

সেই রাত্রেই বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার মেদিনীপুর ছুটে এলেন এবং বাবাকে যাচ্ছেতাই বকলেন। বললেন, "তোমার মতন অকৃতজ্ঞ অফিসার আমি দেখিনি। বার্জ তোমাকে কীরকম পছন্দ করত, তোমার নামে এত ভালো রিপোর্ট দিয়েছে, আর তুমি এইরকম করলে?"

বাবা বললেন, "স্যার, আমি অকৃতজ্ঞ নই। বার্জ সাহেবকে আমিও পিতৃতুল্য বলে শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু এইক্ষেত্রে আমি যা করেছি, তা সম্পূর্ণ আপনাদের শেখানো আইন মেনেই। আমার নিজের বাবাকে কেউ গুলি করে মারলেও আমি অন্যরকম কিছু করতে পারতাম না। কোথায় আমার ভুল হয়েছে বলুন, তারপরে আপনার দেওয়া শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব।"

সত্যিই বাবার লেখা রিপোর্টে কোনো ছিদ্র বার করতে পারলেন না কমিশনার সাহেব। পারলে বাবার চাকরি অবশ্যই তৎক্ষণাৎ খেয়ে নিতেন। কিন্তু রাগ মেটাবার জন্য তিনি উৎপীড়নটা অন্যভাবে করার ব্যবস্থা করলেন। সেই রাত্রেই বাবাকে মেদিনীপুর ছেড়ে চলে যেতে হল এবং তারপরে বাজে বাজে জায়গায় অল্পদিন বাদে বাদে ট্রান্সফার। পানিশমেন্ট পোস্টিং।

যে-ছেলেটির কথা এতক্ষণ হচ্ছিল, ধরা-পড়া ছেলেদের মধ্যে একমাত্র সে-ই বাঁচল, দীর্ঘ কারাদণ্ড নিয়ে। বাকি অধিকাংশই ফাঁসিতে ঝুলল। এই ছেলেটির নাম কামাখ্যা ঘোষ। উত্তরকালে মেদিনীপুরের একজন বড়ো কমিউনিস্ট নেতা।
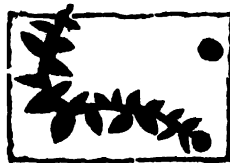
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুলাভ

ও গৌরীপুর দরবার, সেই অর্থে দরবার না-হলেও গৌরীপুর এস্টেটের সভা আলোকিত হয়েছিল বহু গুণীজনের উপস্থিতিতে। গায়কদের সকলের নাম মনে নেই, কারণ যন্ত্রী, সেতার, সরোদের তৎকালীন গুণী এমন কেউ ছিলেন না যিনি গৌরীপুরে অল্পবিস্তর থাকেননি এবং রায়চৌধুরী বংশকে সংগীত শিক্ষা দেননি। তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া তালিম ব্রজেন্দ্রকিশোর এবং বীরেন্দ্রকিশোর সযত্নে রক্ষা করেছিলেন লিপিবদ্ধ করে। দুঃখের বিষয় আজ সেগুলির থেকে উপকৃত হবার কোনো উপায় নেই। এইসব গুণী যন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন উজির খাঁ (রামপুরের বীণকার) ও তাঁর পৌত্র দবির খাঁ; সরোদে মুরাদ আলি খাঁ, তাঁর পালিত পুত্র আবদুল্লা খাঁ, আবদুল্লা খাঁয়ের ছেলে মহম্মদ আমির খাঁ (আমার গুরু রাধিকামোহন মৈত্রের গুরু), বাবা আলাউদ্দিন খাঁ ও হাফিজ আলি খাঁ। এনায়েত খাঁ সাহেব তো গৌরীপুরের বাসিন্দাই ছিলেন।

১৯৪২ সালে কাঁথি থেকে বাবা তো বদলি হয়ে গেলেন চট্টগ্রামের রাঙামাটিতে। জাপানি সৈন্যদল বর্মা দখল করে ব্রিটিশ সৈন্যদের মারতে মারতে আকিয়াব পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। সুতরাং আমরা রয়ে গেলাম কলকাতায়। গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে। বাড়িটা এখনো অক্ষত অপরিবর্তিত রয়েছে। বাড়ির মালিক যুগল শ্রীমলের অত্যন্ত সুন্দর চেহারা। পরিণত বয়সেও তা অটুট ছিল। তিনি নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম-এর কর্ণধার ছিলেন। কিছুকাল হল গত হয়েছেন। জাপানি বোমা পড়ল কয়েকবার। সাইরেনের বুক-কাঁপানো আওয়াজের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল। এয়ার রেডের সময় বাড়ির সিঁড়ির তলায় আমরা আশ্রয় নিতাম, যদিও বোমা একটাও আমাদের কাছাকাছি পড়েনি। পড়েছিল খিদিরপুর ডকে এবং চিনাপট্টিতে। ডোভার

লেনের অধিকাংশই তখন মাঠ এবং গড়িয়াহাট মোড় থেকে পার্ক সার্কাস অবধি গড়িয়াহাট রোডও তাই।

তখনকার কলকাতাকে যে একবার দেখেছে সে কখনো ভুলতে পারবে না—ভোর পাঁচটা নাগাদ পটপট শব্দে রাস্তার হাইড্র্যান্ট খুলে হোসপাইপের মাধ্যমে রাস্তা ধুয়ে সাফ করা, চার পয়সায় ট্রামের ফার্স্টক্লাসে চড়ে রাঙা দাদামশায়ের দেড়-ঘণ্টায় বালিগঞ্জ থেকে গঙ্গাস্নান করে আসা, চার পয়সায় দ্বারিক ঘোষের দোকানে গোলাপি অথবা হলুদ শরবত কিংবা চার পয়সায় আইসক্রিম খাওয়া। মনে আছে দুটি আইসক্রিম কোম্পানির কথা—হ্যাপি বয় এবং ম্যাগনোলিয়া। ম্যাগনোলিয়া-র একটি সাদা রংয়ের অভিজাত আইসক্রিম ছিল, তার দাম দু-আনা। আমরা জানতাম ওটা নিতান্ত বড়োলোকেরাই খায়। এইসময় হাওড়া স্টেশন দিয়ে কলকাতায় আসার সময় দেখতাম বিরাট রুপোলি রংয়ের থাম উঠছে আকাশে। বছর খানেকের মধ্যে নতুন হাওড়া ব্রিজ তৈরি হয়ে গেল—যে ব্রিজ আমাদের বেপরোয়া অযত্ন ও দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও এখনো বেঁচে আছে।

এরপরে আবার দিনাজপুর, যে-দিনাজপুরে জ্ঞান গোসাঁইকে চুপ করতে বলেছিলাম। আমার অন্যতম প্রিয় জায়গা। তখন আমি ক্লাস সিক্সের ছাত্র। এবারের দিনাজপুরের কিছু কিছু কথা ও ছবি স্মৃতিতে জমা হয়ে আছে। যে বাড়িতে আমরা থাকতাম সেটা দিনাজপুরের রাজার বিরাট একটা বাগানবাড়ি, নাম কুঠিবাড়ি। বিস্তৃত আমবাগান, তার মধ্যে একটা একতলা বাড়ি-দালান কিন্তু মাথায় খড়ের ছাউনি। বাগানের প্রাচীরের একদিকে একটা দরজা, সেটা দিয়ে বেরোলেই পাশে নদী, যার নাম কাঞ্চন, নদীর একটা ভালো নাম ছিল—পুনর্ভবা, তার ধারে শ্মশান। আমাদের বাড়ির আশেপাশে আরও দু-একটা বাড়ি ছিল। আর ছিল একটা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস।

কুঠিবাড়ি থেকে শহরের দিকে যেতে গেলে একটা খাল পেরোতে হত। সাঁকো ছিল। দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথের নামানুসারে খালটির নাম ছিল গিরিজা ক্যানেল। খালটি কাঞ্চন নদীতে মিশে গেছে। খালটি শহরের মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত, বর্ষাকালের জল ধরে নিয়ে প্লাবন থেকে শহরকে বাঁচাত। সারা বছর জল থাকত, আর থাকত পুঁটি, কুচো মাছ, সরপুঁটি, বেলে, খল্‌সে, খয়রা, খরশোলার ভিড়। বাড়ির কাজের লোক দীপচাঁদ কোথা থেকে একটা ছিপ নিয়ে এসে কেঁচো বা ময়দার গুটির টোপ দিয়ে মাছ ধরত, ছিপ ফেললেই অল্পক্ষণের মধ্যে মাছ। দীপচাঁদের শিষ্য হয়ে আমিও মাছধরা শিখে গেলাম অল্পদিনেই। ছিপের ফাৎনা যখনই টুকটুক করে ওপর-নীচে নাচানাচি করত, মারতাম টান, কিছুই উঠত না। কখন টান মারতে হবে তার তালিম দীপচাঁদের কাছেই হল। এখনো মনে আছে তার উপদেশবাণী, "দেখুন, ফাৎনা উ-রকম উপ্‌রে-নীচে টুক্‌টুক্ করে লাচ্‌বে, জানবে মাছ টোপকে ঠুকরাচ্ছে, খায়নি। ফাৎনাকে একদিকে টেনে লিয়ে যাবে ত্যাখুন বুঝবে খেয়েছে। মারবে টান।"

তালিম কমপ্লিট, আর একবারও ভুল হল না। গোটা পনেরো মাছ নিয়ে বাড়ি ঢুকতেই মা ছেলের বিদ্যের দৌড় দেখে অবাক! পরের দিন দীপচাঁদদা একটা খালুই নিয়ে এল। এক একদিনের 'ক্যাচ'-এ একবেলার রান্না হয়ে যেত। ছোটোমাছের ঝোল বা সরষে চচ্চড়ি। ক্রমে ক্রমে নেশাটা এতই জাঁকিয়ে বসল যে, ইস্কুল থেকে ফিরে বইখাতা রেখেই খালের দিকে ছুট। সন্ধে গড়িয়ে যায়। ছ'টায় বই নিয়ে বসার কথা। গরম কালে ছ'টায় সূর্য ডোবে না।

একদিন পটাপট নাদুসনুদুস সরপুঁটি উঠছে, আহ্লাদে আটখানা, সাড়ে ছ'টা পেরিয়ে সাতটা বাজে, খেয়াল নেই। বাড়ি ফিরতে-ফিরতে লণ্ঠন জ্বালানো হয়ে গেছে। ওখানে ইলেকট্রিসিটি ছিল না তখন। মা চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে পিঠে ঘা-কতক বসিয়ে ছিপটাকে কয়েক টুকরো করে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কিন্তু সরপুঁটিগুলোকে পরম যত্ন করে তুলে রাখলেন কালকে রাঁধবেন বলে। মায়ের প্রত্যেকটি কাজ ছিল বিবেচনাপ্রসূত এবং যথার্থ।

দিনাজপুরে জেলা স্কুলে ক্লাস সিক্স-এ ভর্তি হয়েছি। পায়ে হেঁটে ইস্কুল যেতে মাইল দুয়েক পথ। প্রথমে কুঠিবাড়ির আমবাগানের গণ্ডি পেরিয়ে সেই খাল, খালের ওপাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে মিস পিটার-এর বাড়ির পাশ দিয়ে, যাঁর দুটো বাঘা বাঘা কুকুর ছিল। তারপরে সুবিশাল ময়দান, তারপরে রেলস্টেশন, তারও পরে আমার স্কুল।

ইস্কুলের পাশেই হাসপাতাল, জানালা দিয়ে দেখা যেত হাসপাতালের একটি ঘর, লাশকাটা ঘর, তার একটা খোলা জানালা আমাদের বিশেষ ভয়ের উদ্রেক করত, কারণ কখনো-কখনো তার নীচে মোষে-টানা একটা টিনে-ঘেরা গাড়ি রেখে বেওয়ারিশ মৃতদেহ জানালা দিয়ে ধড়াম করে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হত। তারপর সে-গাড়ি যথাস্থানে চলে যেত, কবরখানা অথবা শ্মশানে। এখনকার কলকাতায় ভ্যানরিক্সায় চিৎ করে ফেলে শহরের রাস্তা দিয়ে বেওয়ারিশ মড়া নিয়ে যাবার মতো দৃষ্টিকটু ব্যবস্থা ছিল না।

এই হাসপাতালের একটা ঘটনা মনের মধ্যে রয়ে গেছে। একদিন শুনলাম হাসপাতালে একটা রোগি এসেছে। সে অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করতে গেছিল, পারেনি। জানাজানি হয়ে যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে আসা হয় এবং পাকস্থলিতে জল চালান করে যতটা সম্ভব অ্যাসিড বার করে দেওয়া হয়, কিন্তু ততক্ষণে ভেতরে যা-হবার হয়ে গেছে, বাঁচা খুব মুশকিল। হাসপাতালে ঢোকার ব্যাপারে কড়াকড়ি ছিল না। আমরা ছুটির পর দৌড়ে গেলাম দেখতে। লোকটা আধশোয়া হয়ে বিছানায় ধুঁকছে। চারপাশে আত্মীয়-স্বজন দাঁড়িয়ে। একজন নার্সদিদির কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, লোকটি একটি স্যাকরা। কারো কাছে গয়না গড়াবার অর্ডার নিয়ে কিছুটা সোনা চুরি করেছিল। ধরা পড়ে জেল খাটবার ভয়ে অ্যাসিড খেয়েছে।

আমাদের দিকে চোখ পড়তে লোকটি আমাদের হাতের ইসারায় কাছে ডাকল। তারপরে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "খোকাবাবুরা! একটা কথা বলি মনে রেখো, জীবনে কখনো চুরি কোরো না, চুরি কেন, কোনো রকমের অসৎ কাজই করবে না!" বলতে-বলতে ওর গলা দিয়ে কাশি উঠে এল, থুতু ফেলল একটা প্যানের মধ্যে, কালো রংয়ের

থুতু ! আমরা চলে এলাম। লোকটার চেহারা এবং কথা মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল।

দিনতিনেক পরে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে খালের ধারে বসে মাছ ধরছি, দেখি সেই লোকটি জনা-চারেক শববাহকের কাঁধে খাটিয়ায় চড়ে শ্মশান অভিমুখে চলেছে।

সারাজীবনের বিভিন্ন সময়ের এইসব ছোটো-ছোটো ছবি মনের মধ্যে ভাসে, ভুলতে পারি না।

আমার ছোটোভাইয়েব (পুপু) বযস তখন বছর দেড়-দুই। তাব বেশ কয়েকটি মহৎ গুণের মধ্যে একটি ছিল কিছু চমকপ্রদ গালাগালি (কাজের লোকেদের কোলে-কাঁখে বিচরণ করতে করতে সংগৃহীত), এবং আর একটি ছিল রাত্তির সাড়েসাতটা-আটটাব সময়ে কান্না জোড়া, যে-কান্নার কোনো কারণ নেই এবং বিবামও নেই। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। নটা দশটা এগারোটা বারোটা ... কান্না চলছে চলছে ... একটা দুটো আড়াইটে অবধি, বাবা-মা পালা করে তাকে কোলে করে বারান্দার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করছেন, পাড়াপড়শিরা মধ্যে মধ্যে খবর নিচ্ছে কী হল এবং বাড়ির পাশেই একটা পাগল থাকত, গণশা পাগলা, সে উচ্চৈঃস্বরে আমার মাকে গালাগাল দিচ্ছে, "বাঙ্কুসি! ছেলের কান্না থামাতে পারিস না, মা হয়েছিলি কেন?"

বাবা-মা ছেলেকে কোলে করে পায়চারি করছেন, এবং তাকে ভয় দেখিয়ে চুপ করাবার জন্য বাঘ, সিংহ, ভালুক, শেয়াল, সাপ, পোকা এবং নানারকম ভ্যারাইটির ভূতপেত্নিদের আকুল আহবান জানাচ্ছেন, শিগগিবই চলে এসে ওকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, ছেলে যে উত্তরকালে কত বড়ো নির্ভিক চরিত্রের হবে, তার জানান তখনি দিয়ে দিয়েছে। কান্না চলতেই থাকল।

এবম্বিধ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে হঠাৎ একদিন রাত্তির এগারোটা নাগাদ বাবার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। "গান শুনবি? গান শুনবি?" বলে ওকে গ্রামোফোনের কাছে নিয়ে গিযে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের একটা গান চালিয়ে দিলেন—"আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়"। দরবারি কানাড়া।

মন্ত্রের মতো কাজ হল। কান্না থেমে গেল, ছেলে চোখ গোল্লা গোল্লা করে গ্রামোফোনের দিকে তাকিয়ে রইল, খানিক বাদে ঘুমিয়ে পড়ল। বাবা বললেন, "যাক একটা ঘুমের ওষুধ পাওয়া গেল। ব্যাটা নিশ্চয় গত জন্মে গাইয়ে ছিল।"

'ব্যাটা' কিন্তু যথারীতি পরদিন আবার কান্না জুড়ল, বাবা আবার ওষুধ প্রয়োগ করলেন, কিন্তু কিছুই কাজ হল না। বরং হাত-পা ছুঁড়ে কান্না আরও বেড়ে গেল।

এই সময়ে, সন্ধে তখন সাড়ে-সাতটা, আমার সম্পর্কে-এক-মামা কুমুদচন্দ্র সেনের আবির্ভাব। এসেই বললেন, "কী, হাঁড়িচাঁচাটা চিৎকার শুরু করেছে তো?" বাবা বললেন, "আর বোলো না ভাই, এ কী বিপত্তি। রোজ এই অত্যাচার। এগারোটা অবধি চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে শেষে কাল রাত্রে জ্ঞান গোঁসাইয়ের দরবারি কানাড়া গানটা চালিয়ে দিতে চুপ করে গেল। আজকে আর চুপ করছে না। আজ সেই গানটাই তিনবার চালালাম, ভবি ভোলবার নয়।"

কুমুদমামার চিন্তাশক্তি এবং রসবোধ খুবই তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি বললেন, "আজ কেন

কাজ হচ্ছে না বুঝলেন না? দরবারি কানাড়া গভীর রাত্রের রাগ, তার ক্রিয়া গভীর রাত্রেই হবে। সন্ধে সাতটা-সাড়ে-সাতটাতে কিস্‌সু হবে না। আমাদের দেশের প্রবীণ সংগীতজ্ঞরা কি কিছু না-চিন্তা করেই এইসব রাগের সময় নির্ধারণ করে গেছেন? রাত বারোটায় গানটা চালিয়ে দেখুন।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেদিন রাত বারোটাতেও সেই গান চালিয়ে কোনো ফল হল না। কুমুদমামা চুপ করে গেলেন। আমার এই কাঁদুনে ভাইটিকে আপনারা সবাই চেনেন। সে হল এখনকার দিনের বিশিষ্ট গায়ক ওস্তাদ দিলবাদ খাঁ। তাঁরই স্ত্রী সুগায়িকা পরভিন সুলতানা।

এরই সঙ্গে মনে পড়ে যায়, স্কুলে যাবার পথে মিস পিটার-এর বাড়ির কথা। উনি মিশনারি সন্ন্যাসিনী ছিলেন। বাড়িতে আর কেউ ছিল না, ছিল দুটো বাঘা বাঘা কুকুর। বাড়ির পাশ দিয়ে গেলেই তাদের গর্জন শুনে বুক কাঁপত। এত যে তেজ, মিস পিটারের মৃদু কণ্ঠের ভর্ৎসনাতে একমুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে যেত, বাচ্চা ছেলে হয়ে যেত ওরা। একদিন যাবার পথে দেখি ওঁর বাড়িতে হুলুস্থুল কাণ্ড। ওঁর একটি কুকুরের ল্যাজের একেবারে গোড়াতে কে একটা বাচ্চাদের খেলনা বেঁধে দিয়েছে, একটি অতিশয় ছোট্ট ঢোলের মতো, তাতে কয়েকটা নুড়ি পোরা আছে। নড়লে-চড়লেই সেটা কিড়কিড়িয়ে বেজে উঠছে, আর কুকুরটা ক্ষেপে অস্থির! চ্যাঁচাচ্ছে আর চক্কর কাটছে, ধনুকের মতো বেঁকে মুখ গিয়ে সেটাকে খুলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ল্যাজের আগা হলেও কথা ছিল, নিজের ল্যাজের গোড়াতে মুখ লাগাবার সাধ্য দুনিয়ার কোনো কুকুরেরই নেই, বেড়ার পাশে লোক জমে গেছে, কেউ হেসে কুটিপাটি হচ্ছে, কেউ কেউ গবেষণা করছে এরকম একটা বাঘা কুকুরের ওইখানটায় খেলনাটা কে বাঁধল এবং কী করে বাঁধল! উত্তরকালে কুকুর বা বেড়ালের ল্যাজে চিনে-পটকা বাঁধার কথা শুনেছি। কিন্তু একেবারে গোড়ায় তা করা দুঃসাধ্য, বিশেষত অত বড়ো কুকুরের।

মিস পিটার দু-একবার কুকুরটাকে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করছেন, গলাটা ধরবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কুকুর এমনই অস্থির হয়ে গেছে যে তার লাফালাফিতে উনি ছিটকে গিয়ে অসহায়ভাবে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জল্পনা-কল্পনা বেশ জমে উঠেছে। একটা রোগা প্যাংলা মতন ছেলে বেড়ার ধারে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হঠাৎ খ্যাঁক্-খ্যাঁক করে হেসে দৌড় লাগাল। সকলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওই ব্যাটা শয়তানই এসব করেছে, ধর ধর।"

ধরে ফেলা গেল। ধরে তাকে বলা হল, লাগিয়েছিস, এবার খুলে দে!

সে বলল, পা(ই)র্‌বনি।

—কেন? তাহলে বেঁধেছিলি কেমন করে?

—জাগা কুকুরের ল্যাজের হোথায় আমার বাবাও পা(ই)র্ ত না লাগাতে। কুকুরটো বারান্দার ধারে ঘুম্মে ছেল, ল্যাজ ঝুলছিল বারান্দার ধারে বাগানে। কিটকিটির ফাঁস ল্যাজের আগা দিয়ে আলগোছে গ(ই)ল্যে দিয়ে সড়াক করি একটানে গোড়া অব্দি নে গিয়ে মার‍্যেছি খ্যাঁচ্। আটকে গিয়েছে। ত্যাৎক্ষণে ঘুম ভাঙ্গ্যে কুকুর ঘাউ করি লাফ্যে উ(ই)ঠেছে। ফাঁস তাতে আরো ভালো করি আইট্‌কেছে, এখন খোলো কার বাবা!

এই পর্যন্ত শুনে আমি স্কুলমুখো রওনা দিলাম। বিকেলবেলায় ফেরার সময় দেখি মিস পিটারের বাড়িতে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। 'কিটকিটি 'কুকুরের ল্যাজ থেকে নিশ্চয় অপসারিত হয়েছে। কে সেই অসাধ্যসাধন করল জানি না।

দিনাজপুরে আমার অন্যতম আকর্ষণ ছিল কালীতলায় কুমুদমামাদের বাড়ি। শহরের দক্ষিণতম প্রান্তে আমাদের বাসা আর কুমুদমামারা থাকতেন উত্তরপ্রান্তে। আন্তরিকতায়, আতিথ্যের উষ্ণতায় এবং পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসার টানে দুটি পরিবারের অবস্থানগত দূরত্ব কেমন করে যেন অন্তর্হিত হয়েছিল। এই বর্ধিষ্ণু বৈদ্য পরিবারের আমরাও সদস্য হয়ে উঠেছিলাম। এখানে এলে আমরাও এতটাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম যে বাবা-মাও অনেক সময় আমাদের কালীতলার বাড়িতে রেখে পরম নিশ্চিন্তে ইতিউতি বেড়াতে চলে যেতেন। তখন আর আমাদের পায় কে? আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবে সদা-মুখরিত এই আনন্দনিকেতন সর্বদাই আমার কাছে ছিল এক বাঞ্ছিত পিকনিক স্পট। এই বাড়িতে এসে আমরা খোলা হাওয়ার স্বাদ পেতাম। আর স্বাদ পেতাম দিদার (শ্রীমতী উষা সেন) নিত্যনতুন বিচিত্র রকমারি সুস্বাদু রান্নার। সেসব কথা ভোলার নয়। বাড়ির কর্তা ছিলেন কুমুদমামার বাবা শ্রদ্ধেয় ক্ষীরোদচন্দ্র সেন। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার। ডজনখানেক মামা-মাসির মধ্যে কুমুদমামা ছাড়া মঞ্জুমাসি, সাবিমাসি, বদ্যিনাথমামা, শংকরমামা ও শম্ভুমামার সঙ্গে নৈকট্য ছিল বেশি। বদ্যিনাথমামা ও শংকরমামা ছিলেন অনায়াস বৃক্ষবিহারী। ফলে ভাগ্নের ভাগ্যে জুটত কাঁচামিঠে আম, নানা ধরনের কুল, পেয়ারা, লিচু, আম ইত্যাদি। এসব ছাড়াও এমন কিছু ফল যা নাকি এখনকার ছেলেমেয়েরা চোখেই দেখেনি। যেমন, গাব, নোনা (আতার একটি অনভিজাত জ্ঞাতি), ডাউয়া, রেহিয়াল (রোমাঞ্চকর টকমিষ্টি স্বাদের ছোটো ফল), বৈঁচি, ফলসা, বনকুল, ট্যাপারি, আঁশফল ইত্যাদি। এই বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে গানবাজনা, খেলাধূলা, নানা শিল্পকর্মের প্রতি আগ্রহ ছিল। এগুলোও আমাকে আকর্ষণ করত। বাড়িতে রাজনীতি-সচেতন, স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন। বদ্যিনাথমামা তেভাগা আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেল খেটেছেন। এ-বাড়ির মেয়ে সাবিত্রী সেন (সাবিমাসি) ছিলেন চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা। তাঁরই স্বামী সুশীল সেন তেভাগা আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ ও জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক। স্বাধীনতার আগে কত বছর কারান্তরালে, কতকাল অন্তরীণ অবস্থায় আর কতকাল আত্মগোপন করে তাঁর কেটেছে তার হিসাব আমি জানি না। তবে এটুকু জানি যে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই কষ্টকর জীবন তিনি বেছে নেননি, আদর্শের আলিঙ্গনেই তাঁর এই সংগ্রামী জীবন। আমার দেখা দিনাজপুর একদিকে যেমন ছিল রাজনীতি-সচেতন, অন্যদিকে তেমনি ছিল খেলাধুলো ও নানারকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সদাই মুখর। আজ থেকে আশি বছর আগেও সেখানে দু-দুটো স্থায়ী নাট্যশালা ছিল। আর দিনাজপুর ছিল সম্প্রীতির শহর। শুনতে পাই দেশজোড়া এত সাম্প্রদায়িক হানাহানির ভিতরেও দিনাজপুরে আজ অবধি একটিও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি। এ বড়ো কম কথা নয়। আরও একটি কারণে দিনাজপুর আমার স্মৃতিতে চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তা হল কাঞ্চনগর—দিনাজপুর শহর থেকে মাত্র কয়েক

কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অবস্থানটি মনোরম। ছোট্ট কান্তনগর চারপাশে ঢেপা নদী দিয়ে ঘেরা। মন্দিরের সংশ্লিষ্ট মানুষজন ছাড়া অন্য কেউ আজও সেখানে বাস করেন না। বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া রাজা গণেশ প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুরের রাজবংশের কুলদেবতা কালিয়াকান্ত জিউ (শ্রীকৃষ্ণ)-এর নামানুসারে এই স্থান ও মন্দিরের নামকরণ করা হয়েছে। যারা বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির ভগ্নমন্দির দেখেই বাহবা দেন পাসপোর্ট-ভিসার বেড়াজাল অতিক্রম করে তাঁদের একবার কান্তনগরের পোড়ামাটির সুউচ্চ এবং অক্ষত মন্দিরটি দেখে আসার অনুরোধ জানাই। আমি প্রত্নতাত্ত্বিক নই, তবু আমার মতে এটি অবিভক্ত বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পোড়ামাটির মন্দির। নাম-না-জানা শিল্পীরা আশ্চর্য দক্ষতায় মন্দিরের গাত্রে সমগ্র রামায়ণ এবং মহাভারতের কাহিনীকে পোড়ামাটির কাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হলেও বাংলাদেশ সরকার এই মন্দিরের সংরক্ষণ ও নিত্যপুজোর ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। শুধু তাই নয়, কান্তনগরকে বাংলাদেশের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান হিসাবে সারা বিশ্বে প্রচার করে থাকে সে দেশের পর্যটন বিভাগ।

আমায় কেউ লোভাতুর ভাবলেও আমি নাচার, কারণ আমার স্মৃতিতে কান্তজির ভোগের কথা এখনও উজ্জ্বল। দারুণ সুগন্ধযুক্ত কাটারিভোগ চালের ভাত, কুমড়োর ছক্কা, নিরামিষ তরকারি, পায়েস প্রভৃতির অপরূপ গন্ধ যেন বহুযুগ পার হয়ে আজও চোখ বুজলেই পেয়ে থাকি, জিভটাও জলে ভরে যায়। এসবের স্বাদ যে না-পেয়েছে তাকে বোঝানো অসম্ভব। তাছাড়া আয়ত্তাতীত রসমাধুরী চিরকালই অমৃতময় লাগে। কান্তজি বছরে একবার কান্তনগর ছেড়ে ক'দিনের জন্য দিনাজপুর শহরের বিশাল রাজবাড়িতে অবস্থান করতেন। সে সময়ে প্রতিদিন প্রসাদ হিসাবে সুবিশাল আকারের 'পুরি' বিতরণ করা হত। এত বড়ো এবং এত সুস্বাদু পুরি আমি ভূভারতে কোথাও দেখিনি। শুধু খাওয়া নয় কান্তজিকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীর এক বৃহৎ মিলনমেলা বসে যেত। বড়ো সাধ জাগে আর একবার, শুধু একবার সেই মিলনমেলায় মেতে উঠতে!

কাঞ্চন নদী, কুঠিবাড়ি, কালীতলা, বড়ো ময়দান, রাজবাড়ি, কান্তনগর এসব আজ জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়েও আমায় স্মৃতিভারাতুর করে তোলে। স্মৃতি সততই বেদনার কি না জানি না, তবে দিনাজপুরের স্মৃতি আজও আমায় আনন্দসাগরে অবগাহনের অনুভূতি এনে দেয়।

সে-সময়ে গরমের ও পুজোর ছুটিতে কলকাতায় মাতুলালয়ে গিয়ে কাটানো একটা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার ছিল। সে-সময়ে একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার, সেটা খুবই মর্মান্তিক। চালের দাম বাড়তে বাড়তে পৌঁছল চল্লিশ টাকা মন-এ, অর্থাৎ আজকালকার হিসেবে পাঁচ সিকেয় এক কেজি। এ-যুগের মানুষ এই দামে চাল পেলে ভাববেন স্বপ্ন দেখছেন, কিন্তু তখনকার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থায় এই দামই দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষেরা চাল সংগ্রহ করতে না-পেরে নানা

আমাব গুরুদেব শ্রীবাধিকামোহন মৈত্র

প্রকারের বনজ জিনিস খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল এবং দলেদলে শহরে এসে ভিড় করল। ভিক্ষা চাই। ক'জন লোককে একটা গৃহস্থ বাড়ি ভিক্ষা দিতে পারে? চালের অভাবে ভাতের ফ্যান দেওয়া হতে লাগল। আমার মাতামহীকে ফ্যানের মধ্যে একটু নুন-মশলা দিয়ে তাকে একটু সহজগ্রাহ্য করে তুলতে দেখতাম। মাতামহের পরিবার তখন ২৯/এ, বালিগঞ্জ প্লেসের বাসিন্দা।

পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খোলা হল। বালিগঞ্জ প্লেসেও। চাল-ডাল-খুদকুঁড়ো-আনাজপাতি দিয়ে একটা প্রকাণ্ড কড়াইয়ে খিচুড়ি রান্না হত, হাতায় করে তা ঢেলে দেওয়া হত বুভুক্ষু মানুষগুলির বাড়িয়ে দেওয়া সরা কিংবা টিনের মধ্যে। মামাদের সঙ্গে আমরা দশ-বারো বছরের ছোকরারাও এই কাজে ভলান্টিয়ারি করতাম। মনে পড়ে, প্রায়ই খিচুড়ি শেষ হয়ে যেত। যারা পেল না, তাদের কণ্ঠে উঠত এক সমবেত আর্তনাদ। সেই আওয়াজে আমাদের দুপুরবেলায় খাওয়া মুশকিল হত। গলা দিয়ে ভাত গলতে চাইত না অনেকেরই।

এই মানুষগুলির মধ্যে একজনকে আমার খুবই মনে ধরেছিল। সম্পূর্ণ সাদা চুলদাড়ি, মুখের ভাষা খুবই মার্জিত এবং মৃদু। গরিব হলেও ভালো বংশের কেউ হবে। মন্বন্তর তাকে ঘরছাড়া করেছে। আমাকে সে কেন জানি না ডাকত রাজাবাবু বলে। উত্তরজীবনে কোনো ব্যাপারেই রাজা যে হতে পারব না, সে-কথা আট-নয় বছরে জানব কী করে? তাই তার মুখে এই ডাক শুনে রোমাঞ্চিত বোধ করতাম। এবং মামাদের তর্জন-গর্জন উপেক্ষা করে চোরাগোপ্তা তাকে আর-এক হাতা খিচুড়ি দিতাম। এর বেশি আর কী

প্রতিদান দেব?

একদিন হঠাৎ দেখলাম সে আসেনি। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম হয়তো আর কোথাও খেতে পেয়েছে। কিন্তু পরদিনও যখন তার দেখা পেলাম না, তখন আর থাকতে পারলাম না। প্রজার সন্ধানে এদিক-ওদিক দৌড়লাম।

ওরা সাধারণত ফুটপাথে, কারো বাড়ির দাওয়ায় বা আক্ষরিক অর্থেই গাছতলায় থাকত। খুঁজতে খুঁজতে বালিগঞ্জ প্লেসেরই একটি মাঠে এক গাছতলায় তার সন্ধান পেলাম, চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে আছে।

দৌড়ে গিয়ে খানিকটা খাবার নিয়ে এলাম। খাবার আর কী— সেই খিচুড়ি। তার কাছে নিয়ে আসতেই সে যা বলল তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ভেবেছিলাম, সে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে সে বলল, "সরিয়ে নিয়ে যাও বাবা, আমার আর খাবারের দরকার নেই।" সন্ধ্যা অবধি কয়েকবার সাধলাম, সে কিছুই খেল না।

পরের দিন যখন সকালে তার কাছে ছুটলাম তখন সে প্রাণহীন। কতকগুলি লোক তার মৃতদেহ উঠিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে— পুলিশ না কর্পোরেশন, কারা তা জানি না। সেদিন আর ভাত খেতে পারলাম না। ভাতের থালার সামনে বসে কানে বাজতে লাগল তার সেই কাতরোক্তি— "সরিয়ে নিয়ে যাও বাবা, আমার আর খাবারের দরকার নেই।" লোকটি কি আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিল?

এই ঘটনাটি সময়ের প্রবাহে ক্রমশ স্মৃতির থেকে অনেক দূরে চলে গেল, মিলিয়েই গেল। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর পঁয়ত্রিশ বছর পর আরেকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে ভগবান একদিন সেই বৃদ্ধের সংলাপটি হুবহু আর-একজন মানুষের মুখ দিয়ে শুনিয়ে আমাকে চমকে দিয়েছিলেন।

যাঁর মুখে কথাটা শুনলাম তিনি আমার বাবা। দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত। এবং সেইদিনই হয়ে দাঁড়াল তাঁর জীবনের শেষ দিন। যদিও তিনি ক্যান্সারের একেবারে অন্তিম পর্যায়ের সেই ভয়াবহ অবস্থায় কখনো পড়েননি। ঈশ্বরের দয়ায় এবং আমার দীক্ষাগুরু এক মহাপুরুষের কৃপায় (এঁর কথা যথাসময়ে বলব) তার আগেই পাড়ি দিয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা সবই তখনো মোটামুটি ঠিক ছিল।

ক্যান্সারের সঙ্গে বাবা প্রাণপণে এক দুঃসাহসিক লড়াই করেছিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এই রোগকে যতদিন সম্ভব ঘাড়ে চড়ে বসতে দেবেন না। ডাক্তারি শাস্ত্রে যত রকমের গোলাগুলি আছে, যথা কাটাকুটি, রেডিয়েশন, কেমোথেরাপি—কোনোটারই প্রয়োগে কাবু হননি। বড়োনাতির মাধ্যমিক পরীক্ষা তাঁকে দেখে যেতেই হবে। শরীর রক্ষা করার জন্য একরকম জোর করেই খাওয়া-দাওয়া করতেন।

বাবা একটু ভোজনরসিক ছিলেন। কিন্তু অতিভোজন কখনোই করতেন না। চিনে খাবার তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল, মধ্যে মধ্যেই এনে তাঁকে খাওয়াতাম। সেদিন দুপুরবেলায় কিছু চিনে খাবার নিয়ে এসে তাঁর সামনে থালায় রাখা হল।

বাবা হঠাৎ আমাকে বললেন, "সরিয়ে নিয়ে যা বাবা, আমার আর খাবারের দরকার নেই।"

কথাটি আমাকে এক ধাক্কায় বালিগঞ্জ প্লেসের সেই গাছতলায় পৌঁছে দিল, যেখানে পড়ে ছিল সেই মুমূর্ষু বৃদ্ধ। দুটি ক্ষেত্রই ঘটনাচক্রে অবিকল এক। প্রাণপণে জীবনকে আঁকড়ে ধরে থেকে শেষে অসহায়ভাবে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ।

সেইদিনই বিকেলবেলায় বাবা চলে গেলেন। বড়োনাতির মাধ্যমিক পরীক্ষার তেরোদিন আগে।

দিনাজপুরের পরে আমরা যাই রাজশাহিতে, যেখানে আমার গুরুদেব রাধিকামোহন মৈত্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

রাজশাহিতে আমার একজন পিসেমশায়ের বাড়ি ছিল। তাঁকে বাবা স্থানীয় সংগীতজ্ঞদের কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, "কেন, আমাদের রাধু তো রয়েছে! নাম শোনেননি? ওকে নিয়ে আসব একদিন আপনার বাড়ি।" বাবা বললেন, "উনি তো অত বড়ো নামি শিল্পী, আমার বাড়িতে কি আসবেন?" গুরুদেবের বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, তখনই তিনি যথেষ্ট বিখ্যাত হয়েছেন। পুরুষমানুষ যে কতটা সুন্দর হতে পারে তাঁকে না-দেখলে অনুমান করা কষ্টকর ছিল। সেই চেহারা এবং ঝকঝকে তলোয়ারের মতন একটি যন্ত্র নিয়ে নীল রংয়ের ব্যুইক গাড়ি চড়ে তিনি আমাদের বাড়ি এলেন এবং বাজালেন। সরোদ যন্ত্রটি প্রথমবার দেখলাম ও শুনলাম। শুনেই বায়না ধরলাম, আমি ওটা শিখব। আমার বয়স তখন দশ-এগারো হবে।

বাবা বিপন্ন হয়ে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন—এ যন্ত্রটার ঘাট নেই, বাজানো খুব মুশকিল। ভারতবর্ষে খুব অল্প লোকেই বাজায়। তা ছাড়া অল্পকাল বাদে তিনি আবার বদলি হয়ে গেলে সেখানে কোথায় সরোদের মাস্টার জুটবে? কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। মধ্যে মধ্যেই ঘ্যানঘ্যান করতে লাগলাম। এবং একদিন সহসা এই ঘ্যানঘ্যানানির মধ্যেই গুরুদেবের আমাদের বাড়িতে পদার্পণ। তিনি তখন বাবার খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছেন।

ব্যাপারটা অনুধাবন করে তিনি বাবাকে বললেন, "দিন না ছেলেটাকে, একটু চেষ্টা করে দেখি।" বাবা কতকগুলি সময় বড্ড কড়া কথা বলে ফেলতেন। উনি বললেন, "মশায়, গরিব কেরানির ছেলেটার মাথাটা খাবেন না। ওর বাবার জমিদারি নেই। ওকে চাকরি-বাকরি করে খেতে হবে। স্কুল-কলেজ আছে, বাজনায় ঢুকলে ও গোল্লায় যাবে।" রাধুবাবু সে-কথা গায়েই মাখলেন না। উত্তর দিলেন, "কেন আপনার আশীর্বাদে আমি তো কিছুটা লেখাপড়া করেছি (M.A., B.L.)। আমার থেকেও কঠিন পড়াশুনো এবং কাজের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন হিরুদা (হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)। আপনার ছেলে পড়াশুনো করেই বাজাবে। আপনি বাজি ধরবেন?" বাবা বললেন, "পাঁচ হাজার টাকা।" উত্তরকালে সে-বাজি আর গুরুদেব বাবার কাছ থেকে আদায় করতে পারেননি।

যাই হোক, গুরুদেব তাঁর নিজের বাল্যকালের যন্ত্রটি আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন এবং কোনো অনুষ্ঠান (যাকে সংগীতের ভাষায় বলে গাণ্ডা বাঁধা) ছাড়াই আমার তালিম শুরু হল। আর চলতে থাকল মধ্যে মধ্যে বাড়িতে গানবাজনার আসর—গুরুদেবের

এবং তাঁর রাজশাহির বন্ধুদের।

এই সময়েই প্রথমবার সজ্ঞানে 'মিউজিক কনফারেন্স' নামক ব্যাপারটার সঙ্গে পরিচয় হল। রাজশাহির 'অলকা' সিনেমা হলে বার দুয়েক। গুরুদেব ও তাঁর বন্ধুরা মিলে 'আষাঢ়ে ক্লাব' নামে একটি সংস্থা গড়েছিলেন, তাঁদের ব্যবস্থাপনায়। পরের বার বন্ধুরা ঝগড়াঝাঁটি করে আলাদা হয়ে গেলেন। গুরুজির দলের ক্লাবের নাম হল 'স্বতন্ত্রা'। এই দুটি সম্মেলনের বহু ঘটনা স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে, কোনটা কোনবার ঘটেছিল তা বলতে পারব না।

কনফারেন্সের উদ্‌ঘাটন হচ্ছে। করছেন একজন প্রবীণ জমিদার, গুরুদেবের কোনো আত্মীয়। ভদ্রলোকের একটু পানদোষ ছিল। একেবারে চুর হয়ে মাইকের সামনে এসেছেন। —"ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ! আপনারা যে সকলে আজ এই অলকা সিনেমা হল... আলো করে সমবেত হয়েছেন... এ রাজশাহির ইতিহাসে এক স্মরণীয়... আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য... এর সঙ্গে ভারতের বহু ডাকসাইটে গুণীজন... (সামনের বেঞ্চে উপবিষ্ট ওস্তাদবৃন্দের দিকে তাকিয়ে হিন্দিতে) আপ লোগ সব আ গিয়া হ্যায়... (দর্শকবৃন্দ: বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা, হুয়া হ্যায়)... এরা আয়োজন করেছে... শাস্ত্রে বলে স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে... তেমনি... আমার এই পুত্রবৎ রাধু... অ্যাই রাধু, কোথায় গেলি? কী আশ্চর্য, এরপরে কী বলব?..."

গুরুজি তখন স্টেজ ছেড়ে চম্পট দিয়েছেন।

কুড়ি বছর বয়স্ক আলি আকবর খাঁ সাহেব, ট্রেন দেরি করে আসায় সোজা কোট-প্যান্ট পরে স্টেজে হাজির। আহম্মদ জান থেরাকুয়ার তবলা সংগতে বাজালেন। পুরিয়াকল্যাণ, ধামার এবং জিলা। কোনোটাই বোঝার সাধ্য হয়নি আমার তখনো। ঝড়ের মতন বাজিয়ে গেলেন।

বড়ে গোলাম আলি খাঁ যখন স্টেজে এসে বসলেন তাঁর চেহারার সঙ্গে সংগীতের কোনো সম্পর্ক আছে বলে ভাবতে পারলাম না। বিশাল মোটা চেহারা, কালো রং, উড়ন্ত ডানা-মেলা চিলের মতন ইয়া গোঁফজোড়া, হাতে একটা বেঁটে লাঠি, মাথায় কালো লোমের ফেজ টুপি। পেছন থেকে কে যেন বলল, "একটা তুলোর বস্তা এসে বসল রে!" খাঁ সাহেবের কোলে একটা যন্ত্র, দেখতে পিঁড়ির মতন। সেটাকে বাঁধতে শুরু করতেই হলের কলরব অনেকটা চুপ করে গেল। তারের থেকে কয়েকরকম আওয়াজই শুনেছি; সেতার, তানপুরা, সরোদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু এরকম মধুঝরা আওয়াজ তো শুনিনি? বাঁধা শেষ করে খাঁ সাহেব মিনিট খানেক টুং-টাং করে বিভিন্ন তারকে ছাড়লেন, একটা গান অথবা গৎ যেন বেরিয়ে এল যন্ত্রটার ভিতর থেকে। শেষকালে তারসপ্তক থেকে মন্দ্রসপ্তক পর্যন্ত একটানে সুরের একটা ঝরনা। হল তখন একেবারে স্তব্ধ। কিন্তু আরো বাকি ছিল। গলা যখন ছাড়লেন তখন আমার মতন অর্বাচীনেরও শরীর হিম হয়ে গেল।

গোলাম আলি সাহেবের প্রথম গানের প্রথম কথাগুলি ছিল 'কোয়েলিয়া বোলে'। আমি তখন সা-রে-গা-মা'য় কোনওমতে আধসেদ্ধ হয়ে দেড়খানা গতের মালিক। কিন্তু

গুরুজির বাজনা যা মনে ছিল তার থেকে অনুমান করলাম মালকোষ হবে।

সংগীতসমুদ্রে আমার সেই প্রথম সত্যিকারের অবগাহন। গান কতক্ষণ চলেছিল জানি না, কিন্তু আমার নড়েচড়ে বসবার শক্তিও ছিল না—এইটুকু মনে আছে। স্বর নিয়ে অনেক রকমের কসরত ইতিমধ্যে শুনেছি। অনেককিছুই তখনো বুদ্ধির বাইরে, যেমন গানের ব্যাকরণ বা বিভিন্ন ক্রিয়া। কিন্তু সেই প্রথম উপলব্ধি করলাম, সত্যিকারের গান ব্যাকরণ না-জানা লোককেও কীভাবে স্তব্ধ করতে পারে।

অভিজ্ঞতার তখনো অনেক বাকি ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে একটি বিচিত্র কথোপকথন কানে এল, গলায় কম্ফর্টার জড়ানো দুই প্রবীণের কাছ থেকে .

"কেমন! হল তো? আরে আমি তখনই বলেছিলাম... রাধুর কাণ্ড... কোথা থেকে সব লোক ধরে ধরে নিয়ে আসে... হুঁ, মোষের মতো চেহারা, উনি গাইবেন মালকোষ... বলি মালকোষটা হল কোথায় যে খুঁজে পেলি?"

"ঠিক বলেছিস ভাই... কিছুই বুঝতে পারলাম না... আমাদের কানাকেষ্টর 'ফিরে চলো আপন ঘরে'-র সঙ্গে কোথাও কোনো মিল নেই!"

পরে, বহু বছর পরে, আস্তে আস্তে উপলব্ধি হয়েছে, এই দুই বৃদ্ধ শ্রোতা এখনো বেঁচে আছেন আমাদের এখনকার কিছু কিছু সংগীত সমালোচকের মধ্যে।

গোলাম আলি খাঁ সাহেব সম্বন্ধে বহু কিছু পরে বলবার রইল।

ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ এসে বসতেই সমস্ত স্টেজটা হয়ে গেল চোস্ত উর্দু উচ্চারণে 'দরবার গোয়ালিয়র'। টকটকে দুধে আলতায় গোলা রঙ, বাদশাহি বেশ, মাথায় সাদার ওপর জরির কাজ করা টুপি একটু কাত করে বসানো। প্রথমে টোড়ির আলাপ। ওঁর কাছে এর থেকে লম্বা আলাপ এর পরে আর শুনিনি। গৎ কোন কোন রাগে বেজেছিল মনে নেই। মনে আছে ঝালার কথা। ঝালার প্রতি চারটি দানার মধ্যে প্রথমটির থেকে বাকি তিনটি একটু দূরে সরানো। ফলে তার একটি অননুকরণীয় চাল, যেটা কথায় বোঝানো মুশকিল। দ্রুতগতি মোটেই নয়, মধ্যগতিতেই তার শব্দসুষমা, লয় বাড়ালে তাকে রাখা মুশকিল হবে।

বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব

কোনোকালে তাঁর দ্রুত ঝালার সাথে তাল রাখতে গিয়ে একজন পাখোয়াজির স্ট্রোক হয়ে পাখোয়াজের ওপরই ঢলে পড়ে মারা যান বলে শোনা যায়। তবে তিনি ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হাফিজ আলি, পঁয়ষট্টি বছরের নন। শেষকালে একটি বিলিতি ব্যান্ড বাজালেন—তার আগে বললেন, ''ইয়ে লেডিজ লোগ কে লিয়ে।''

ফিনফিনে আদ্দির গিলে-করা পাঞ্জাবি ও কোঁচানো ধুতি পরে দুই বাঙালি তরুণ স্টেজে এসে বসলেন। একজনের হাতে সেতার, অন্যজনের হাতে তবলা। ওই স্ট্যান্ডার্ডের সেতার সেই প্রথম শুনলাম। তবলা যিনি বাজালেন তাঁকে পরে আরো বেশ কয়েকবার স্টেজে দেখলাম—একবার শচীন দেববর্মনের সঙ্গে, একবার বাঁশরী চক্রবর্তীর (পরে বাঁশরী লাহিড়ি, অপরেশ লাহিড়ির স্ত্রী ও বাপী লাহিড়ির মা) সঙ্গে, শেষে আমার গুরুর সঙ্গে। প্রত্যেকবার মনে হল তবলা যেন গান বা বাজনার সাথে কথা বলছে। পরে শুনলাম সেতারির নাম মুস্তাক আলি খাঁ আর তবলিয়া কেরামৎউল্লা খান—কেউই বাঙালি নন!

গেরুয়া জামাকাপড় পরা দাড়িওয়ালা একজন ভদ্রলোককে স্টেজে তবলা নিয়ে বসতে দেখে আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সন্ন্যাসীরা কি তবলা বাজায়? উত্তর এল, ''ইডিয়টের মতো কথা বলিস না। উনি সন্ন্যাসী নন, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। তা ছাড়া সন্ন্যাসীরা গানবাজনা করবে না-ই বা কেন? তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামী সন্ন্যাসী ছিলেন জানিস?''

জ্ঞানবাবুর কাছাকাছি আসার সৌভাগ্য পরে আমার হয়েছিল, সে আর এক অধ্যায়।

এই কনফারেন্সের সঙ্গে বরাবর জড়িয়ে থাকত গুরুদেবের বহু গায়ক-বাদক বন্ধুদের উপস্থিতি, এলাহি খাওয়া-দাওয়া আর আড্ডা। আড্ডার বিষয়বস্তু একটাই, গানবাজনা এবং তৎসম্বন্ধীয় নানা গল্প, আলোচনা, ঠাট্টা এবং উইটের ছড়াছড়ি। কলকাতা থেকে আসতেন বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (গায়ক), মণ্টু ব্যানার্জি (হারমোনিয়াম বিশারদ), কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (গায়ক), শিবপুরের রথীন চট্টোপাধ্যায়, মুস্তাক আলি খাঁ (সেতার) কেরামৎউল্লা খাঁ (তবলা) এবং আরো অনেকে। এই ধরনের আড্ডা, দুঃখের বিষয়, আজকাল লুপ্ত হয়ে গেছে। দু-একটি যদিও কালেভদ্রে হয়, সেগুলি ওরকম ফলপ্রসূ নয়। আজকালকার সংগীতজ্ঞদের হয় সেই ইচ্ছেটাই নেই, নয় তো সময় নেই। অনেকের মধ্যে মুখ দেখাদেখিও বন্ধ, কাজেই আড্ডা আর কী করে দানা বাঁধবে!

এইসব আড্ডায় যে-সমস্ত কর্মকাণ্ড হত তার মধ্যে লঘু-জাতীয় একটি হচ্ছে, শুধুমাত্র সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি দিয়ে কে কত বাক্যরচনা করতে পারে। দু-একটা নমুনা এখনো মনে আছে, হয়তো সংগীত-সমাজে এর প্রচলনও হয়েছে।

''গা রে গাধা, গা!''

''মামা পারেনি রে, মামা পারেনি।''

''মামা গাধা, ধামা সারে!''

''অমুকে মালকোষ গাইতে গিয়ে কতবার যে নির্বিচারে 'মা'য়ের গায়ে 'পা' লাগাল তার ইয়ত্তা নেই, কত বড়ো পাপিষ্ঠ!''

হাফিজ আলি খাঁ সাহেব

একদিন এইরকম আড্ডায় মৃদুভাষী ভদ্রলোক রথীন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে সবাই হঠাৎ উঠে-পড়ে লাগলেন।

রথীনবাবু ইনসিওরেন্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শোনা গেল তিনি নাকি একবার তাঁর গুরু ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ-কে লাইফ ইনসিওরেন্স করাবার চেষ্টা করেছিলেন। উনি যতই চেষ্টা করছেন, ফৈয়াজ খাঁ সাহেব কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, মধ্যে মধ্যে কিছু টাকা একটা 'কম্প্‌নি'কে উনি 'খামোখা' দেবেন কেন। তার ফায়দাটা কী?

অগত্যা ফায়দার নানাদিক রথীনবাবু ওস্তাদকে হৃদয়ঙ্গম করাবার চেষ্টায় লাগলেন। প্রথমে বললেন, এভাবে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিয়ে কোম্পানির কাছে বিশ বছরে কত হাজার টাকা জমবে সেটা কি ওস্তাদ বুঝতে পারছেন না? কত টাকা পাবেন বলুন তো?

ওস্তাদের সাফ জবাব, "আরে কম্‌বখত্‌, সে তো আমি আমার 'জেব'-এ বা 'পেটি'তেও বিশ বছর ধরে জমাতে পারি—ইয়ে বেহুদা কম্প্‌নি কো কাহে দেঙ্গে?"

বিশ বছর পার হবার আগেই যে মারাত্মক ঘটনা ঘটলে ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে সত্যিকারের ফায়দাটা আসবে, সেটা রথীনবাবু প্রবল সংকোচের জন্য মুখ দিয়ে বার করতে পারছেন না। জিভের ডগায় এসেও আটকে যাচ্ছে, হাজার হলেও ওস্তাদ তো?

শেষকালে ওস্তাদের একজন দুঃসাহসী অনুচর রথীনবাবুকে এই জট থেকে উদ্ধার করলেন।

"হুজুর, জিন্দা রহ্‌নেসে তো উয়ো রুপিয়াকে লিয়ে বিশ সাল ইন্তেজার করনা

পড়েগা, লেকিন ইস্‌ বিচ্‌ মে, ইয়ানি দো-তিন সাল কো অন্দর হি, খোদা না করে হুজুর, আপকা ইন্তেকাল হো যায়ে তো উসি বখ্‌ত হি পুরা পয়সা আপকো মিল জায়েগা!"

আর যায় কোথায়! "কৌন হ্যায়! ইস্‌কো আভি নিকাল দো! হামারা শাগির্দ হো কর হামারে হি মৌত মাংতা হ্যায়...।" এর পরে উত্তেজনার বশে খাঁ সাহেবের মুখ থেকে আধা-বাংলা আধা-হিন্দিতে নতশির রথীনবাবুর উদ্দেশে বেরিয়ে এল : "পইসা ভি লিবে, জান ভি লিবে?"

বিমা সম্বন্ধে এই অপরূপ নিষ্কর্ষের পরে, বলা বাহুল্য, রথীনবাবু আর ওস্তাদকে ইনসিওরেন্স করাতে পারেননি।

এরপর হারমোনিয়াম-বাদক মন্টুবাবুর পালা। মন্টুবাবুর মতো লয়ে সিদ্ধহস্ত বাদক বাঙালির মধ্যে খুব কমই জন্মেছেন। তাঁর সংগীতজীবনের নানা রোমহর্ষক ঘটনার মধ্যে একটি শোনা গেল।

ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনীর এক আসরে একজন ডাকসাইটে তবলিয়া-ওস্তাদকে আনা হয়েছিল। উনি এসে চ্যালেঞ্জ করলেন, "আমাকে যাঁর সঙ্গেই সংগত করতে বসানো হবে, আমি তাঁর সঙ্গে শুধুমাত্র ঝাঁপতালে ঠেকা দেব। অর্থাৎ তিনি যদি তিনতালে (১৬ মাত্রায়) গান করেন, আমি সেই ১৬ মাত্রাকে সমান দশভাগে ভাগ করে ঝাঁপতালে ঠেকা দেব। সমে সমে মিলবে কিন্তু মাঝখানে ত্রিতালের ভাগ হবে না। কেউ যদি ধামার ধরেন, তবে ধামারের ১৪ মাত্রার সময়ের মধ্যে সেই ঝাঁপতালের ঠেকাই বাজবে। কে বসতে চান আসুন!"

মহা বিপদ! কেউ এগোতে সাহস করছে না। শেষকালে মন্টুবাবুকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করানো হল। উনি এসেই ওস্তাদকে এক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত! "ওস্তাদ, হিন্দুস্তানের কোনো গাইয়ে-বাজিয়ের হিম্মত নেই যে আপনার ওই ঠেকার সঙ্গে গানবাজনা করে। আমাকে এরা জোর করে বাঘের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমি আপনার ছেলের মতন। ধামার বাজাবার ইচ্ছে ছিল, এখন আপনার কথা শুনে প্রাণ উড়ে গেছে। অন্তত দয়া করে কয়েকটা মিনিট ধামারের ঠেকা দিন, আমার হাত-পা একটু শক্ত হোক, তারপরে আস্তে আস্তে ঠেকাটাকে ঝাঁপতাল করে ফেলবেন।

ওস্তাদ কী ভেবে রাজি হয়ে গেলেন। মন্টুবাবু ধামারের গৎ ধরামাত্র ওস্তাদজি পাহাড়-পর্বত ভেঙে পড়ার মতন একটা 'উঠান' বাজিয়ে সমের মুখে বিশাল একটা 'ধা' মারলেন। মন্টুবাবু বিদ্যুতের মতো ওস্তাদের হাতটা উঁচু করে তুলে ধরলেন।

"শুনুন আপনারা, শুনলেন? ধামারের সম আজকাল 'কৎ' নয়, 'ধা'। সাধে কি আপনারা একে তিন হাজার টাকা দিয়ে নিয়ে এসেছেন? আর আমরা কুচো চিংড়ি আর পুঁইশাক খেয়ে জীবনধারণ করছি?"

এরপরের ঘটনাবলি কেউ আর খোলসা করে বলেননি। আমারও অজানা রয়ে গেছে।

মন্টুবাবু বাঙালিদের সম্মান সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। পশ্চিমদেশীয় কোনো

ওস্তাদ বা পণ্ডিত বেশি ডাঁট বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখালে তৎক্ষণাৎ তাকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিতেন।

পরম শ্রদ্ধেয় তবলীয়া হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (হিরুবাবু) একটি সংগীতসভায় এসেছেন। একজন হিন্দিভাষী বিখ্যাত তবলীয়া তাঁর কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্যায়সা হ্যায় আপ?" পাশেই ছিলেন মন্টুবাবু। এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, "লজ্জা করে না তোর? সাহস তো কম নয়, এত বড়ো একটা লোকের কাঁধে হাত দিচ্ছিস? পায়ে হাত দে!" ভদ্রলোক ঘাবড়ে দিয়ে হিরুবাবুর পাদস্পর্শ করলেন।

মন্টুকাকাবাবুর মুখ দিয়ে মধ্যে মধ্যে অচিন্ত্যনীয় কিছু মন্তব্য বেরোত। একবার বিশালবপু একজন ছাপরা-নিবাসী পাখোয়াজি পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন। বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় হাতির চলন কীরকম হয় পাখোয়াজের বোল দিয়ে তার 'চিত্রায়ণ' হচ্ছে। হাতি শান্তভাবে চলছে; হাতি চঞ্চল হয়েছে (হস্তিনীকে দেখে); হাতি প্রেমে পড়েছে; হাতি দুষ্টুমি করছে; হাতি উন্মাদ হয়ে গেছে (অবশ্যই ব্যর্থ প্রেমে), ক্ষেপে গিয়ে তুলকালাম করছে—এ-সবই পাখোয়াজের বোলের দ্বারা প্রকাশ করা গেল। শেষে পাখোয়াজবাদক বললেন, এবার দেখুন এই পাগলা হাতিকে কী ধরনের বোল শুনিয়ে ঠান্ডা করা হত—ইত্যাদি ইত্যাদি। সামনে বসেছিলেন কলকাতার দুই উদীয়মান তবলিয়া শ্যামল বোস ও শঙ্কর ঘোষ। মন্টুকাকা অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে তাঁদের বললেন, "শুনছো শ্যামল? শুনছো শঙ্কর? রোজ ঘণ্টা দু-তিন চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াবে, নইলে এ সমস্ত মাল কোথায় পাবে?"

ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনীর একটি সভায় একদিন আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেছি। মন্টুকাকা দেখামাত্র বললেন, 'এসো, এসো, বউমা এসো। একদম সামনে গিয়ে বসো।'

আমার স্ত্রী বললেন, 'না কাকাবাবু, এত লোকের ভিড়, গায়ে পা লেগে যাবে।'

মন্টুকাকার চটজলদি উত্তর, 'কোনো চিন্তা নেই বউমা, মন্টু বাঁড়ুজ্যে তোমাকে লয়কারী করে নিয়ে যাবে আর বার করে আনবে। চলো চলো!'

মন্টুবাবু হারমোনিয়ামে ঝালা বাজাচ্ছেন, সে এক মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া জেট স্পিডের ঝালা। তবলিয়া ঠেকা রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন। অকস্মাৎ মন্টুবাবু তবলিয়ার হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে আরে, আপনি করছেন কী?"

বাজনা থেমে গেল। শ্রোতারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মন্টুবাবু বললেন, "দেখুন, সবাই দেখুন।

আসরে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব

ইনি বাজাতে বাজাতে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে তবলার গুলি ঠেলে ঠেলে ঢিলে করে দিচ্ছেন। তবলার সুর নেমে গেলে তখন আবার হাতুড়ি মেরে সুর ঠিক করছেন। তাতে হাতেব একটু বিশ্রাম হচ্ছে!"

কথাগুলি আমি সাদা বাংলায় লিখলাম বটে, কিন্তু মন্টুকাকা মোটেই সাদা বাংলায় বলেননি। তবলিয়া ছিলেন পশ্চিমদেশীয়। সুতবাং মন্টুকাকা কথাগুলি বললেন এক বিচিত্র অনবদ্য ভাষায়, যেটা ছিল হিন্দি ভাষার মধ্যে কালীঘাটের টুকরো টুকরো বাংলার মণিমানিক্যের সমাহার। শোনামাত্র সবাই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

এই বর্ণময় মানুষটির অনুপস্থিতি আজকেব সংগীতের দুনিয়ায়, শুধু আমি কেন, অনেকেই বোধ করেন।

গুরুদেবের বিবাহ উপলক্ষে আরেক পশলা গানবাজনা হয়ে গেল। সেবারে অধিকাংশই ওঁর বন্ধুবান্ধব। বাইরের থেকে কেবল বিসমিল্লা খাঁ ও তাঁর ভাই সানাইয়ে। গুরুদেবের জমিদারি ছিল রাজশাহি জেলার তালন্দ অঞ্চলে। তখনকার দিনে বছরে তিন লাখ টাকা আয়। কাজেই ধুমধাম সেইরকমই হল। শ্বশুরবাড়ি হল ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে 'সুষঙ্গ'-এ। সেই 'জারিয়া জঞ্জাইল'-এর কাছে। বরযাত্রী যেতে পারিনি, এ-দুঃখ আমার চিরদিন থাকবে। শেষ কিছুটা রাস্তা বর গেলেন হাতিতে চড়ে। পরে গুরুদেব তাঁর একটি উপলব্ধির কথা আমাকে বলেছিলেন—হাতির চলন থেকে যে 'ধামার' তালটি সৃষ্টি হয়েছে সেটা হাতির পিঠে চড়লে বোঝা যায়। আমার সে সুযোগ অবশ্য হয়নি।

একদিন শুনলাম, শহরের উপকণ্ঠে কোথায় যেন বাঘ ধরা পড়েছে। সোজা ক্লাস পালিয়ে বন্ধু মকবুল হোসেনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কতদূর গেলাম খেয়াল নেই।
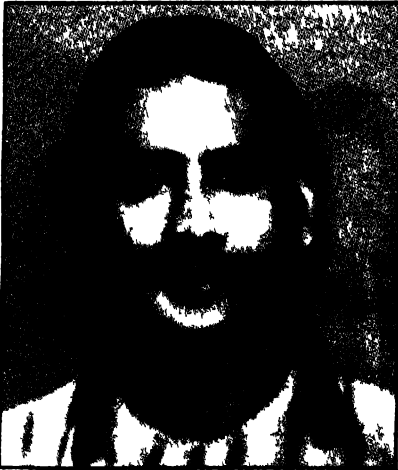
এনায়েত খাঁ সাহেব

মন্টু ব্যানার্জি

ঠিকানা : "বাঘ কোথায় ধরা পড়েছে?" শেষ অবধি যখন পৌঁছলাম তখন সূর্য ডোবার উপক্রম। বাঘ সত্যিই ধরা পড়েছিল—ধরা পড়েছিল নয়, মারা পড়েছিল। ততক্ষণে তার চামড়াটা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, একটা মেটে-বাড়ির দাওয়ার উপরে তার ছাড়ানো মাথাটা রাখা হয়েছে। সেটার দিকে তাকিয়ে, বিশেষ করে তার পাতাবিহীন চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। পরে বহুদিন অন্ধকারের মধ্যে ঘরে, গলিতে, বারান্দার কোণায়, এমনকী গাছের ডালপালার মধ্যেও বাঘের সেই ছাল-ছাড়ানো দাঁত-খিঁচোনো মাথা এবং হাড়-হিম-করা চোখ আমাকে তাড়া করে ফিরেছিল।

বাড়িতে ততক্ষণে হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছে। স্কুলে, বন্ধুদের বাড়িতে, গুরুদেবের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে কোথাও হদিশ পাওয়া যায়নি। গুরুদেব গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কাকে যেন আরো কোথাও-কোথাও খুঁজে দেখার নির্দেশ দিচ্ছেন, এমন সময় আমি হাজির হলাম।

"এই যে ধুরন্ধর ছেলে, কোথায় গেছিলে?"

"আজ্ঞে, বাঘ দেখতে।"

"বাঘ দেখতে গেছিলে? আসল বাঘ এখনো দেখনি, বাড়ির ভেতরে আছে, যাও।"

বাবার কাছে প্রহার জীবনে খুব কমই খেয়েছি (মায়ের কাছে ছিল জলভাত), সেই একবারই খেলাম, যদিও অল্পমাত্রায়। ইস্কুলের ক্লাস শেষ হবার দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ি না-ঢুকলে ভবিষ্যতে আরো বেশিমাত্রায় পাওনার প্রতিশ্রুতি রইল। যাই হোক, শাসনটা গানবাজনা করার জন্য নয়, এই ভেবে মারটা সানন্দে হজম করলাম।

বস্তুত গানবাজনার জন্য আমার বাবাকে যে-কষ্ট ও লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে, আমাকে তা আদৌ পেতে হয়নি। এনায়েত খাঁ সাহেবের বাড়িতে বাবা প্রায়ই যেতেন (তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে এম.এ. পড়ছেন এবং ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকেন)। একদিন এনায়েত খাঁ সাহেব বাবাকে কোনো একটি জলসাতে নিয়ে গেলেন। বাজনা শেষ করে খাইয়ে-দাইয়ে ঘোড়ার গাড়ি ব্যবস্থা করে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তখন রাত একটা, হোস্টেলের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, রাত্তিরের রোল কলের খাতায় ট্যাঁড়া। পরদিন প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে রিপোর্ট। সাহেব প্রিন্সিপাল, ইংরেজির অধ্যাপক, বাবা তাঁর খুবই প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেব শুধু বকাঝকা করেই ক্ষান্ত হলেন না। কলেজের নিয়ম অনুসারে বাবার বাবাকে অর্থাৎ ঠাকুরদাকে জানিয়ে চিঠি দিলেন। অনতিকাল পরে বাবার নামে একটি পোস্টকার্ড এসে হাজির। তাতে বক্তব্য খুবই সরল এবং সংক্ষিপ্ত—

"তোমার যে লেখাপড়া কোনকালেই হইবার নহে, এ বিষয়ে আমি বরাবরই স্থির নিশ্চয় ছিলাম। নেহাৎ তোমার গর্ভধারিণীর কাকুতি-মিনতি ও নির্বন্ধাতিশয্য উপেক্ষায় অপারগ বিধায়, দরিদ্র উকিল হইয়াও মাসিক ৭৫ টাকা খরচে এই দুঃসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এই পত্র পাইবামাত্র কলেজের খাতা হইতে নিজনাম খারিজ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিবে এবং সেরেস্তায় খাতা লিখিবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিবে।

ইতি আঃ

শ্রীমনোমোহন দাশগুপ্ত।"

বাবা সেই চিঠি হাতে করে গেলেন প্রিন্সিপাল সাহেবের ঘরে। গিয়ে বললেন, "স্যার, আমাকে বিদায় দিন। আপনার মতো অধ্যাপকের কাছে যে পড়তে পেয়েছিলাম, এ-সৌভাগ্য চিরকাল মনে থাকবে।"

প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন (অবশ্যই ইংরেজিতে), "কী আবোল তাবোল বকছো?"

বাবা বললেন, "আপনি বলেছিলেন আপনাকে আপনার কর্তব্য করতেই হবে, এখন আমার বাবা তাঁর কর্তব্য করেছেন, এই চিঠি দিয়েছেন।" তারপর যথাসাধ্য চোখা ইংরেজিতে চিঠিটার তর্জমা করে শোনালেন। সাহেব রেগে উঠলেন। তিনি তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হোয়াট নন্‌সেন্স! তিনি তোমার পড়া বন্ধ করে দিলেন তাই বলে?"

"আমি কী করতে পারি, বলুন স্যার।"

"তোমাকে কিছু করতে হবে না। ক্লাসে যাও। যা করবার আমি করছি।"

এইভাবে বাবার পড়াশুনো অতিকষ্টে রক্ষা পেল। ঠাকুরদার আশঙ্কার নিরসন করে বাবা ইংরেজি এম.এ-তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন।

বেশ কাটছিল রাজশাহির দিনগুলি। এই সময়ে হঠাৎ সরোদশিক্ষার মাথায় বজ্রপাত। বাবা খুলনায় বদলি। আমার কান্নাকাটি। গুরুদেব মুচকি হেসে বললেন, "তাহলে আর কী হবে, সরোদটা ফেরত দিয়ে যা" (এটা তাঁর ইচ্ছে ছিল না, মতলবটা অন্য)।

আবার কান্নাকাটি, পায়ে মাথা ঠোকা। শেষে গুরুজি বললেন, "দিতে পারি এক শর্তে। স্কুল থেকে ফেরত এসে, বউদি যতটুকু সময় বরাদ্দ করবেন, সেইটুকু সময় বাজাবে। যা-যা দিয়েছি, সেগুলো মন দিয়ে রেওয়াজ করবে। আনতাবড়ি, ওই যে কী সব সিনেমার গান, 'আমি বন বুলবুল', এসব বাজিয়েছ জানতে পারলে সরোদ ফেরত চলে আসবে পত্রপাঠ।"

নাকে-খত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম।

বরিশালের মতো খুলনাও নদীমাতৃক দেশ, কেবল কলকাতা অবধি একটাই রেললাইন ছিল, ব্রডগেজ। বরিশালের মতোই স্টিমারে, লঞ্চে, নৌকোয় ভর্তি নদী এবং খানিকদূর দক্ষিণে গেলে সুন্দরবন। খুলনায় গিয়ে আমি ক্লাস নাইনে ভর্তি হলাম। স্কুলের নাম 'বি. কে. ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন', চলতি কথায় 'বি. কে. ইস্কুল'। গানবাজনার বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু অন্যান্য বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভর্তি।

খুলনা রেলস্টেশনের পাশেই নদীর ধার এবং স্টিমারঘাট। নদীর নাম ভৈরব, একই নদী সমুদ্রের দিকে যেতে যেতে ইছামতী হয়েছে, তারপরে প্রায় দু'মাইল চওড়া, সেখানে নাম 'পশর' নদী। স্টিমারঘাটে যাতায়াত করত বড়ো বড়ো স্টিমার, কোনোটা বরিশাল কোনোটা ঢাকা, কোনোটা অন্যান্য জায়গায় যাবে। খুলনা জেলায় একটিমাত্র রেললাইন ছিল, কলকাতা থেকে। বরিশাল জেলায় কোনো রেলপথ ছিলই না।

বাচ্চা বয়সে এইখান দিয়েই বড়ো বড়ো স্টিমারে চড়ে বরিশাল যাতায়াত করেছি।

এখন আর সেটা করার প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু নদীবক্ষে ভ্রমণের অন্য একটা দারুণ ব্যবস্থা ছিল। তখনকার দিনে বড়ো বড়ো সরকারি আমলাদের জন্য একটি করে লঞ্চ থাকত। লঞ্চ মানে কুলপি, কাকদ্বীপ অঞ্চলের ভুটভুটি নয়, তার থেকে ঢের বড়ো, মোটামুটি একটি স্টিমারের বাচ্চা। আয়তনে দেড়শো থেকে দুশো ফুট লম্বা, চওড়ায় পঁচিশ-তিরিশ ফুট, সামনের দিকে একটুখানি ডেক, দুটো কেবিন, তাতে সাদা সাহেব-মেম হলে চারজন এবং কালো সাহেব-মেম হলে হলে আট-দশজন আরামে ভ্রমণ করতে পারেন। তারপরে আছে ইঞ্জিনঘর, তারপরে ছোটো ঘর দু-একটা এবং রান্নাঘর, তাতে তেমন তেমন বড়ো সাহেবদের ক্ষেত্রে রেফ্রিজারেটও থাকত। উপরে ছিল সারেং-এব ব্রিজ। এই বাষ্পীয় পোত চড়ে সাহেবরা জেলার নানা জায়গায় অফিসিয়্যাল ট্যুরে যেতেন। যাতায়াতের একমাত্র পথ জলপথ। সাদা রং করা এবং হলদে চোঙাওয়ালা লঞ্চগুলি খুবই দৃষ্টিনন্দন ছিল। মেমসাহেবদের নাম, যথা মার্গারেট, উইনিফ্রেড, সিলভিয়া, পোর্শিয়া, এসথার, অক্টোভিয়া ইত্যাদি। দেশভাগ হবার পরে জেলাগুলির সঙ্গে এইগুলিও পাকিস্তানের কবলিত হয়। আমাদের ভাগে একটাও পড়েনি।

একবার এই লঞ্চে কয়লা খাবার-দাবার রসদ এবং পানীয় (সমুদ্রের কাছাকাছি নদীর জলে লবণ থাকে, খাওয়া যায় না) ভর্তি করে নিলে দশ-বারো দিন নৌবিহার অনায়াসে করা যেত। ব্রিটিশ সাহেবরা কাজকর্মের সঙ্গে প্রমোদ সুন্দরভাবে জুড়ে নিতে পারতেন।

১৯৪১-এর মন্বন্তরের পরে গভর্নমেন্ট সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনতে আরম্ভ করে রেশনিং করে চাল বেচবার জন্য এবং অসাধু মিডলম্যানরা যাতে ধান কিনে বিশাল বিশাল নৌকা করে জেলার বাইরে নিয়ে চোরা-রফতানি করতে না- পারে তার ব্যবস্থা করে। এই কাজটার দায়িত্ব সারা খুলনা জেলাতেই আমার বাবার ছিল এবং পদটি

আমার কল্পনায় সেই লঞ্চযাত্রা
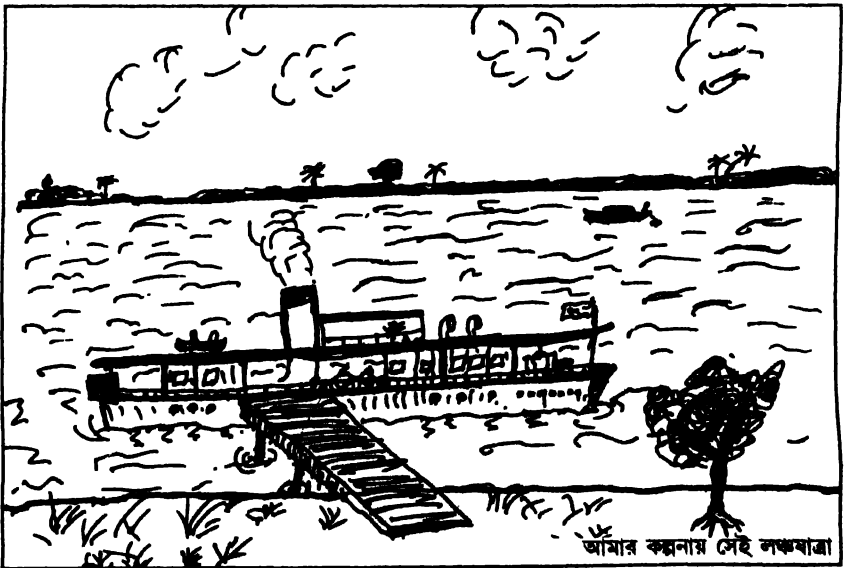
জেলাভিত্তিক বলে কালেক্টর ও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস.পি. সাহেবদের মতো বাবারও একটা লঞ্চ জুটেছিল, তাঁকে প্রায়ই সারা জেলায় ঘুরে বেড়াতে হত। সুবিধা পেলেই আমরাও সেই লঞ্চে ভেসে পড়তাম। একেবারে 'চেঞ্জে' যাবার মতো ছিল সেই আনন্দ। খুলনা জেলার দক্ষিণে সমুদ্রসংলগ্ন প্রায় শতকরা ষাটভাগই ছিল ঘন সুন্দরবন। খুলনা থেকে মাইল পনেরো দক্ষিণে যেতে যেতেই লোকালয় ফিকে হয়ে আসত। সেখান থেকে আরও মাইল কুড়ি দক্ষিণে গেলে জলকে আর নদীর জল মনে হত না। বড়ো বড়ো ঢেউ, ছোটোখাটো নৌকাগুলি একটু বাতাস উঠলেই খাবি খেতে আরম্ভ করত এবং মাঝিমাল্লারা উচ্চৈঃস্বরে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় আপন আপন 'দ্যাবতা'র নাম নিতে শুরু করত। পাড়ে ঘরবাড়ির দেখা প্রায় নেই এবং এরপরে খানিকটা ঘরবাড়ি গাছপালাহীন প্রান্তরের পরে দৃষ্টিপথ আগলে দাঁড়ায় ঘন জঙ্গল, সুন্দরবন। জায়গাটার এমনই স্থানমাহাত্ম্য যে, ওখানে পৌঁছোনোমাত্র পরিবেশটা আর মনোরম থাকত না, হয়ে যেত ছমছমে, প্রায় ভীতিজনক। এ এমন একটা জায়গা যেখানে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ-বুনো শুয়োর, মাথার ওপর গাছের ডালে সাপ। মনে করলেই লঞ্চের মধ্যে বসেই হাড় হিম হয়ে যেত। লঞ্চ একটু নদীর ধার ঘেঁষে গেলেই মনে হত গাছের ফাঁকে বাঘ দাঁত খিঁচিয়ে তাকিয়ে আছে!

নদীর ধার ঘেঁষে মধ্যে মধ্যে বাঁশ বা খুঁটি পুঁতে তার ওপর একটা গামছা বা জামা টাঙিয়ে তার ওপর একটা হাঁড়ি উপুড় করে রাখা আছে। এইসব জায়গাগুলিতে কাউকে-না-কাউকে বনসম্রাট ধরে নিয়ে গেছিলেন, সেইসব হতভাগ্যদের স্মৃতিচিহ্ন এইভাবে রেখে গেছে তাদের সঙ্গীসাথীরা। পরিবারের লোকজন মধ্যে মধ্যে এসে চোখের জল ফেলে পুজো দিয়ে যায়।

এইসব সফরে মধ্যে মধ্যেই জেলেনৌকাকে পাকড়াও করে মাছ নেওয়া হত। শহর থেকে দূরে বলে জেলেরা অত্যন্ত অল্প দামে মাছ দিত। পিপের মতন বেড়, হাত দশেক লম্বা, লাটাইয়ের মতো আকৃতি বাঁখারির খাঁচা জলে ভাসিয়ে তাতে মাছ রাখা থাকত। চেনা মাছ ভেটকি, গুড়জালি, পার্শে, পম্‌ফ্রেট ছাড়া নানাবিধ অচেনা মাছ, কোনো-কোনোটার রংয়ের বাহার দেখবার মতো। মরশুমের সময় ইলিশ মাছ দু-আড়াই কেজি সাইজের। রাক্ষুসে সাইজের চিংড়ি, খুব বড়োগুলি খাওয়া যেত না, রবারের মতন বলে। হাঙরের বাচ্চাও কালেভদ্রে এক-আধটার দেখা মিলত। পূর্ববঙ্গে যারা জন্মায়নি বা কিছু সময় কাটায়নি তাদের কাছে এই জলের এবং মাছের মজা অচিন্ত্যনীয়।

বাবার সঙ্গে প্রায়ই যেতেন বাবার কলেজের এক বন্ধু ধীরেন ঘোষ, যাঁর খুলনার ন'পাড়া অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জমিদারি ছিল। সেখানে আর এক রকমের জল দেখেছি, যাকে বিল বলা হত। বিল হয়তো পশ্চিমবঙ্গেও আছে কিন্তু তা অধিকাংশই ক্ষেতে বর্ষার জল-জমা বিল, অথবা ভেড়ি। খুলনার সে বিলের সঙ্গে তার তুলনা অসম্ভব। এ বিল কখনোই শুকোত না। মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তৃত কাচের মতো স্বচ্ছ জলরাশি, দু-আড়াই হাতের বেশি গভীর নয় কোথাও। সারাদিন নৌকোয় করে ঘোরা হচ্ছে, নৌকো উলটোলেও ডুবে মরার ভয় নেই। তলার মেঝে বা মাটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে জলজ গাছগাছড়া, আর দেখা যাচ্ছে ঝাঁকেঝাঁকে নানারকম ছোটো সাইজের

মাছ—খলসে, পুঁটি, চাঁদা, বেলে ইত্যাদি। বাচ্চা খলসেগুলির পেট রামধনু রঙের, আমরা ধরে কাচের জারে বাড়িতে রাখতাম, কিন্তু বড়ো হলে কালচে হয়ে যেত। হঠাৎ তীরের মতো এসে পড়ত জলঢোঁড়া, তার ছোটো মাছ বা ব্যাঙের বাচ্চা খপ করে ধরা এবং খাওয়া দুটোই জলের মধ্যে নিষ্পন্ন হত। পরিষ্কার দেখা যেত সবকিছুই। কই, মাগুর এবং শিঙ্গি—এই তিনরকমের মাছ মাঝবিলে দেখাই যেত না, তাদের বাস নিতান্তই অগভীর জলে, পুকুরের বা বিলের ধার ঘেঁষে, কচুরিপানা বা অন্যান্য জলজ গাছেব তলায়, কাদার মধ্যে। বিলের মাঝখানে ঘুরতে ঘুরতে দেখতাম, হঠাৎ-হঠাৎ নৌকো থেকে কিছু দূরে জলের ওপর কালো রংয়ের গোলার মতো কী একটা বস্তু আকাশ থেকে ঝপ্ করে পড়ে জলে ডুবে গেল। একটু বাদে কিছু দূরে জল থেকে জেগে উঠল কালো রংয়ের সাপের ফণার মতো একটা লম্বা গলাওয়ালা মাথা। পানকৌড়ি। বুনো হাঁসের ঝাঁক এসে জলে পড়ত, তাদের মাংসের লোভ সামলানো অসাধ্য। বাবা, ধীরেনকাকা অথবা গ্রামের কোনো শিকারি ছর্‌রা গুলি চালাতেন। ঝুপঝাপ করে ডজনখানেক জলে পড়ত। হাঁস মারবার একটা কৌশল ছিল। তারা জলে বসে গেলে একটা শটে অতগুলিকে ঘায়েল করা যেত না, গুলি ছুঁড়তে হত হাঁসের ঝাঁক ঠিক যখন জল থেকে ফুট কয়েক উঁচুতে তখন। বিলের মাঝে, যেখানে খাদ্য প্রচুর, সেখানে বকেবা খুব জুত করতে পারত না, কারণ দু-আড়াই হাত গভীর জলে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। তারা বিলের ধারেই থাকত, দলছুট অসাবধানী কোনো মাছের আশায়।

বাবার সহপাঠী আর একজন জমিদার-বন্ধু ছিলেন উত্তরবঙ্গে। ছুটিছাটাতে তাঁর জমিদারিতে বেড়াতে গিয়ে বাবার শিকারের শখ হল এবং দেখা গেল বন্দুক চালনায় তাঁর স্বভাবদক্ষতা বেশ ভালোই। সুযোগ পেলেই বন্ধুর সঙ্গে তাঁর জমিদারিতে ডুয়ার্স-এর জঙ্গলে ঘোরাফেরা। পাখি এবং ছোটোখাটো জীবজন্তু মেরে মেরে হাত পাকাতে পাকাতে হঠাৎ কী করে জানি না, একটি চিতাবাঘ মেরে ফেললেন। অবশ্য পায়ে হেঁটে নয়, মাচার ওপর থেকে। ব্যাঘ্র প্রজাতির মধ্যে এটাই তাঁর প্রথম এবং শেষ শিকার। খুলনায় এসে ক্রমাগত সুন্দরবনে ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই শিকারের শখ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ধীরেনকাকার তিন-চারটি বন্দুক ছিল। সেগুলি প্রত্যেকবারই লঞ্চে উঠত। কিন্তু বিশ-বাইশবার সুন্দরবন চষে বেড়িয়ে বাবা একটা বাঘের গায়েও গুলি লাগাতে পারেননি। সেটা একদিক থেকে ভালো, বাঘ অল্পস্বল্প আহত হলে আর-একটা মানুষখেকোর সৃষ্টি হত। হরিণ অনেকগুলিই মেরেছিলেন। হরিণ ঘায়েল হয়েছে বুঝতে পারলেই লঞ্চের খালাসিরা ছুরি নিয়ে জালি বোটে (লঞ্চের মধ্যে রাখা ছোটো নৌকো) তীরে লাফিয়ে পড়ত। জন্তুটা মরবার আগেই তাকে 'হালাল' করতে হবে, নইলে তার মাংস খাওয়া যাবে না।

আর কুমির। তার চামড়া ভেদ করা শক্তিশালী রাইফেল ছাড়া সাধারণ বন্দুকের গুলির ক্ষমতার বাইরে। একমাত্র তার হাঁ-করা মুখের মধ্যে যদি সরাসরি গুলি চালানো যায় তবেই কিছু হবে। সে অবস্থায় কুমিরকে পাওয়া দুঃসাধ্য। সুতরাং যতবার কুমিরকে গুলি করা হয়েছে, তা গালের ওপরে, চোখের তলায়, তাতে কিছুই হয়নি। কুমির ভেংচি কেটে একলাফে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

দিনাজপুরের কুমুদমামা একবার লঞ্চযাত্রায় সঙ্গে গিয়েছিলেন। সর্বক্ষণই বাবার পেছনে লাগছেন। এইরকম একটি কুমির-কাণ্ড হবার পর কুমুদমামা বললেন, দাদা, কুমিরটা কী বলে গেল শুনতে পেলেন?

—কী বলল?

—বলল, "ওঃ সাহেব, আপনি আইছেন বুঝি? তবে যে শুনতিছিলাম মস্ত বড়ো একজন শিকারি সাহেব আইছেন! তোবা-তোবা! সেলাম সাহেব, আপনারে সেলাম। আপনার বন্দুকের টিপ্‌রেও সেলাম!!"

—কুমুদ, তোর সবতাতেই ফাজলামি।

বাবার এই লঞ্চে ভ্রমণ অবিচ্ছিন্ন আনন্দে কাটেনি। একবার উনি একাই গেছিলেন, মোল্লারহাট নামে একটি অশান্ত দাঙ্গাপ্রবণ অঞ্চলে। যেখানে গুন্ডামি-মারামারির একেবারেই অভাব নেই। বাবার সঙ্গে লোকজন, পুলিশ ইত্যাদি ছিল অবশ্য। কিন্তু ওখানে যে-ব্যাপারটা বাবার জন্য অপেক্ষা করে আছে, সেটা উনি নিজেও আঁচ করতে পারেননি।

আমরা রাত্রে বাড়িতে ঘুমিয়ে আছি। বাবা দিন-দুয়েক আগে বেরিয়েছেন, ফিরবেন দিন-তিনেক পর। হঠাৎ রাত্তির দেড়টায় সদর দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা, হাঁউমাঁউ চিৎকার। খুলে দেখি, বাবার চাপরাশি কালীপদ মাটিতে একগাদা রক্তমাখা বাবার জামাকাপড় ফেলে মাথা ঠুকছে আর কাঁদছে—সর্বনাশ হয়ে গেছে মা, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

এই দৃশ্যে বাড়ির লোকেদের যা মানসিক অবস্থা হয়, আমারও তার ব্যতিক্রম হল না। আমার বয়স তখন চোদ্দ-পনেরো, আমিও প্রায় কালীপদর মতোই আর্তনাদরত। কিন্তু সেই প্রথম দেখলাম আমার মায়ের কী অসাধারণ মানসিক শক্তি!

জামার কলার ধরে কালিপদকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে মা ধমক লাগালেন, "মড়াকান্না থামা, একদম চুপ, নইলে লাগাব এক চড়! বল, কী হয়েছে। বেঁচে আছেন না শেষ হয়ে গেছেন।"

মোল্লারহাট পৌঁছাবার মাইল পাঁচেক আগেই দেখা গেছিল খান-তিনেক বিরাট বিরাট হাজারমনি নৌকো নদীর ধারে নোঙর করা আছে। নিঃসন্দেহে চোরাচালানের নৌকো। জনা দশ-বারো লোক পাড়ে বসে জটলা করছে। হুঁকো তো খাচ্ছেই, আর কিছু টেনেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

লঞ্চ পাড়ের থেকে হাত-পঞ্চাশেক দূরে থামানো, চড়ায় ঠেকার ভয়ে একেবারে পাড়ে নেওয়া হত না। ছোটো ছোটো বোট (জালি-বোট) লঞ্চেই থাকত, সেই বোটই দুটো নামিয়ে জনা-তিনেক খালাসি আর পুলিস নিয়ে বাবা তীরে গিয়ে নামলেন। নামামাত্র বুঝতে পারলেন অত্যন্ত বদ ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছেন। লোকগুলির চোখের দৃষ্টি মোটেই নিরীহ নয়। কয়েক জনের হাতে দা।

যাই হোক, নেমে যখন পড়েছেন তখন পিছু হটলেও হয়তো নিস্তার নেই। কোনোরকম ঝগড়া বা ধমকধমকি না-করে জিজ্ঞেস করেছেন, "বাবারা, এ নৌকোগুলি কোথায় যাবে? তোমাদের নৌকো কি?"

ব্যাস, এইটুকুই যথেষ্ট। "ধান ধরতি আইছে, ধান ধরতি আইছে। মার শালারে, মার মার" শব্দে লোকগুলি বাবাকে ঘিরে ফেলল। বীরপুঙ্গব পুলিশরা খালাসিদের নিয়ে

জালি-বোটে চড়ে এক ঠ্যালায় নদীর ভেতরে। বাবা পাড়েতে একা।

মাথায় ছিল শোলার টুপি, তার ফিতেটা থুতনির তলায় গলানো। তাই ঝটাঝট বেশ কয়েকটা দায়ের কোপ পড়েও টুপিটাকে মাথা থেকে সরাতে পারেনি, সরলে বাবা সেইখানেই পড়ে থাকতেন। দুটি কোপ টুপি ভেদ করে মাথায় আড়াআড়ি গেঁথে ছিল, ভগবানের দয়ায় করোটি ভেদ করে মস্তিষ্কে পৌঁছোয়নি।

বিপদে পড়লে কারো সাহস এবং বুদ্ধি কমে, কারো বেড়ে যায়। মাথার রক্তে চোখ ঢেকে যাচ্ছে, বাবা সোজা একলাফে নদীর জলে পড়লেন। দা দিয়ে কোপানো সাময়িকভাবে প্রশমিত ছিল। লোকগুলি ভেবেছিল আর নড়তে পারবেন না, মাটিতে পড়ে যাবেন। সেই সুযোগে...।

বাবা গ্রামের ছেলে, অতিশয় দক্ষ সাঁতারু, বাল্যকালে দেশের বাড়ি কালিয়া গ্রামে এই ভৈরব নদীতেই তোলপাড় করে সাঁতার কেটেছেন। সেই বিদ্যেই তাঁকে বিপন্মুক্ত করল।

লোকগুলি তখন পাড়ে চ্যাচাচ্ছে—ওরে বল্লম আন্, বল্লম আন্। বল্লম দু-একটা ছোঁড়াও হয়েছিল, কিন্তু শিকার ততক্ষণে নাগালের বাইরে। মাথার রক্ত নদীর জলে ধুয়ে যাচ্ছে বলে চোখে দেখতে পাচ্ছেন।

সাঁতরে লঞ্চের কাছে যেতে লোকজন তাঁকে টেনে তুলল। তারপরে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সারেং ফার্স্ট এইড বাক্স থেকে তুলো নিয়ে মাথার ক্ষতস্থান চাপা দিয়ে কাপড় ছেঁড়া লম্বা-লম্বা ব্যান্ডেজ তৈরি করে তা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়ায় রক্তক্ষরণ অনেকটাই বাগে আনা গেল, তারপরে লঞ্চ প্রাণপণে দৌড়ে খুলনার লঞ্চঘাটে, এবং সেখান থেকে বাবাকে নেওয়া হল জেলা হাসপাতালে।

খবর পেয়ে সিভিল সার্জন হাসপাতালে ছুটে এলেন। দু-খানা লঞ্চ নিয়ে এস.পি. এবং ডেপুটি এস.পি. ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে মোল্লারহাট অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। তখন ব্রিটিশ আমল, গভর্নমেন্টের সব বিভাগে, বিশেষত পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কাজকর্মের তৎপরতা এবং ক্ষিপ্রতা ছিল এখনকার হিসেবে অকল্পনীয়। নদীগুলি যত সমুদ্রের কাছাকাছি যায়, ততই নানা শাখা-প্রশাখায় ভাগ হয়ে যায়, চোরাচালানিদের নৌকো যে কোন রাস্তা দিয়ে ঘুরপথে এঁকেবেঁকে জেলার বার হয়ে যাবে তা বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু এই নৌকোগুলি খুলনা জেলা ছাড়িয়ে বেরোবার আগেই তাদের ধরে ফেলা গেল। সবকটাকে কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে এসে হাজতে পোরা হল। পরে বিচারে তাদের দশ-বারো বছরের জেল হয়ে গেল।

খুলনার স্বাধীনতা দিবসের কাহিনি বড়োই করুণ। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর ভিত্তিতে দেশভাগ হবে এই কথাই জানা ছিল। সেই অনুসারে খুলনা জেলার একান্ন শতাংশ হিন্দু এবং উনপঞ্চাশ শতাংশ মুসলমান বলে আমরা মহানন্দে ১৯৪৭ সালের পনেরো আগস্ট সকালবেলা ভারতের পতাকা উত্তোলন করলাম। যে-পুলিশ এতদিন ব্রিটিশের হয়ে কংগ্রেসকর্মীদের ঠেঙিয়েছে, সেই পুলিশ 'বন্দেমাতরম্' বলে লাফাতে থাকল। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা!

কিন্তু ব্রিটিশ শেষ মুহূর্তে প্যাঁচ কষতে ওস্তাদ। সন্ধেবেলা রেডিওতে ঘোষণা হল, সংখ্যার ভিত্তিতেই দেশভাগ করা হল বটে, কিন্তু এর ব্যতিক্রম খুলনা এবং মুর্শিদাবাদ

অনিল রায়চৌধুরী, বাইচাঁদ বড়াল, প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (আমার বাবা), রাধুবাবু, তিমিরবরণ এবং আমি

জেলা। খুলনা হিন্দুপ্রধান হয়েও পাকিস্তানে, মুর্শিদাবাদ মুসলিমপ্রধান হয়েও হিন্দুস্তানে!

আর যায় কোথায়। রাত্তিরে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'আল্লাহ্ হো আকবর' আওয়াজ তুলে ভারতের ফ্ল্যাগ নামিয়ে সব পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ উঠল। এক মর্মঘাতী বিষণ্ণতার মধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে আমরা খুলনা ছেড়ে চললাম। পড়ে রইল আমার প্রিয় লঞ্চঘাট, আমার বি.কে. ইস্কুল, আমার বন্ধুরা যাদের অনেকের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। দুজন বন্ধুর কিন্তু কলকাতায় দেখা পেয়েছিলাম, একজন মস্ত বড়ো ডাক্তার স্বনামধন্য সুব্রত সেন এফ.আর.সি.পি. আর অন্যজন কান-নাক-গলার জাঁদরেল স্পেশালিস্ট রাজেন রায়চৌধুরী। রাজেন বড়ো তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

আমরা কলকাতায় পৌঁছোবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই গুরুজিও রাজশাহি ছেড়ে চলে এলেন মাতামহের বাড়ি চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ-এ।

আমরা খুলনা ছেড়ে কলকাতায় চলে এলাম কিন্তু ঠাকুরদা তখনো পাকিস্তানে, কুষ্ঠিয়ার বাড়িতে। চলে আসবার তোড়জোড় করছেন। একদিন সকালে বাড়ির বারান্দায় বসে আছেন, পাড়ার এক মৌলবি সটান উঠে এসে তাঁর পাশে খালি চেয়ারটাতে বসে পড়ল। আগে তার বারান্দায় ওঠবারও সাহস ছিল না। বলল, "এই যে কর্তা, এখন তো আমরাই মালিক, আপনারা আমাদের গোলাম হলেন!"

ঠাকুরদার মুখ ছুটল—"শালা—র বাচ্চা, এখনই বাইরোয়ে যা" দিয়ে শুরু করে তার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষকে নরকস্থ করতে লাগলেন। সেও চেঁচিয়ে ভাই বেরাদরদের জড়ো করল, রক্তারক্তি বাধে আর কী! ঠাকুরদার ভ্রূক্ষেপ নেই, সমানে গর্জন করে চলেছেন। মেজকাকা এবং আরও কয়েকজন মিলে অতিকষ্টে ব্যাপারটা সামাল দিলেন।

অবিলম্বে বৃদ্ধকে কলকাতায় রফতানি করা হল। ঠিক হল, মেজকাকা গিয়ে আস্তে-

আস্তে ও-বাড়ির জিনিসপত্রে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন, জরুরি জিনিস কয়েকটা নিয়ে আসবেন। বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা আগেই হয়ে গিয়েছিল, বলা বাহুল্য জলের দরে।

একবার কুষ্ঠিয়া গিয়ে মেজকাকা আর ফিবলেন না। আমরা দুশ্চিন্তায় মরি, খবরাখবর-যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। শেষকালে খবর এল ওঁকে অ্যারেস্ট করে কোনো একটা জেলে চালান করেছে। উনি প্রথম জীবনে টেররিস্ট ছিলেন, পরে হয়ে যান কট্টর কমিউনিস্ট।

বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল, কারণ এটা মোটামুটি জানা ছিল যে পাকিস্তান গভর্নমেন্টের হাত থেকে হিন্দু কমিউনিস্ট কেউ বেঁচে জেল থেকে ফিরবেন না।

এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ বাড়িতে এসে হাজির হলেন বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফজলুর রহমান খন্দকার, তখনকার দিনের আই.পি.এস, ঢাকায় বিশাল পোস্টে অধিষ্ঠিত। ওনার সঙ্গে বরিশাল থেকে আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা।

ঘনিষ্ঠতা যে কী দরের, সেটাও একটা উদাহবণ দিচ্ছি। একদিন সন্ধ্যায় ওঁদের বাড়ি খাবাব নেমন্তন্ন। মিসেস খন্দকাব বাংলোর বাগানে বসে কাবাব ইত্যাদি তৈরি করছেন। বাবা-মা খন্দকার সাহেব চারধারে বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন।

এর মধ্যে হঠাৎ ছয় বছর বয়স্ক আমি মাকে জিজ্ঞাসা কবে বসলাম, "মা তুমি আমাকে কোথায় কী করে পেলে?" প্রশ্নটার উৎপত্তি রবিঠাকুরের 'শিশু ভোলানাথ' বইয়ের "খোকা মাকে শুধায় ডেকে এলেম আমি কোথা থেকে" কবিতাটার থেকে। বলা বাহুল্য, কবিতাটির শেষাংশ এতই উচ্চমার্গের সাহিত্যে ঠাসা, যা আমার বোধগম্য হয়নি, এইটুকু বুঝেছি যে সব বাচ্চাকে মা কোথাও-না-কোথাও পেয়ে থাকেন, সুতরাং আমি কোথা থেকে এলাম সেটা জানতেই হবে।

মায়ের চট্‌পট্‌ উত্তর, "কুড়িয়ে পেয়েছি।"

—কোথায়?

মা প্রাপ্তিস্থানের কথা চিন্তা করছেন, একটা সহজগম্য স্থানের কথা বলতে পারছেন না, কারণ নিশ্চিত জানেন আমি তৎক্ষণাৎ সে জায়গাটা দেখতে চাইব। বিস্তর সাধাসাধির পর বললেন, "চাঁদে।"

—চাঁদে বুঝি যাওয়া যায়? তুমি কবে গেছিলে? আমাকে নিয়ে চলো!

খন্দকার দম্পতি হেসে কুটিপাটি হচ্ছেন, "মিসেস দাসগুপ্ত, আপনার ছেলে খুব চালাক। আপনার কথার পাকে আপনাকেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে, নিস্তার নেই, সত্যি কথাটা বলে ফেলুন কী করে ওকে পেয়েছেন!"

এঁদের মতো এমন অমায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি।

যাইহোক, কাকার অন্তর্ধান এবং সম্ভাব্য অগস্ত্যযাত্রার পরেই খন্দকার সাহেবকে পেয়ে বাবা তো ভগবানকে হাতে পেলেন। বললেন, "ভাই, আমার মেজভাইটা কমিউনিস্ট। ওকে কুষ্ঠিয়ায় ধরে নিয়ে গেছে, কোন জেলে রেখেছে জানি না।"

খন্দকার সাহেবের উত্তর, "বুঝেছি বুঝেছি, ভাইয়ের নামটা বলুন।"

মেজকাকার নাম জেনে নিয়ে আর কোনো কিছুই বললেন না সে বিষয়ে। ঘণ্টা-দুই আড্ডা মেরে চা-জলখাবার খেয়ে চলে গেলেন।

দিন-সাতেক পর মেজকাকা সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়িতে উপস্থিত। উপস্থিতি টের পাওয়া গেল তাঁর চড়া কণ্ঠস্বর গেটের বাইরে শুনে। রিক্সাওয়ালাকে গালাগাল দিচ্ছেন। টাকা মিটিয়ে তাকে বাক্স বিছানা নামিয়ে বাড়ির ভেতরে দিয়ে যেতে বলেছিলেন। সে টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে বলেছে, তার কাজ রিক্সা টানা, মাল বওয়া নয়। বাবু নিজেই নিয়ে যান না! এত বড় আস্পর্ধা!

মা ততক্ষণে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। রিক্সাওয়ালা দাঁড়িয়ে খইনি টিপছে, মালপত্র রিক্সাতেই বিরাজমান, কাকা চেঁচিয়ে যাচ্ছেন। ঝগড়ার বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে মা'র এক মিনিটের বেশি সময় লাগল না। তারপরেই কাকাকে আক্রমণ, "কী রে মণি, তোরা না কমিউনিস্ট? তোদের চোখে না সবাই সমান? বেশ করেছে, ওর মাল বইবার ইচ্ছে নেই, ওর বাকস্বাধীনতা আছে তাই বলে দিয়েছে। এই জমিদারি-মেজাজ নিয়ে তুই কমিউনিস্ট?"

কাকা অগত্যা নিজের সুটকেশ বিছানা বয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। রিক্সাওয়ালা পয়সা পেয়ে গেছিল, সে চম্পট দিল।

তারপরে মেজাজ ঠাণ্ডা হলে কাকা তাঁর কাহিনি বিবৃত করলেন। কাকার সঙ্গে কাকার বেশ কয়েকজন বন্ধুকেও পুলিসে ধরেছিল। ধরেছিল অন্য আরও কয়েকজনকে। সব নিয়ে প্রায় আঠারো-উনিশজন।

প্রায়ই ভোরবেলা এক-একজনকে বার করে নিয়ে যেত। কোথায় নিয়ে যেত কেউ জানে না। যারা যেত তারা আর ফিরে আসত না। সুতরাং সকলেরই মনে মনে একটা হৃৎকম্পের সৃষ্টি হল, বেরিয়ে যাওয়া মানেই মৃত্যু এবং আত্মীয়-স্বজনহীন এক অজানা জায়গায় পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া। যারাই যেত, তারাই আর সকলকে বলে যেত, "চললাম রে ভাই।"

এইভাবেই একদিন কাকার পালা এল। ভোর তিনটের সময় একজন সাব-ইন্সপেক্টর এসে বলল, চলুন আমার সঙ্গে। আপনার বাক্স-বিছানা সঙ্গে নিন।

না, সে কোনো বধ্যভূমিতে নিয়ে গেল না। পেছন থেকে আকস্মিক গুলিও করল না। কুষ্ঠিয়া স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়ে সোজা বনগাঁ বেনাপোল সীমান্ত। সেখানে পৌঁছে সীমানা পার করে দিয়ে হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বলল, একটাও কথা বলবেন না। সোজা শেয়ালদার ট্রেন ধরে কলকাতা চলে যাবেন।

ইস্ট পাকিস্তানে খন্দকার সাহেবের ক্রমশ বদনাম রটে যায় হিন্দু-ঘেঁষা বলে। তিনি কিছুকাল বাদে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যাংককে আরও অনেক ভালো একটা কাজ জুটিয়ে চলে গেলেন। তাঁর মতন লোকের পক্ষে এরকম চাকরি খুব দুষ্প্রাপ্য ছিল না।

চ তু র্থ প রি চ্ছে দ
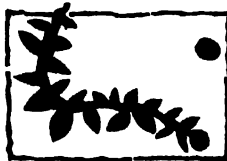
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা

১৯৪৮-এর মার্চ মাসে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। কোন স্কুল আমাকে তখন ভর্তি করে নেবে? দরজায় দরজায় ঘুরতে লাগলাম। শেষে আমার গুরুজি অনেক তদ্বির-তাগাদা করে ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে ঢোকার ব্যবস্থা করলেন। মাস্টারমশায়েরা বললেন যে, রীতিমত লিখিত পরীক্ষা নিয়ে তবে বলবেন ঢুকতে পারব কি না। শেষ অবধি ঢুকে গেলাম।

ইস্কুলজীবনে ইংবেজি বাংলা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদির সঙ্গে বেত্রাঘাত, নিলডাউন, বেঞ্চির ওপর দাঁড়ানো এ-সমস্ত শুদ্ধিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না-গেলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলে আমি মনে করি। এর মধ্যে অনেকগুলির সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছিল। কেমন করে জানি না বেঞ্চির ওপর দাঁড়ানোটা বাকি থেকে গেছিল। সে যোলোকলা পূর্ণ হল এই মিত্র স্কুলে তিন মাস পঠনকালে। তাও আবার এমন একজন মাস্টারমশাইয়ের ক্লাসে যিনি নিপাট ভালোমানুষ ছিলেন—কবিশেখর কালিদাস রায়। পর্বতপ্রমাণ মানুষটির গলার আওয়াজ অত্যন্ত নিচু ছিল, ভাষা অত্যন্ত মার্জিত, জোরে কথাই বলতে পারতেন না।

টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি এবং আরেকটি ছেলে লাস্ট বেঞ্চে বসে আছি, মাস্টারমশাইয়ের চেয়ার-টেবিলের উলটোদিকে মুখ করে জানলার সামনে। গল্পে মশগুল, কখন যে কালিদাসবাবু ঢুকে পড়াতে শুরু করেছেন টের পাইনি। উনি বোধহয় ভেবেছিলেন ওঁর গলার আওয়াজে সাবধান হয়ে আমরা পেছন ফিরে বসব। তার কোনো লক্ষণই নেই। নিজেরা এতই কথায় মগ্ন যে ক্লাসের অন্যান্য ছেলেদের খুকখুক করে চাপা হাসিও কানে আসছে না। হঠাৎ নিজেদের মধ্যে কী একটা রসিকতায় আমরা হো-হো

করে হেসে উঠলাম।

এবার কালিদাসবাবুর ধৈর্যচ্যুতি হল। 'ওরে অর্বাচীনেরা' এইরকম একটা মার্জিত গালাগাল মুখ থেকে বেরিয়ে এল তাঁর। আমরা চটকা-ভেঙে ঘুরে বসে লজ্জায় মরে যেতে লাগলাম। ততক্ষণে আবার কালিদাসবাবু পড়াতে শুরু করেছেন। কিন্তু তিনিও ভাবছেন, আমরাও ভাবছি—এতটা অন্যায়ের হিসেবে শাস্তিটা বড়ো লঘু হয়ে গেল না কি! কয়েক মুহূর্ত বাদে তিনি কী ভেবে যেন বলে উঠলেন, "আচ্ছা, এইবার তোরা বেঞ্চির ওপর দাঁড়া!" গলার সুরে কিন্তু মনে হল যেন বলছেন, "এইবার তোরা পায়েসটুকু খেয়ে ফেল।"

এরকম আনন্দিত চিত্তে শাস্তিগ্রহণ জীবনে কখনো করিনি। মিনিট দুয়েকের মধ্যে শাস্তি মকুব হয়ে গেল অবশ্য।

গুরুজি বাবার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে এই সময়ে একটি অত্যন্ত অসংগত রকমের উৎপীড়ন আমার ওপরে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। ভয় দেখাতে লাগলেন, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতে স্কলারশিপ না-পেলে বাজনা বন্ধ করে দেবেন এবং পরীক্ষার দু-মাস আগে আমার সরোদ তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখা হল। আমার এই কষ্টের কিছুটা লাঘব করলেন আমার এক প্রবীণ বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভাই অনিল রায়চৌধুরী। তিনি এসে মাকে বোঝালেন, "এতটা বাড়াবাড়ি কেন বউদি? পরীক্ষা দেবে বলে কি ছেলেরা স্নান করে না, ঘুমোয় না, না দাঁত মাজে না? ওর রেয়াজ কেন বন্ধ করছেন? আমি রোজ বাড়িতে এসে ওকে আধঘণ্টা রেয়াজ করিয়ে যাব।"

অনিল রায়চৌধুরী? তিনি আবার কে? সংগীতজ্ঞ ছিলেন? গাইতেন না বাজাতেন? কী বাজাতেন? রেডিওতে প্রোগ্রাম করতেন? ক'টি ন্যাশানাল প্রোগ্রাম করেছেন? তাঁর কি কোনো রেকর্ড আছে? কোন কোন মিউজিক কনফারেন্সে বাজিয়ে তিনি শ্রোতাদের মাত করেছেন?

কবিশেখর কালিদাস রায়

অনিল রায়চৌধুরী

অনিলদার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এবং এর অধিকাংশেরই কোনো চমকপ্রদ জবাব আমার কাছে নেই। তবে কেন তাঁর সম্বন্ধে লিখে পাঠকের সময় নষ্ট করছি? তার একটা কারণ, অনিলদার কাছে কতদিক থেকে আমি যে ঋণী তা বলে শেষ করতে পারব না। আর প্রধান কারণ, আমার অনিলদা ছাড়া আরো বহু অনিলদা ছিলেন, যাঁরা সংগীতের ইতিহাসের পাতায় স্থান পাননি অথবা পেলেও আজ মুছে গেছেন; অথচ তাঁরাই লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে ভবিষ্যতের মঞ্চ-উজ্জ্বলকারী সংগীতজ্ঞের বুনিয়াদ তৈরি করেছেন, আঁতুড়ঘর থেকে পরিচর্যা করে তাদের শক্ত পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, তারপর সে-সব শিল্পীরা লং জাম্প, হাই জাম্প, পোলভল্টের এবং ট্রাপিজের খেলা যে-যেমন পারেন দেখিয়েছেন। পড়াশুনোর ব্যাপারেও এই কথা খাটে। যে-সমস্ত বিশাল বিদ্বান মানুষ শিক্ষার শিখরদেশে পৌঁছে জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের সেই কীর্তির পেছনে কি শুধু তাঁদের নিজের প্রতিভা এবং শেষধাপের বড়ো বড়ো শিক্ষকের অবদানটাই সবখানি? ম্যাট্রিক বা মাধ্যমিক স্তরে যে-সমস্ত মাস্টারমশাইরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁদের শিক্ষার ভিত তৈরি করেছেন, যে ভিতের উপর না-দাঁড়াতে পারলে তাঁদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবার ক্ষমতাই জন্মাত না, সেইসব দরিদ্র বিস্মৃত মাস্টারমশাইদের দান কি তুলনায় খুবই নগণ্য?

যাক সে-কথা।

অনিল রায়চৌধুরী ছিলেন আমার বড়ো গুরুভাই, গুরুজির প্রবীণতম্য শিষ্য, বয়সে বোধ হয় গুরুজির থেকে কিছু বড়োই হবেন। গুরুর এবং ঘরানার প্রতি তাঁর ভক্তি ও নিষ্ঠা ছিল কল্পনাতীত। রাধিকামোহন মৈত্রর শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের মধ্যে ত্রিশোর্ধ বয়স্ক একজনও নেই যে অনিলদার কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত নয়। উনি ছিলেন আমাদের সর্বময় গার্জিয়ান। কে 'প্রয়াগ'-এর পরীক্ষা দেবে, কে 'তানসেন কম্পিটিশনে' বসবে, কে 'মুরারি সংগীত সম্মেলনে' বাজাবে—এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁর ছিল সর্বক্ষণ চিন্তা ও দৌড়োদৌড়ি। এ ছাড়া গুরুজির সংসারের নানা ফাইফরমাশ, ইলেকট্রিকের বিল, কর্পোরেশনের বিল, টেস্ট ম্যাচের টিকিট, নতুন চাইনিজ রেস্টুরেন্টের খোঁজ অথবা নতুন ইংরেজি সিনেমা, সস্তায় পোস্তা থেকে মশলা আনা এবং সমস্ত সাংগীতিক ক্রিয়াকাজের তিনি ছিলেন ম্যানেজার। গুরুজি কোথাও বাজাতে গেলে বা কোনো কনফারেন্স করলে তিনি সর্বক্ষণ ছায়ার মতো লেগে থাকতেন তাঁর সঙ্গে। বাচ্চাদের সরোদ-সেতার ধরানো এবং তৈরি করার ব্যাপারে এবং আনুষঙ্গিক কিন্তু অপরিহার্য শিশু-মনস্তত্ত্ববোধের বিষয়ে তিনি ছিলেন তুলনাহীন।

একটি দৃষ্টান্ত: পাঁচ বছর বয়স্ক এক শিশুর বাবা-মা অনিলদাকে ধরে পড়লেন, "দাদা, আমাদের বড়ো ইচ্ছে ছেলেটা সরোদ শেখে। আপনি দয়া করে যদি ব্যবস্থা করেন।" ব্যাস, কয়েকদিনের মধ্যেই একটা বাচ্চা সরোদ এসে গেল। ছেলে কিন্তু বলল, "ধ্যাৎ, আমি ওসব বাজাব না!"

অনিলদা তৎক্ষণাৎ বললেন, "আরে আরে, কে তোকে বাজাতে বলেছে? তোকে মোটেই বাজাতে হবে না। তুই পড়াশুনো শেষ হলে বিকেলে কী করিস?"

"আমি কিরিকেট খেলি।"

অনিলদা তাকে ক্রিকেট খেলা দিয়েই বাগে আনলেন। রোজ বিকেলে কেরোসিন কাঠের ব্যাট এবং ইটের উইকেট নিয়ে লেগব্রেক, অফব্রেক, গুগলি, বাউন্ডারি চলতে লাগল। ওরেল, উইকস্, ওয়ালকটের সাংঘাতিক-সাংঘাতিক সব মারের গল্প হতে থাকল। শেষকালে এমন হয়ে দাঁড়াল যে, একদিন অনিলদা না-এলে বাচ্চাটি কাঁদতে শুরু করত 'কিরিকেট-জেঠু কই' বলে।

তারপরে একদিন অনিলদা বাচ্চাটাকে বললেন, "তোকে রবিবার আমার বাড়ি নিয়ে যাব। পাশে বিরাট মাঠ আছে, বাড়ির ছোটো উঠোনে ভালো খেলা যায় না।"

সবই পূর্বপরিকল্পিত। বাচ্চাকে বাড়িতে এনে বললেন, "তুই বাবা একটু বসে থাক, আমার দু-তিনটে ছাত্র এসেছে, তাদেরকে একটু শিখিয়ে নিই, তারপর সারাদিন খেলা। বাচ্চাটার চোখের সামনেই অনিলদা ছাত্রদের শেখানো শুরু করলেন। তারা সবাই ওই ছেলেটির বয়সি। এক-একটা ছাত্র বাজাচ্ছে, আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছেন অনিলদা : "বহুত আচ্ছা, তুই ব্যাটা এবার নির্ঘাৎ অল বেঙ্গলে ফার্স্ট হবি। ...তোকে তানসেন কম্পিটিশনে বসাব। ...তোকে গল্পদাদুর আসরে বাজাতে নিয়ে যাব।" শেখানো শেষ হয়ে গেলে বাচ্চাটাকে নিয়ে খেলা হতে থাকল। বাজনা সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য নেই।

এই পুরিয়া দু-তিনটে রবিবার প্রয়োগের পরেই অব্যর্থ ফল। বাচ্চা নিজেই বলল, "জেঠু, আমায় সরোদ শেখাবে?"

অনিলদা রেডিওর শিল্পী ছিলেন। কিন্তু আর পাঁচজনের মতো মঞ্চ প্রদর্শনই তাঁর সংগীতজীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল না। অনেক সংগীতজ্ঞ আছেন যাঁরা যশ ও খ্যাতির শিখরে পৌঁছতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের সংগীত-ভাণ ও সংগীত-শিক্ষা খ্যাতিমান শিল্পীদের তুলনায় কম—এমনটা মনে করার কোনো কারণই নেই। তাঁদের যেটার অভাব সেটা হচ্ছে সবরকমের শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার ক্ষমতা। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায়, যেহেতু তাঁরা সর্বদা নিজেদের প্রোগ্রাম এবং অর্থোপার্জনের দিকে এতটা মনোযোগী বা পারদর্শী ছিলেন না, সেইজন্য তাঁরা তাঁদের সাংগীতিক ক্ষমতাকে অন্যকার্যে নিয়োজিত করেছেন। যেমন, ভবিষ্যতের সংগীতজ্ঞদের তৈরি করা। অনিলদা সারাজীবন এই কাজটাই করে গেছেন।

আগেই বলেছি, অনিলদা ছিলেন গুরুজির সবরকম সাংগীতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ম্যানেজার। রাজশাহিতে 'রাধুবাবু'র কনফারেন্সগুলিতেও তাই। বিশেষ করে বাইরে থেকে যেসব বড়ো বড়ো ওস্তাদ বা পণ্ডিতরা আসবেন, তাঁদের যথাবিহিত আপ্যায়ন, থাকা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির খবরদারি করতেন তিনি। এইরকম একটি কনফারেন্স চলাকালীন একদিন গুরুজি বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে বসে নানা গালগল্প করছেন আর আমি এইচ.এম.ভি.-র সারমেয় শাবকের মতো তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি। এই সময়ে হঠাৎ অনিলদা দৌড়োতে দৌড়োতে এসে খবর দিলেন, "হাফিজ আলি খাঁর এখনো খাবার জোটেনি। বেলা আড়াইটে বেজে গেছে। উনি ভীষণ রেগে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে রেলস্টেশনে চলে যাচ্ছেন।"

সেইদিনই সন্ধেবেলার আসরে বৃহত্তম তারকা হাফিজ আলি খাঁ। তা ছাড়া উনি আমাদের সাংগীতিক বংশের প্রবীণতম গুণী, আমাদের খলিফা। গুরুজি তো সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন। অনিলদাকে জেরা করে যেসব তথ্য পাওয়া গেল তা হচ্ছে—ওস্তাদরা যে আউটহাউসে আছেন সেটি একটি লম্বা বিল্ডিং। গেট দিয়ে ঢোকার পরেই আছে পরের পর একটি করে থাকার ঘর। এক নম্বর ঘরে আছেন অমুক ওস্তাদ এবং তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গরা, ভোজনরসিক হিসেবে যাঁরা বিখ্যাত। তারপরে দু নম্বর ঘরে আরেক দল, তিন নম্বর ঘরে আরেক দল, এই করে চার নম্বর ঘরে হাফিজ আলি খাঁ সাহেবকে রাখা হয়েছে। গেট দিয়ে খাবার ঢোকামাত্র এক নম্বর ওস্তাদ পরম আহ্লাদে খাদ্যবাহকদের কাছে টেনে নিয়ে খাবারের সিংহভাগ হাওয়া করে দিচ্ছেন। তারপর দু-নম্বর। তারপর তিন নম্বর। এইভাবে খাবারের লঘুকরণ হতে হতে পুরো এক হান্ডা বিরিয়ানি, দিস্তে ছয়েক পরোটা এবং সেগুলিকে যথাযথ সমৃদ্ধ করে তোলবার উপযোগী কাবাব এবং চাঁপ—সবকিছুরই তলানি কোনোমতে তিন নম্বর ঘর পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে কি পৌঁছচ্ছে না, চার নম্বর ঘর তো দূর অস্ত!

দাশু জ্যাঠামশাই (বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) বললেন, "দৌড়োও রাধু, দৌড়োও। Catch hands and feet!"

বাংলা ভাষার বিবিধ সুভাষিতের এরকম মনোরম সরাসরি ইংরেজি অনুবাদের ছড়াছড়ি ছিল গুরুজির বন্ধুমহলে। গুরুজি তো উর্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে হাতেপায়ে ধরে হাফিজ আলি সাহেবকে ঠাণ্ডা করে এলেন। কিন্তু তখন বেলা আড়াইটে বেজে গেছে, নতুন করে আমিষ খাবার তৈরি করবার জো নেই। শেষে ময়রার দোকান থেকে লুচি, ডাল, মণ্ডা এবং মনোহরা সন্দেশ (এক-একটি টেনিস বলের আয়তন, পেটে মাখন পোরা) প্রচুর পরিমাণে এনে বারকোশে সাজিয়ে অনিলদাকে দিয়ে রওনা করে দেওয়া হল।

বারকোশ তখনো মুটে বাহিত হয়ে গুরুজির বাড়ির গেটও পেরোয়নি, উনি হঠাৎ 'এই রে!' বলে প্রায় মুক্তকচ্ছ অবস্থায় বারকোশের পেছনে পেছনে ছুটলেন। বন্ধুবর্গ অর্থাৎ দাশুবাবু, রথীনবাবু, মন্টুবাবু, মুস্তাক আলি খাঁ সাহেব—এঁরা সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে রাধু! তোর আর এখন যাওয়ার কী দরকার?"

বারকোশের পেছনে গুরুজি ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দিলেন, "খেপেছিস তোরা? এটা তো গেট দিয়ে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গেই আবার সেই এক নম্বরের খপ্পরে পড়বে! তারপর দু নম্বর, তারপর তিন নম্বর! অনিলের হিম্মতই হবে না ওগুলোকে বাঁচিয়ে হাফিজ আলি সাহেব অবধি নিয়ে যাবার!"

ম্যাট্রিক পরীক্ষা যথাসময়ে এল এবং গেল। পরীক্ষার হলে কোশ্চেন পেপার এবং খাতার সঙ্গে তিনঘণ্টা ধস্তাধস্তির চেয়েও প্রাণঘাতী ছিল বাড়ি ফিরে বাবার জেরার সম্মুখীন হওয়া। আমার বাবা সেই ধাতের অভিভাবক ছিলেন যাঁরা মনে করতেন ঘোড়াকে যত বেশি চাবকানো যাবে ঘোড়া ততই জোরে দৌড়োবে এবং রেসে এগিয়ে যাবে। তাই করতে গিয়ে ঘোড়া যে মুখ থুবড়ে পড়ে পা ভাঙতে পারে সে-কথা তাঁরা কদাচ ভাবতে পারতেন না। সুতরাং বাড়ি ফিরেই আরো ঘণ্টা তিনেক ধরে প্রতিটি প্রশ্নের

চিন্ময় লাহিড়ি

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর বাবাকে বলতে হত। বলা বাহুল্য, কোনোটাই বাবার মনঃপূত হত না। অন্যরকমভাবে লিখিনি কেন? এরকম উল্লুকের মতন উত্তর কেউ কি কখনো দেয়? মনুষ্যজন্মের বদলে অজ কিংবা গো-জন্মই আমার পক্ষে উপযুক্ত ছিল—এরকম বিবিধ কান-জুড়োনো মন্তব্যের পরে বাবা সেই প্রশ্নে আমার প্রাপ্তব্য একটি নম্বরের উল্লেখ করতেন। তারপর পরের প্রশ্ন। এইভাবে অগ্রসর হতে হতে শেষদিনের শেষ পেপারটির পরিক্রমা সমাপ্ত হবার পর বাবার দেওয়া নম্বরগুলি নিরীক্ষণ করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় চিরকালের রেকর্ড স্থাপন করতে যাচ্ছি—প্রত্যেকটি পেপারেই মোট নম্বর ৮ থেকে ১৩-এর মধ্যে। অন্তিম পেপারটি মেঝেতে নিক্ষেপ করে বাবা শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন যে, "জানতাম এইরকমই হবে! কার কাছে হাতেখড়ি হয়েছিল দেখতে হবে তো!"

যাঁর উদ্দেশে এই কথাটি নিক্ষিপ্ত হল, তিনি ছিলেন আমাদের বাড়ির একজন কাজের লোক, উৎকলবাসী, নাম আনন্দ বেহেরা। আশৈশব বাংলাদেশেই কাটাবার ফলে তিনি বাংলাভাষা এবং বাংলালিপি ভালোই জানতেন। তাঁর কাজ ছিল রান্নাবান্না, বাড়িঘরের অন্যান্য তদারকি এবং বিকেলে বাবা-মা কোথাও বেড়াতে গেলে আমার বেবি-সিটিং করা। সেই সময় রামায়ণ-মহাভারতের বহু গল্প তিনি আমাকে শোনাতেন। কিন্তু শিশুশ্রোতাটির দাপটে সে-সব কাহিনি মূলস্রোতের থেকে প্রায়ই সরে গিয়ে অন্যখাতে প্রবাহিত হত। যেমন, রামের মতন ভালো ছেলে চোদ্দো বছর বনবাসে যাবে, এটা আমার অসহ্য হওয়ায় তাঁর বনবাসকাল হ্রাস করে বছরখানেক করা হল। তারপর রাবণ সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কার দিকে পাড়ি জমাবার আগেই রামের এক বাণে ওইখানেই তার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি। হরিশচন্দ্রের ছেলে রোহিতাশ্ব সাপের কামড়ে মারা যাওয়ামাত্র আমার চিৎকার করে উঠে আনন্দদার উপরে চড় এবং ঘুষি বর্ষণ। বিপন্ন হয়ে

আনন্দদা তখন করলেন কী রোহিতাশ্বকে একেবারে প্রাণে মারলেন না, স্রেফ অজ্ঞান করে রেখে দিলেন। সেই অবস্থায় সে শ্মশানে উপনীত হল এবং বাকি ঘটনা-পরম্পরা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিষ্পন্ন হল।

এই আনন্দদার অভিভাবকত্বে আমার বাল্যকালের অনেকটাই অতিবাহিত হয়েছিল এবং তার ফল খুব খারাপ হয়নি। মহামানব না হতে পারলেও বোধ হয় অমানুষ হইনি।

আর-পাঁচজন বাবা-মায়ের মতন আমার বাবা-মায়েরও নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল, সরস্বতী পুজোর দিন কোনো বিদ্বান মানুষকে দিয়ে আমার হাতেখড়ি দেওয়াবেন। কিন্তু তাঁদের অজান্তে আনন্দদা তার আগেই এই কাজটি সমাধা করেছিলেন, দিনাজপুরের বাড়ির মেঝেতে খড়ি দিয়ে অ-আ-ক-খ ইত্যাদি আমাকে দিযে লিখিয়ে। ব্যাপারটা যখন আবিষ্কৃত হল তখন আমি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছি। অক্ষর পরিচয় মোটামুটি হয়ে গেছে এবং দরিদ্র আনন্দদা চুপিচুপি নিজের পয়সায় একখানি বাচ্চাদের বই কিনে এনেছেন, যাতে বিভিন্ন স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে ছোটো ছোটো ছড়ার মাধ্যমে। মহা উৎসাহে সেটা নিয়ে লেগে পড়লাম। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাবা-মা বাইরে বেড়িয়ে ঘরে ফিরছেন তখন আমি এই ছড়াটায় পৌঁছেছি—'কৃশ বৃষ ধায়, শৃগাল পালায়' (অথবা 'তাকায়', ঠিক মনে নেই)। আনন্দদা বাংলা ভালো জানলেও 'ঋ'-কারের উচ্চারণ তাঁর মুখে উৎকলদেশীয়ই রয়ে গেছিল এবং স্বভাবতই আমাতেও তা বর্তেছিল। সুতরাং ঘরে ঢুকেই মা-বাবা রোমাঞ্চিত হয়ে শুনলেন ছেলে আবৃত্তি করছে—'ক্রুশ্ ব্রুষ্ ধায়, শ্রুগাল পালায়'।

আনন্দদা নতমুখে সমস্ত তিরস্কাব হজম করলেন। আমার আনুষ্ঠানিকভাবে হাতেখড়িও যথাসময়ে হল। কিন্তু আমি সর্বান্তঃকরণে মানি, আনন্দদাই আমাকে প্রকৃত হাতেখড়ি দিয়েছিলেন।

বেশ কিছুদিন জেল খাটবার পরে হঠাৎ একদিন ছাড়া পেয়ে রাস্তায় বেরোলে মানুষ যেমন হতবুদ্ধি হয়ে যায়, কী করবে ভেবে পায় না, ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর আমারও ঠিক সেই অবস্থা হল। যে বিভীষিকা এতদিন আতঙ্কে হিম করে রেখেছিল, তা আপাতত মিলিয়ে গেছে। কিন্তু এখন কী করি? আগে ভেবেছিলাম পরীক্ষার পরপরই একনাগাড়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা ঘুম লাগাব, কিন্তু আটচল্লিশ মিনিটও দু-চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। একনাগাড়ে সাত-আটদিন বাজনা রেয়াজ করবার দৃঢ় সংকল্প কোথায় উধাও হয়ে গেল। যে দু-একজন নিকট বন্ধু ছিল তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি তারাও সব অন্তর্হিত, নিজ নিজ শখ-আহ্লাদের পশ্চাদ্ধাবনে। মস্তিষ্কের ঘোলাটেপনাটা একটু থিতিয়ে আসবার পরে এই চৈতন্যোদয় হল যে, এই দড়িছেঁড়া অবস্থাটা খুব দীর্ঘস্থায়ী হবে না। মাস তিনেকের মধ্যেই পরীক্ষার ফল চোখ রাঙিয়ে উপস্থিত হচ্ছে, যার ওপর আমার সবোদ শিক্ষার মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে। তার থেকে অক্ষত অবস্থায় রেহাই পেলেও, আবার পড়াশুনো, বইপত্র, কলেজ। সুতরাং যে-ক'টা দিন পারা যায় গুরুদেবের চরণে ঠাঁই নিই।

গুরুদেব শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র রাজশাহি জেলার তালন্দ গ্রামের লোক হলেও ভূমিষ্ঠ

হয়েছিলেন কলকাতায় ভবানীপুরে মোহিনীমোহন রোডে। তারপরে তাঁর মাতুল এবং মাতামহ ছাব্বিশ নম্বর চক্রবেড়িয়া রোড (নর্থ)-এ একটি বিশাল বাসগৃহ তৈরি করেন। দেশভাগের পর গুরুদেব এবং তাঁর পরিবারের প্রায় সকলেই এই বাড়ির বাসিন্দা হয়ে যান, কেবল ওঁর বাবা ব্রজেন্দ্রমোহন এবং কাকা গোপীকুলমোহন রাজশাহির বাড়ি আঁকড়ে পড়েছিলেন যতদিন পারা যায়।

এই চক্রবেড়িয়া বাড়িতে বহু গুণীজন সমাগম হত। চিন্ময় লাহিড়ি প্রথম কলকাতায় এসে নিজের বাড়ি করবার আগে এখানে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। প্রায়ই সকালে ওখানে গেলে দেখতাম, নাটমন্দিরে তিনি রেয়াজ করছেন অথবা ছাত্রদের শেখাচ্ছেন। গুরুদেব এবং তাঁর বাড়ির অধিকাংশ মহিলারা তখন মশারির তলায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মোটামুটি দশটায় নিদ্রাভঙ্গ, তার ঘণ্টা চার-পাঁচ বাদে দ্বিপ্রাহরিক আহার এবং তৎপরবর্তী কর্মকাণ্ড যথাযথ ব্যবধানে।

এই সময়ে আমার বন্ধু এবং উত্তরকালের প্রখ্যাত সেতারি নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে গুরুদেবের কাছে তালিম নিতে আসতেন। বলা বাহুল্য, তাঁর বাজনা ও শিক্ষার স্তর আমার থেকে অনেক-অনেক ঊর্ধ্বে ছিল। কাজেই গুরুজি তাঁকে যে-সব জিনিস দিতেন তা ছিল আমার নাগালের বাইরে। কথামালার শেয়ালের মতো সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতাম সেই আঙুরগুচ্ছের দিকে।

প ঞ্চ ম প রি চ্ছে দ
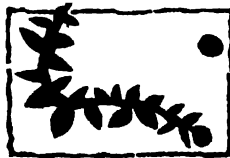
বাবা আলাউদ্দিন খাঁ

একদিন গুরুদেবের চক্রবেড়িয়া রোডের বাড়িতে পৌঁছে দেখি, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব এসেছেন কয়েকদিন ওখানে থাকবেন বলে। গুরুজি আমার ড্যানা ধরে টেনে নিয়ে তাঁর পায়ে মাথা ঠুকিয়ে দিলেন। লোকমুখে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের মেজাজ, কড়া শাসন এবং ছাত্রদের পেটানোর গল্প শুনে-শুনে মনে মনে তাঁর যে রাশভারি ও ভীতিজনক চেহারার কল্পনা করেছিলাম তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই। ছোটোখাটো চেহারার শুভ্রকেশ-শ্মশ্রু এক বৃদ্ধ। চারিদিকে সংগীতজ্ঞদের ভিড়। সকলকেই বাবা বলে সম্বোধন করছেন, যথা—রাধুবাবা, মন্টুবাবা, কচিবাবা (বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী), খোকাবাবা (বীরেন্দ্রকিশোর), হিরাবাবা (হিরু গাঙ্গুলি), জ্ঞানবাবা ইত্যাদি। ঢাকা-ময়মনসিংহের যে অঞ্চলে শৈশব কাটিয়েছিলেন সেইখানকার মধুবর্ষী ভাষায় কথা বলছেন। বহুকাল যাবৎ মাইহারে থাকার এবং হিন্দুস্তানি সংগীত সমাজে মেলামেশার জন্য মধ্যে মধ্যে যে-হিন্দি বেরিয়ে আসছে, ঘনঘন মাতৃভাষার অনুপ্রবেশ ও জবরদখলের চোটে তাঁর হিন্দিত্ব লুপ্তপ্রায়।

আজ মনে হয়, যে কদিন আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব গুরুদেবের বাড়িতে ছিলেন, সর্বক্ষণ যদি ক্যামেরা টেপ-রেকর্ডার এবং ভিডিও-রেকর্ডাব সহ ওখানে উপস্থিত থাকতাম! তার অবশ্য উপায় ছিল না, কারণ শেষোক্ত দুটি যন্ত্র তখনো আমার নাগালের মধ্যে আসেনি এবং অর্বাচীন আমি অধিকাংশ সময় সেখানে কাটানোর প্রয়োজন অনুভব করিনি। ভাবতেই পারিনি যে, ধরা থাকলে সেইসব ঘটনা এবং কথাবার্তার আজ কী মূল্য হত। কয়েকজন ভক্ত লেখকের সুকৃতির ফলে আলাউদ্দিনের জীবনসংগ্রামের যে বিস্ময়কর কাহিনি আজ আমরা পড়তে পাচ্ছি, খাঁ সাহেবেরই জবানিতে সেই সমস্ত ঘটনা

বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব

ছাব্বিশ নম্বব চক্রবেড়িয়া রোডের বৈঠকখানায় বসে সবিস্তারে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল কলকাতাব বহু সংগীতজ্ঞের। দুর্ভাগ্যবশত আমি সবসময় সেখানে থাকতে পারিনি। তাঁর জীবনকাহিনী মোটামুটি এইরকম

বাল্যকালে পাঠশালা ফাঁকি দিয়ে সাধুসন্তদেব আখড়ায় গিয়ে গানবাজনা শোনার জন্য মায়ের কাছে বেদম প্রহাব। তারপর বাড়ি ছেড়ে নয়-দশ বছব বয়সে কলকাতায় পালিয়ে আসা। একবেলা অন্নসত্রে খাওয়া, অন্য বেলা শুধুই জল খেয়ে পেট ভরানো। ঘুরতে ঘুরতে পাথুরিয়াঘাটায় রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে ধ্রুপদীয়া শ্রীগোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ('নুলো' গোপাল) শিষ্যত্ব গ্রহণ। বছর আষ্টেক স্বরসাধনার পর অকস্মাৎ গুরুবিয়োগ। তখন শিমলের দত্তবাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ-র ভাই হাবু দত্তের কাছে বেহালা, কর্নেট, ক্ল্যারিওনেট বাঁশির তালিম। তারপর সেতার, ম্যান্ডোলিন, ব্যাঞ্জো। হাবু দত্তের কৃপায় মিনার্ভা থিয়েটারে তবলা বাজাবার চাকরি। সেখানে গিরিশ ঘোষ কর্তৃক পিতৃদত্ত নাম 'আলম'-এর বদলে নতুন নামকরণ 'প্রসন্ন বিশ্বাস'। ব্যান্ডমাস্টার লোবো সাহেবের কাছে বেহালা শিক্ষার আবেদন রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান। শেষে লোবো সাহেবের মেমসাহেবের করুণালাভ এবং তাঁরই কাছে শিক্ষা এবং যথাসময়ে লোবো সাহেবের হাতে ধরা পড়া। অনেক কান্নাকাটির পর লোবো সাহেবের ক্ষমালাভ এবং তাঁরই ব্যান্ডে চাকরি। এই সময়ে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো দাদা আফতাবউদ্দিনের আবির্ভাব। সতেরো বছরের আলমকে পাঁজাকোলা করে দেশের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। আট-নয় বছরের বালিকা মদনমঞ্জরীর সাথে বিবাহ। বিবাহের রাত্রেই বিয়ের যৌতুক

হিসাবে পাওয়া বউয়ের টাকাগুলি নিয়ে ফেরার।

এরপর ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছায় রাজা জগৎকিশোরের দরবার। "হুজুর, আমি উস্তাদ আলম, সবরকম যন্ত্র বাজাইবার পারি।" চমৎকৃত জগৎকিশোর কর্তৃক রাজসভায় বহাল। অনতিকাল পরে অতিথিশিল্পী ওস্তাদ আহম্মদ আলি খাঁর সরোদ বাজনা শুনে চোখের জলে এতদিনের অহংকাব ধুয়ে সাফ। তাঁর কাছে সবোদ শিক্ষার আবেদন এবং যথারীতি তৎক্ষণাৎ তা নামঞ্জুর। অনেক কান্নাকাটি করে রাজাবাহাদুরকে দিয়ে রাজি করিয়ে, তাঁরই তদ্বিরে খাঁ সাহেবের শিষ্যত্বলাভ। অনিচ্ছায় গ্রহণ কবা শিষ্যকে খাঁ সাহেবের দিনের পর দিন উপেক্ষা। তৎসত্ত্বেও রাত্রে কান পেতে ওস্তাদেব রেয়াজ শুনে শুনে শিক্ষালাভ (ধরা যখন পড়লেন তখন আহম্মদ আলিব কাছে শিক্ষণীয় বিশেষ কিছু নেই)। আহম্মদ আলির মায়ের পরামর্শে বীণকার উজির খাঁ সাহেবের কাছে যাওয়া। সেখানেও এই একই ঘটনা—প্রথমে প্রত্যাখ্যান, তারপবে জুড়িগাড়ির সামনে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে রামপুরের নবাবের সামনে উপস্থিত। এবং শেষে নবাবের সুপারিশে উজিব খাঁর শিষ্যত্বলাভ।

এই যে ঝড়ের বেগে পট পরিবর্তন, যার সংক্ষিপ্ততম বর্ণনা শুনেই পাঠক হয়রান হচ্ছেন, তাতেও কিন্তু আলাউদ্দিনের জীবনের আধাআধির বেশি আমরা পৌঁছোতে পারিনি। সংগীতশিক্ষার যে দুর্মদ অভিলাষ তাঁকে নয় বছব বয়সে বাড়িছাড়া করেছিল, তারই তাড়নায় তিনি অবিশ্রান্ত পথ চলেছেন। তাঁর শিক্ষাকালেবই বিস্তার প্রায় ষাট বছর— একজন বাঙালির গড় আয়ু। আজ যদি উজিব খাঁ এবং আলাউদ্দিন দুজনেই বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো আমরা দেখতে পেতাম, সোয়াশো বছর বয়স্ক গুরুর পদপ্রান্তে বসে একশো বছরের শিষ্য ক্রন্দন করছেন, "ওস্তাদ আমাকে আরো কিছু শেখান, আমি কিছুই শিখিনি।" আজকাল পনেরো-বিশ বছব শিক্ষা নেওয়ার ধৈর্যই আমাদের নেই। তার আগেই ওস্তাদ কিংবা পণ্ডিত হয়ে যাই!

রাধিকামোহন মৈত্রর সঙ্গে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের এক অদ্ভুত বন্ধন ছিল। রাধুবাবু কোনোদিন তাঁর কাছে শেখেননি। তিনি অন্য ঘরানার ধারক, তৎসত্ত্বেও আলাউদ্দিনের তাঁর প্রতি এক নিবিড় স্নেহ ছিল। এর সূত্রপাত ১৯৩৭ সালে, এলাহাবাদে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য সেখানে একটি বড়ো মাপের সংগীত সম্মেলন করতেন। তাতে ভারতের সব বড়ো বড়ো ওস্তাদেরা নিয়মিত আসতেন এবং সম্মেলনের আগে একটি প্রতিযোগিতা হত। ১৯৩৭ সালে উনিশ-কুড়ি বছর বয়স্ক রাধিকামোহন ওই প্রতিযোগিতায় যোগ দেন এবং বলা বাহুল্য, ফার্স্ট হন। বিচারকের আসনে ছিলেন আলাউদ্দিন, হাফিজ আলি, এনায়েত খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ প্রমুখ সকলে। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব হাফিজ আলি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "হাফিজ ভাই, ইয়ে লড়কা কিস্‌কা শাগির্দ হ্যায়?" হাফিজ আলি সাহেবের সংক্ষিপ্ত উত্তর, "আমাদের ঘরের মহম্মদ আমির খাঁ বলে একজন আছে, তার শিষ্য।" আলাউদ্দিন কিন্তু এতেই ক্ষান্ত হলেন না। রাধুবাবুকে ডেকে বললেন, "বাবা, তোমার বাজনা শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তোমার গুরু তোমাকে যথার্থ সরোদবাজের শিক্ষা দিয়েছেন এবং তুমি নিষ্ঠার

সঙ্গে সেগুলি হাসিল করেছ। তোমার আরো উন্নতি হোক। আগামীকাল আমার বাজনা আছে, আমার ছেলে আলি আকবর আমার সঙ্গে বাজায়, সে এবার আসতে পারেনি। তুমি আমাব সঙ্গে বাজাবে?"

রাধিকামোহনের থরহরি অবস্থা। কোনোমতে বললেন, "হুজুর, আমি সামান্য ছেলেমানুষ, তায় আপনার তালিম পাইনি, আমি আপনার কাছে বসে কী বাজাব?"

বৃদ্ধের উত্তর, "তুমার কুন্‌অ কষ্ট হবে না বাবা! আমি ঠিক তুমার বাজনার জায়গা ছেড়ে দিব। দেখবে তুমি ঠিকই বাজাবে।"

কত বড়ো হৃদয় হলে একজন পর্বতপ্রমাণ মানুষ এইভাবে একটি অল্পবয়সি পরের ছেলেকে কাছে টেনে নিতে পারেন। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে রাধুবাবু যে-স্নেহ-ভালোবাসা আন্তরিকতা পেয়েছেন তা আর কারোর কাছ থেকে পাননি, বিশেষত ঘরানার সূত্রে যাঁরা তাঁর কাছের লোক, তাঁদের কাছে তো নয়ই।

বাজনা হয়ে যাবার পরে খাঁ সাহেব রাধুবাবুকে তাঁর নিজের একটি 'জাওয়া' (তিনকোণা স্ট্রাইকার, যা দিয়ে তারে আঘাত করতে হয়) উপহার দেন। রাধুবাবু সেটিকে রুপোর কৌটোয় সযত্নে রক্ষা করে রেখেছিলেন।

এরপরেও রাধুবাবু আলাউদ্দিনের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাননি। মাইহাবে নিজের বাড়িতে বসে আলাউদ্দিন নিয়মিত রেডিও শুনতেন। রাধুবাবুর বাজনা থাকলেই ছেলে এবং মেয়েকে ডেকে শোনাতেন, বলতেন, "শুন্‌অ শুন্‌অ! জমিদারের পোলা, অর বাজনা বাজাইয়া খাইতে লাগব না। তবুও ডাইন হাত বাও হাতের কী তাসির! জাওয়া কেমুন পরিষ্কার তাব কাটে!"

বাইশ-তেইশ বছর বয়সে রাধিকাবাবুর নাতি-নাতনি অনেক হয়ে গিয়েছিল, অবশ্য তারা সকলেই সাংগীতিক দিক দিয়ে। রাধুবাবুর ফার্স্ট হওয়ার বছর তিনেক পরে এই এলাহাবাদেই তাঁর এক প্রশিষ্য (অনিলদার ছাত্রী) প্রীতি বোস সরোদে ফার্স্ট হয়েছিলেন, যখন ভারতবর্ষের সংগীতজগতে আর কোনো মহিলা সরোদিয়ার উদয় হয়নি। বিচারকদের মধ্যে ছিলেন সেই আলাউদ্দিন বাবা। বাঙালি মেয়ের চিরন্তন ধারায় প্রীতিদি আজ সংসার-সমুদ্রে সাঁতার কাটছেন, বাজনা উধাও হয়ে গেছে।

মহম্মদ আমির খাঁ সাহেব

অল্প বয়সে গুরুকে হারিয়েছিলেন রাধিকামোহন। মহম্মদ আমির খাঁ তাঁদের বাড়িতেই দীর্ঘদিন ছিলেন, রাধুবাবুকে জন্মাতে দেখেছেন এবং কোলে করে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেই গুরু যখন অকস্মাৎ চলে গেলেন তখন

রাধিকামোহনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বার মতন অবস্থা হয়েছিল, যদিও আমির খাঁ সাহেব তাঁকে উজাড় করে বিদ্যাদান করেছিলেন এবং সরোদের বাজ যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে তাঁকে দিয়ে আয়ত্ত করিয়েছিলেন। কিন্তু কুড়ি-একুশ বছর বয়সে শিক্ষালাভ শেষ করে বসে থাকার মতো ছেলে রাধিকামোহন ছিলেন না। তিনি প্রথমে গেলেন ওস্তাদ হাফিজ আলির শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে। সেটা সম্ভব হল না।

শুভাকাঙ্ক্ষীরা তখন বললেন, ওস্তাদ আলাউদ্দিনের কাছে যা না! উনি তোকে কী রকম স্নেহ করেন সবাই জানে।

গুরুজি বিশুদ্ধ রাজশাহির উচ্চারণে জবাব দিলেন, "স্নেহ-টেহ সবই মা(ই)ন্‌লাম ভাই! কিন্তু ওরকম বেধড়ক মা(ই)র্‌ খেতে পা(ই)র্‌ব না!"

শিক্ষাকালে ছাত্রদের প্রহারের ব্যাপারে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। মাইহারের রাজা (তাঁর শিষ্য) ঠিকমতো কোনো একটা জিনিস তুলতে পারেননি বলে তাঁর হাত মুচড়ে দিয়েছিলেন। তারপরে শোনা যায়, রাজাকে মেরেছেন বলে শাস্তির ভয়ে একেবারে বাক্সপ্যাঁটরা, বউ-বাচ্চা নিয়ে সটান মাইহার স্টেশন। ট্রেন আসার আগে রাজাবাহাদুর এসে হাজির। তিনি ঠিক আঁচ করেছিলেন আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব আজ একটা কাণ্ড ঘটাবেনই। এ-প্ল্যাটফর্ম থেকে ও-প্ল্যাটফর্মে দৌড়োদৌড়ি, চোর-পুলিশ খেলার মতো। শেষে রোরুদ্যমান গুরুকে ধরে ফেলে রাজাবাহাদুর বললেন, "আপনার মার আমার কাছে আশীর্বাদ। আপনি সত্যিই আমাকে ভালোবাসেন। বাড়ি ফিরে চলুন, এরকম পাগলামো করবেন না।"

আর-একবার তাঁর এক শিষ্য, মাইহার ব্যান্ডের বাদক, ঝুররা মহারাজের মাথায় হাতুড়ির এক ঘা। মাথা ফেটে ছাত্র হাসপাতালে, গুরুর দু-বেলা ফলমূল-দুধসহ সেখানে গিয়ে কান্না!

ছেলে এবং অন্যান্য শিষ্যদের ওপরে তো নানারকমের ভয়ংকর সংশোধনক্রিয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

অতএব রাধিকামোহনের আলাউদ্দিনের কাছে শেখা হয়নি। শেষ অবধি গাণ্ডা বেঁধেছিলেন আলাউদ্দিনের গুরু উজির খাঁ সাহেবের বড়োনাতি দবির খাঁ সাহেবের কাছে।

দবির খাঁ সাহেবের সামনে পড়লে আলাউদ্দিন খাঁ গড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করতেন, ওস্তাদের নাতি ওস্তাদেরই সমতুল্য, তাঁর খলিফা।

চক্রবেড়িয়ায় গুরুজির বাড়িতে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের অবস্থানকালের আর-একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন কথায়-কথায় তিমিরবরণের প্রসঙ্গ এসে পড়লে খাঁ সাহেব তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। বলতে লাগলেন যে, তিমিরবরণ তাঁর কাছে বেশিদিন থাকলেন না। যেভাবে যতদিন খাঁ সাহেব তাঁকে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করেছিলেন তা অসমাপ্ত রেখেই তিমিরবাবু অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঠিকভাবে তালিম এবং রেয়াজের মধ্য দিয়ে গেলে আজ তিনি ভারতের অদ্বিতীয় সরোদিয়া হতে পারতেন। এতটাই রাগ ও অভিমানের সঙ্গে কথাগুলি বলতে লাগলেন যে, মনে হল তিনি আর তিমিরবরণের মুখদর্শন করতে চান না।

এই সময়ে একজন এসে খবর দিল, বাইরে তিমিরবরণ এসেছেন, তিনি খাঁ সাহেবের দর্শনপ্রার্থী।

মুহূর্তের মধ্যে কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল। "বাবা তিমির, এসেছো?"—বলে গুরু দৌড়ে গিয়ে শিষ্যকে জড়িয়ে ধরলেন। সে এক দৃশ্য। শিষ্যও কাঁদছেন, গুরুও কাঁদছেন। গুরু বারংবার বলছেন, "আমাকে তুমি আর কত দুঃখ দেবে?" শিষ্য বলছেন, "আপনার বড়োছেলে কে? আমি, না আলি আকবর? বলুন বাবা, বলুন।"

প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্যে সংগতি না-থাকলেও তিমিরবরণের দাবি মোটেই অযৌক্তিক নয়। শিষ্যত্বের দিক দিয়ে তিনি শুধু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবেরই বড়োছেলে ছিলেন না, রাধিকামোহনের ওস্তাদ মহম্মদ আমির খাঁ সাহেবেরও বড়োছেলে ছিলেন। জোড়াসাঁকো অঞ্চলে শিবু ঠাকুরের গলিতে তিমিরবাবুর বাড়িতে আমার পিতৃদেব মধ্যে মধ্যে যেতেন বন্ধুত্বের সূত্রে। সেখানে তিনি দেখেছেন কত যত্ন করে আমির খাঁ সাহেব তিমিরবাবুকে শেখাচ্ছেন। কখনো কখনো রাত্তিরে ওঁর বাড়িতেই রাত কাটাতেন, কখন কী ভালো জিনিস মনে পড়বে, শিষ্যকে ঘুম থেকে উঠিয়ে শেখাবেন বলে। এইজন্যই বোধহয় আগেকার দিনে শিক্ষাকালে শিষ্যদের সর্বক্ষণ গুরুর কাছে থাকবার বিধান প্রচলিত ছিল। তিমিরবরণ যখন আলাউদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তখন আলাউদ্দিন তাঁকে মহম্মদ আমির খাঁ-র অনুমতি নিয়ে আসতে বলেছিলেন। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও আমির খাঁ বলেছিলেন, "অত বড়ো একজন ওস্তাদের কাছে শিখবে, এ তোমার সৌভাগ্য, আমার কোনোই আপত্তি নেই।"

মিহিরকিরণ, তিমিরবরণ এবং শিশিরশোভন। শব্দসুষমায় এবং ছন্দের মিলে অপরূপ এই নামকরণ হয়েছিল তিন ভাইয়ের। জ্যেষ্ঠ মিহিরকিরণ বেহালা বাজাতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময় পুজোআচ্চা নিয়ে কাটাতেন। তাঁর ছেলে অমিয়কান্তি (ভোম্বল) তৎকালীন বাঙালি সেতারিদের পুরোভাগে ছিলেন। তিমিরবরণ আজ কিংবদন্তি। গুরুকে যে-দুঃখ দিয়েছিলেন, তার অনেকটাই ক্ষতিপূরণ করেছেন নিজের ছেলে ইন্দ্রনীলকে গুরুর হাতে তুলে দিয়ে। ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য আলাউদ্দিন বাবার শেষ সার্থক ছাত্র এবং শুধু ভারতবিখ্যাত নয়, জগৎবিখ্যাত সেতারি। কনিষ্ঠ ভাই শিশিরশোভন আকাশবাণীতে কাজ করতেন পাখোয়াজ এবং তবলাবাদক হিসাবে। একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রেডিওতে বাজাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

বহু সংগীত এবং সংগীতজ্ঞদের কথাবার্তায় মুখরিত সেই ছাব্বিশ নম্বর চক্রবেড়িয়া রোড (নর্থ) আজ সম্পূর্ণ নীরব ও নিশ্চিহ্ন। প্রথমে জরাজীর্ণ ভগ্নদশা, বাসিন্দাদের স্থানান্তরগমন এবং সর্বশেষে প্রোমোটারের হস্তক্ষেপের ফলে সে-বাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে এখন বিশাল বিশাল সাদা রংয়ের মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এ রূপান্তর লাভ করেছে। ওখান দিয়ে গেলেই চোখে পড়বে, আমারও পড়ে, এবং তখনই অনিবার্যভাবে কেন জানি না আমার মনের মধ্যে গুমরে ওঠে চিরন্তন সেই শ্মশানযাত্রার ধ্বনি—"বলো হরি, হরিবোল"। পাঠক আমাকে গেঁয়ো, কুসংস্কারী, নাটুকে যা-খুশি-তাই ভাবতে পারেন, কিন্তু আমার এর থেকে নিস্তার নেই।

৩১নং শিবুঠাকুরের গলির সেই বাড়ি। ইনসেটে তিমিরবরণ

রাধুবাবু বাল্যকালে যাকে বলে 'দুষ্টু' ছেলে ছিলেন। বেশি শাসনের নিগড়ে বাঁধতে গেলেই পিছলে যেতেন। তখন ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়েন, গ্রীষ্মের ছুটিতে গিয়েছিলেন ওঁদের কার্সিয়াং-এর বাড়িতে। সেখানে বাবা ব্রজেন্দ্রমোহন মহা ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করলেন। ওঁর প্রাইভেট টিউটর ছিলেন রাজশাহি লোকনাথ হাইস্কুলের হেডমাস্টার গোষ্ঠবিহারী মজুমদার, তাঁকে কার্শিয়াং নিয়ে এলেন সকাল-বিকেল রাধুকে পড়াবার জন্য। মহা মুশকিল! সবেমাত্র পরীক্ষা দিয়ে ছুটি কাটাতে এসে এ কী ধরনের খিটকেল!
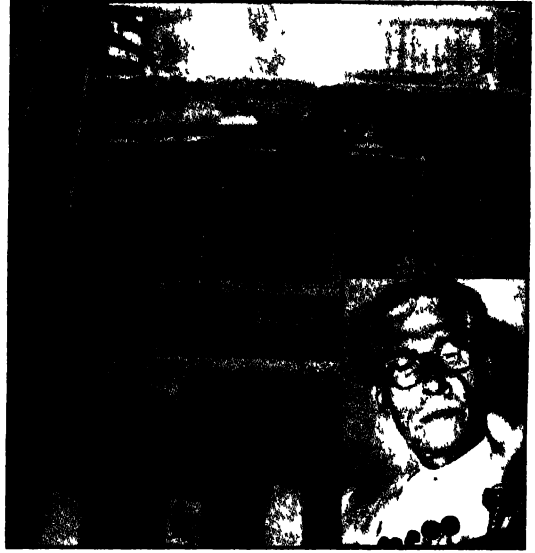
রাধুবাবু কার্শিয়াং স্টেশনে মাস্টারমশাইকে আনতে গেলেন। গিয়ে বললেন, হাঁটাপথ প্রায় তিন মাইল, আপনার কষ্ট হবে, শর্টকাটে নিয়ে যাচ্ছি চলুন। শর্টকাট মানে খানচারেক পাকদণ্ডি অতিক্রম করা। গোষ্ঠবিহারীবাবু কলেবরে এবং আকৃতিতে ছিলেন একেবারে স্যার আশুতোষ। ওই বপু নিয়ে ছাত্রের কথা শুনে পাকদণ্ডি বেয়ে বার কয়েক যাতায়াত করতেই তাঁর একেবারে দাঁতকপাটি লেগে গেল। তিনি হাঁসফাঁস করতে করতে পরের দিনের ট্রেনে শিলিগুড়ি প্রস্থান করলেন।

ইস্কুল কম্পাউন্ডে কতকগুলি গাছ ছিল, তার একটির ডালে গ্যাঁট হয়ে বসে ছোকরা রাধু বিড়ি টানছে। বিড়ি আবার সাধারণ বিড়ি নয়, 'স্টুডেন্ট কোয়ালিটি' নামক এক শ্রেণির বিড়ি। এই সময় হেডমাস্টারমশাই গোষ্ঠবিহারীবাবু অকস্মাৎ গাছতলায় উপস্থিত। ধূমায়মান ছাত্রকে দেখে বজ্রনির্ঘোষে হাঁকলেন, "নেমে আয় এক্ষুনি।"

রাধুবাবুর নামবার নাম নেই। নিশ্চিন্তে বসে টেনেই যাচ্ছেন। হেডমাস্টার আবার গর্জন করে উঠলেন, "বেশি দেরি করলে দুটো কানই টেনে ছিঁড়ব কিন্তু।"

এবার ছাত্রের মুখে কথা ফুটল, "মার তো স্যার খাবই জানি। কিন্তু তাই বলে পয়সা দিয়ে কেনা বিড়িটা কেন নষ্ট করি।" বলে আরো দুটো সুখটান দিয়ে একলাফে গাছ থেকে মাটিতে পড়ে দে-দৌড়। হেডমাস্টারমশাইয়ের সাধ্য কী তাঁকে দৌড়ে ধরেন!

তখনকার দিনে প্রত্যেক স্কুলে একজন কী দুজন সংস্কৃতে পারদর্শী পণ্ডিতমশায় থাকতেন, এবং কখনো কখনো বাংলা পড়াতেন। রাজশাহির লোকনাথ স্কুলে আমিও বছর দেড়েক পড়েছি, সেখানে একজন অতিবৃদ্ধ পণ্ডিতমশায় ছিলেন, যিনি আমার গুরুকেও পড়িয়েছেন। পড়ানোর বিষয় ছাড়া সারা পিরিয়ডটা একটাও হাল্কা কথা

বলতেন না। অধ্যয়নের কঠোরতা যখন অসহনীয় হয়ে উঠত তখন ছাত্রদের প্রতিবাদ মৌখিক হবার বদলে নানা পরোক্ষ আকারে প্রকাশ পেত। যেমন, কাগজের গুলি পাকিয়ে বা চক ছুঁড়ে একে-ওকে মারা, উদাসভাবে জানলা দিয়ে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ, খাতায় কবিতা লেখা, পণ্ডিতমশাইয়ের নানা মনোমুগ্ধকর পোর্ট্রেট বিভিন্ন দিক থেকে আঁকা ইত্যাদি। রাধুবাবু একদিন পেছন থেকে পণ্ডিতমশাইয়ের চাদরে কালি ছিটিয়ে দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বুঝতে পারলেন যে, পণ্ডিতমশাই তাঁর কালি ছিটোনোর ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। তিনি বসে বসে উসখুস করতে লাগলেন। পণ্ডিতমশাই কিন্তু কিছুই বললেন না, কালি ছিটনো চাদরটা একবার নেড়েচেড়ে দেখে আবার কাঁধে ঝুলিয়ে পড়াতে শুরু করলেন।

এর বছর পাঁচেক পরে (তখন রাধুবাবু স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়ে গেছেন) স্কুলে মাস্টারমশাইদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন, পণ্ডিতমশাই তখনো সেই কালিকলঙ্কিত চাদরটাই ব্যবহার করছেন, নতুন চাদর তাঁর আর জোটেনি। দৌড়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা নতুন চাদর নিয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে দিয়ে এলেন। পণ্ডিতমশাই সেটা গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু পুরোনো চাদরটা দেখিয়ে বললেন, "এডারে আমি কিন্তু ফালাইয়া দিতে পারুম না, এর লগে তর মতন কত ধনুর্ধরের কীর্তিকলাপ জড়ানো আছে!"
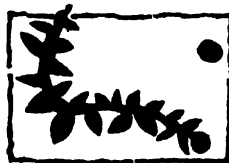
ষ ষ্ঠ প রি চ্ছে দ

কলকাতা

স্বাধীনতা লাভের পর ছাপ্পান্ন বছর কেটে গেছে। এখনো মধ্যে মধ্যে কোনো কোনো সময়ের এবং কিছু কিছু জায়গার কথা ভাবলে মনটা দেশদ্রোহী হয়ে যায়। চিৎকার করে বলে ওঠে, "ব্রিটিশের আমলে না-হয় অনেক শোষণ ছিল কিন্তু ১৯৪৭ সাল থেকে তো সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, তবে আজ আমাদের এই হাল কেন?"

এইসব সময় এবং জায়গার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৪৭-৪৮ সালের কলকাতার উড স্ট্রিট, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট অঞ্চল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আয়নার মতো চকচকে রাস্তা, বড়ো বড়ো গাছ, চারদিকে শীতল নির্জনতা, বিশাল কম্পাউন্ডের মধ্যে সুদৃশ্য বাড়ি, সামান্য দু-একজন পথচারী, ক্বচিৎ কখনো এক-আধটা মোটরগাড়ি। সাহেবরা অধিকাংশ এই অঞ্চলেই বাস করতেন এবং পাড়াগুলিকে লন্ডনের শহরগুলির ধাঁচে বানিয়েছিলেন। উড স্ট্রিটের সব থেকে নগণ্য যে একতলা বাড়িটি সেটিও একটি কম্পাউন্ডওলা বাংলো। বর্তমানে শর্ট স্ট্রিট এবং উড স্ট্রিটের মোড়েতে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের যে প্রাচীরটি দেখা যায়, সেটিই ছিল এ-বাড়ির শোবার ঘরের দেওয়াল। এই বাড়ি, বারো নম্বর উড স্ট্রিট, দেশভাগের এবং খুলনা ছেড়ে আসার পর বছর তিনেক আমাদের বাসস্থান ছিল। উড স্ট্রিটের একপ্রান্তে থিয়েটার রোড এবং স্যাটারডে ক্লাব, অন্যপ্রান্তের একদিকে ছোটো একটি পার্ক এবং পার্ক স্ট্রিট, সেটা পেরিয়ে সোজা চলে গেলে ওয়েলেসলি, ওয়েলিংটন স্কোয়্যার, কলেজ স্ট্রিট ইত্যাদি। ওয়েলেসলি পৌঁছতেই বাড়ি-ঘরদোর-রাস্তাঘাটের চরিত্র পালটে যেত।

পার্ক স্ট্রিট আজকাল যে কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে, তখন তা ছিল না। মধ্যে মধ্যে এক-আধফালি ঘাসের দেখা মিলত। বনেদি বাড়ির মধ্যে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ,

কয়েকটি ওষুধের দোকান, বইয়ের দোকান, এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়ি, রেস্তোরাঁ ম্যাগনোলিয়া এবং পিপিং।

শায়েস্তা খাঁ কিংবা আওরঙ্গজেবের আমলে জন্মাইনি, সুতরাং টাকায় আট মণ চাল দেখিনি, কিন্তু মধ্যে মধ্যেই আমার মেজোকাকাকে ধরে পিপিং-এ গিয়ে ছ'আনায় দুটো বড়ো বড়ো চিংড়ির কাটলেট সাঁটিয়েছি। অন্যান্য খাবারের দামও অনুরূপ। তিনজন চৈনিক ভাই মিলে রেস্তোরাঁ চালাত— দুই ভাই ওয়েটার, বড়ো ভাই কাউন্টারে, তিন বউ রান্নাঘরে, ছেলেমেয়েরা টেবিল সাজানো এবং বাসন-কোসন ধোয়ার কাজে। সবাই সদাহাস্যময়। কাজের মধ্যে আনন্দ পেলে মানুষের যে-চেহারা হয়, ঠিক সেইরকম। এই পিপিং-এ যাবার জন্য সর্বদা ছোঁক-ছোঁক করতাম।

আমার মেজোকাকা ধীরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত অল্পবয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিপ্লবীদের দলে যোগ দেন। স্বাধীনতার পরে কমিউনিস্ট হয়ে যান। একটি প্রেস চালাতেন, এবং অন্যান্য কাজকর্ম স্বাধীনভাবে করতেন, চাকরি করেননি। ওঁকে উৎপাত করে মধ্যে মধ্যেই পিপিং পরিক্রমা হত। নানাবিধ অনুস্বার-বিসর্গযুক্ত নামের চৈনিক খাদ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে হঠাৎ একদিন একটি সাতিশয় উপাদেয় জিনিসের দেখা মিলল—'পোর্কচপ'। একগাদা আলুচটকানির মধ্যে সুপুরি পরিমাণ মাংসের কিমা গুঁজে তাকে কর্কশ রুটির গুঁড়োর ওপর গড়াগড়ি খাইয়ে কড়া তেলে ভেজে যে জিনিসটি আমাদের দেশে 'চপ' নামে পরিবেশিত হয়, যেটাকে হাতে ধরলেই মনে হয় দু'দিন দাড়ি-না-কামানো থুতনির ওপর হাত বোলাচ্ছি, তার সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই। পোয়া দেড়েক ওজনের হাড়বিহীন একটি শুয়োরের মাংসের টুকরো, তাকে চিনা বউদিমণিরা কী প্রক্রিয়ায় কী মশলা সহযোগে রাঁধেন জানি না, মুখে দিয়ে মনে হয় এ নিঃসন্দেহে দেবতাদের খাদ্য। অদ্যাবধি তার স্বাদের প্রথম অনুভূতি মুখে লেগে আছে। দাম হল একটু বেশি— আট আনা। পোর্কচপের আমেজে একেবারে জরানো অবস্থায় বাড়ি ফিরেই মাকে ধরলাম, "তোমাকে একদিন পিপিং-এ নিয়ে যাব, একটা অপূর্ব জিনিস খাওয়াব।"

"আহা কী ভাগ্যি আমার! কী সেই অপূর্ব জিনিস, শুনি?"

"পোর্কচপ।"

ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে মায়ের আমার সংহারমূর্তি ধারণ।

"মণি! (মেজোকাকার ডাকনাম) তোর না-হয় বনে-জঙ্গলে পালিয়ে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে বাদুড়-চামচিকে অবধি কোনো কিছুর মাংসই বাদ নেই, ছেলেটাকে এসব ছাইভস্ম খাওয়াচ্ছিস কেন?"

"এ কথার উত্তরে আমি দুটো প্রশ্ন করব, বউদি। পয়লা প্রশ্ন হল, এ-বাড়িতে কি শুয়োর খাওয়া হয় না? আমি তো জানি বিলক্ষণ হয়!"

"আহা এমনভাবে বলছিস যেন দু-বেলা শুয়োরের ঘণ্ট, শুয়োরের চচ্চড়ি, শুয়োরের ডালনা খাওয়াচ্ছি। পতিসেবা করতে তোদের বাড়ি ঢুকেছিলাম, তোর দাদা এদিকে কট্টর বাঙালি কিন্তু জিভটা হঠাৎ হঠাৎ বিকট রকম সাহেবি হয়ে যায়। তখন আমাকে মাঝে-মধ্যে শুয়োরের শুঁটকি, শুয়োরের বড়া ভাজতে হয়। কিন্তু এক টুকরোও আমায় মুখে তুলতে দেখেছিস? আর ওই তোদের 'সসেজ', দেখলেই এমন একটা

জিনিসের কথা মনে পড়ে যায় যে অন্নপ্রাশনের ভাত উগরে আসে।"

মেজকাকা এইসব কথায় কান না-দিয়ে বলে চললেন, "দ্বিতীয় প্রশ্নটা হল, এই ছোঁড়ার পূর্বসূরী, মানে আসল বুদ্ধদেব, কপিলাবস্তুর গৌতম বুদ্ধ, পোর্ক খাবার যম ছিলেন জানেন কি? শেষমেশ বুড়ো বয়সে একদিন মাত্রাতিরিক্ত পোর্ক ঢেঁকিচালান দিয়ে পেট ছেড়ে দেয, তাতেই তাঁর নির্বাণলাভ হয়।"

"কী সব আগল-পাগল বকছিস।"

"বিশ্বাস না হয় ইতিহাস পড়ে দেখুন।"

"সমস্ত ইতিহাস পড়ে এই একটাই শিক্ষা তোর হয়েছে, শুয়োরের মাংস খাওয়া! ওকে আর কোনোদিন পিপিংয়ে নিয়ে যাবি না, বলে দিলাম।"

মায়ের কথার ওপব কথা বলবার সাহস বাড়িতে কারো ছিল না। সুতরাং পিপিং পর্বের সেইখানেই সমাপ্তি। শাস্ত্রে বলে পিতামাতার সেবা করলে বিশাল পুণ্য হয়, তা আমার মাতৃসেবাব প্রচেষ্টার এই মর্মান্তিক পরিণতি হল।

অল্প কিছুদিন বাদেই মা আব একবার সংহারমূর্তি ধারণ করলেন—আমার ওপর নয়, অন্য দুজনের ওপরে, এবং তার ফলাফলটা আমার বিপুল আহ্লাদের কারণ হল। বাবা এবং গুরুজি বারান্দায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন, মা হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, "ছেলেটা আড়ে না-বাড়লেও দিঘে তো বেশ বেড়ে উঠছে, তোমাকে ধরে ফেলল বলে। আর কতদিন ওই লিলিপুট সরোদ বাজাবে? এখন যখন বাজাতে বসে তখন মনে হয় ওকে একটা দেশলাই-এর বাক্সোয় ঠেসে বন্ধ করা হয়েছে। এবার ওকে একটা বড়ো সরোদ কিনে দাও, রাধুবাবুর যন্ত্রটা ফেরত দিয়ে দাও।"

বাবা বজ্রাহতের মতো চুপ করে রইলেন। মা বলে চললেন, "কী হল, কথা নেই কেন? এতদিন তো দুই দোস্ত সড় করে দিনরাত্তির ছেলেটাকে ভয় দেখাতে -ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেলে তবে নতুন সরোদ, না হলে শেখা বন্ধ করে দেবে! ছেলে পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়েছে, এখন তোমাদের যা করণীয় সেটা না করে দিব্যি মুখ বুজে বসে আছ? কবে নতুন সরোদের অর্ডার দেবে বলো? ক'টা টাকা বার করতে এতই কষ্ট হচ্ছে?"

বাবা তবুও নিশ্চুপ। এতক্ষণে গুরুজি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মিনমিন করে বললেন, "দেখুন না বউদি, আমার পাঁচ হাজার টাকা বাজির পাঁচটা টাকাও কি আজ অবধি প্রফুল্লবাবু বার করেছেন?"

"বাঃ বাঃ, রাধুবাবু, বেশ! দুই বন্ধু একসঙ্গে পথ চলছিলেন, এখন বন্ধুর বিপদ দেখে দিব্যি কেটে পড়ে গাছে চড়ে বসলেন? আমি বুঝি কথামালার ভাল্লুক?"

দুই বন্ধু স্তম্ভিত ও নির্বাক। মা-ই ফের বললেন, "তাই যদি হই তো নিশ্চিত জানবেন, আমি আপনার বন্ধুর কানে কানে উপদেশ দিয়ে চলে যাব না। আপনাকেও গাছ থেকে কাছা ধরে টেনে নামাব। তার থেকে মানে মানে নিজেই মাটিতে নেমে আসুন, পরামর্শ করে ঠিক করুন কবে সরোদের অর্ডার দেওয়া হবে। যদি আপনার বন্ধু টাকা না বার করেন, আমি নিজের গয়না বেচে ছেলেকে সরোদ কিনে দেব।"

এতক্ষণে বাবার মুখ খুলল, "ছেলে তোমার তাহলে সরোদ বাজিয়েই খাবে?"

এই অদ্ভুত কথাটার পটভূমি হচ্ছে, ইদানীং বাবার মনে দুটি বিপরীতমুখী ভাবনার

লড়ালড়ি সর্বদাই লেগে থাকত। একদিকে ছেলে ভালো বাজাক এটাও যেমন খুবই অভিপ্রেত, অন্যদিকে বাজনায় বেশি জমে গেলে যদি পড়াশুনো নষ্ট হয়ে যায় সেই আতঙ্কও ততটাই গভীর! ফলে বাজনা ভালো না হলে অথবা বাজনা নিয়ে বেশি মশগুল হয়ে গেলে দুই ক্ষেত্রেই বাবার প্রতিক্রিয়া একই রকম হত। বসে বসে উচ্চৈঃস্বরে স্বগতোক্তি করতেন—তিনি মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতের সরোদটা একটা তুলোধোনা যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে, আমি বাড়ি বাড়ি পুরোনো লেপ-কম্বলের তুলো ধুনে জীবিকা নির্বাহ করছি।

বাবার কথাটার উত্তরে এই কথাটাই মা ছুঁড়ে মারলেন—"না না, সরোদ বাজিয়ে খাবে কেন? বহুবার তো ভবিষ্যদ্বাণী করেছ ছেলে তুলোধুনে খাবে, তা সেই ব্যবস্থাই করো। কলেজ ছাড়িয়ে দাও, একটা তুলোধোনার তাঁট্ কিনে দাও, অনেক কম পয়সায় হয়ে যাবে। ওকে ধুনুরির কাছে এখনি ট্রেনিংয়ে জুতে দিই।"

এই বলে আমার মাতৃদেবী পদভারে মেদিনী কাঁপিয়ে প্রস্থান করলেন। দুই বন্ধু বারান্দায় বসে গুজগুজ করতে লাগলেন।

পরদিন সকালে গুরুজি টেলিফোন মারফত জানালেন, "কমপ্লিট সারেন্ডার।" সরোদ মঞ্জুর হয়ে গেছে। উনি অনিলদাকে আমাদের বাড়ি পাঠাচ্ছেন আমাকে নিয়ে সরোদের অর্ডার দেবার জন্য। ছুটলাম সরোদের দোকানে। মালিক হচ্ছেন গোপাল মিস্ত্রি। ওঁর শ্বশুর গোবর্ধন অনেক বড়ো বড়ো ওস্তাদের সরোদ তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে তিমিরবরণ এবং হাফিজ আলি খাঁ-র সরোদও ছিল। গোবর্ধনের পরে তাঁর সমস্ত কাজকর্ম তাঁর জামাই গোপালের কাছে চলে আসে।

চিৎপুর রোড থেকে একটি ছোটো রাস্তা বেরিয়ে রবীন্দ্রভারতীর গেট অবধি গেছে। সেই রাস্তার মুখে চিৎপুর রোডের ওপর গোপালবাবুর দোকান। সাইনবোর্ডে লেখা 'ঢাকাই সেতারের দোকান'। দোকানময় ঢোল, পাখোয়াজ, তানপুরা, এস্রাজ, সরোদের সঙ্গে সেতারের রাশি রাশি কঙ্কাল ঝুলছে। সেগুলোর থেকে অতিকষ্টে মাথা বাঁচিয়ে দেওয়ালে সাঁটানো একটি এঁড়ে-লাগা খচমচে বেঞ্চির ওপর বসতে না-বসতেই কোথা থেকে দু-খুরি চা চলে এল। গোপালবাবুর বয়স সত্তরের কাছাকাছি, চোখে রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো গোল গোল মোটা মোটা কাচের চশমা, তার মধ্যে একটা কাচ ঘষে সাদা করা আছে, অর্থাৎ তার মধ্যে দিয়ে দেখার আর কোনো প্রয়োজন নেই। চালু চোখটা দিয়ে ঈগলপাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মশাইগো কিয়ের লাইগ্যা আসা?"

অনিলদা বললেন, "গোপাল আমায় চিনতে পারছ না, আমি অনিল রায়চৌধুরী।"

"আরে, আরে, মাপ কইর‍্যান। পাচ্ বৎসর পায়ের ধূলা দ্যান নাই দেইখ্যা চিনতে এট্টু দেরি হইল।" এই বলে গত পঁচিশ বছর ধরে অনিলদার সঙ্গে কী কী কাজ-কারবার করেছেন তার ঠিকুজি ঝরঝর করে বলে গেলেন—কার জন্য কোন সরোদ কোন সেতার কবে করেছেন, কোন যন্ত্র ডেলিভারি নেওয়ার সময় অনিলদা ঝুলোঝুলি করে দাম পাঁচ টাকা কমিয়েছিলেন ইত্যাদি।

এরপর আমার যন্ত্রের অর্ডার। কী ধরনের যন্ত্র হবে, কটা কান, কটা তরফ, কোন কাঠের—ইত্যাদি নানাবিধ ফিরিস্তি। গোপালবাবু বললেন, "পুরোনো ইস্টাইলের করুম,

না আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ভাই আয়েতালি উস্তাদ যে নতুন ধাঁচ বানাইছে, তাই করুম? আপনাগো থিক্যা তার বড়ো কান দুইখান বেশি, বাওদিকের ঘাড়িতে চাইরডা তার প্রোয়ারি করা, হাড়িডা অনেক বড়ো, একদম গোল। আলাউদ্দিন বাবায় অহন এই নূতন ইস্টাইলই বাZান, পোলারে আর ভাতিজারেও দিছেন। তুন কাঠ।"

"আমাদের পুরোনো স্টাইলই চলবে, সেগুন কাঠ। আচ্ছা গোপাল, তুমি কখনো আখরোট কাঠের সরোদ বানিয়েছ?"

"ক্যান দাদা? আমাগো বাপ-পিতামোর আমল থিক্যা তুন আর সেগুনের সরোদ চালু আছে, হডাৎ আফনের আখরোট কাঠের হাউশ হইল ক্যান? এ দেহি আপনার গুরুর রোগ ধরছে। উনিব হডাৎ খেয়াল হইল গাম্ভার কাঠের সরোদ তৈয়ের করাইবেন। কোন বইতে পইড্যা নি জানছেন গাম্ভারের সরোদে গুঁZ বেশি হয়। গাম্ভারের গুড়ি আনাইয়া মাখ্‌নাবে (মাখনলাল রায়, যন্ত্রের কারিগব, ভবানীপুরে দোকান) দিয়া খালাইলেন। আওয়াজ যা বাইরাইল! এক হপ্তার মইধ্যেই যন্তরডা কার Zানি ঘাড়ে ঝাইর‍্যা দিয়া বাচেন। আব আখরোট কাঠ? পাচ বছর আগে এক উস্তাদ উনাবে বোং চোং দিছিলেন আখরোট কাঠের সবোদ দিবেন। রাধুদাদা আখরোট কাঠ আখরোট কাঠ কইর‍্যা খুব চেইত্যা ওঠলেন। সেই উস্তাদই আমারে একখান ফাটাফুটা সরোদ দিয়া কইছিলেন, 'জলদি মরাম্মত ঔর পালিশ করো, রাধুবাবু কো দেনা হ্যায়।' বাটালি দিয়া এট্টু চাঁছতেই তুনের আঁশ বাইরাইয়া পরল। ওই যে পইদ্যে ল্যাখছে, 'পিদ্দিম Zালাইয়া দেহি দাঁড়কাগের বাসা রে, দাঁড়কাগের বাসা'—এক্কেরে বেবাক সেই কাণ্ড। আমরা সাতপুরুষের কাঠের-ঘুণ কাবিগর, আমাগো কাঠের আন্দাZ নাই? উস্তাদের মতলব বোঝলাম। দুগ্‌গারে (দুর্গা হচ্ছেন গোপালের ছোটো ভাই) রাধুদার বাড়ি দৌড়াইলাম খবরডা দেওনের লাইগ্যা।

তখনকার আমি

তারপর কী হইল স্মরণে নাই।''

আরো ঘণ্টাখানেক বাজনার জগতের বিবিধ ইতিহাস শুনে আমরা যন্ত্রের অর্ডার দিয়ে বিদায় নিলাম। দাম পড়বে একশো পঁচাত্তর টাকা। এখন এই কাঠে এইরকম সরোদ করাতে গেলে অন্তত কুড়ি হাজার টাকা উড়ে যাবে। ক্রমশ সোনার বর্ণ একটি বর্মা সেগুনের বিশাল টুকরোর থেকে বাটালির ঘা খেয়ে খেয়ে আমার সরোদ নিজমূর্তি ধারণ করতে লাগল। আমি তীর্থের কাকের মতো মধ্যে মধ্যেই সেখানে গিয়ে বসে থাকতাম।

নতুন যন্ত্র হাতে পেয়ে তেড়েফুঁড়ে রেয়াজ শুরু হল। একটু-আধটু এখানে-ওখানে বাজানো, কম্পিটিশনে নাম দেওয়া ইত্যাদিও আরম্ভ হল। প্রথম কম্পিটিশন শিবপুরে। তখন শিবপুর দুটি কারণে প্রসিদ্ধ ছিল—এক: ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুই: গানবাজনা। ওখানে বহু সংগীতজ্ঞের বাস ছিল, তার মধ্যে গায়ক রথীন চট্টোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলেছি। লোকে বলত—গাইয়ে বাজিয়ে সুর, তিনে মিলে শিবপুর।

শিবপুরের কম্পিটিশনের কথা মনে থাকবে চিরকাল। সভাপতি করে আনা হয়েছিল হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে, তাঁর নাম কুমার অধিক্রম মজুমদার। ভদ্রলোক অত্যন্ত মিলিটারি মেজাজের মানুষ ছিলেন এবং রেখে-ঢেকে কথা বলতে একদমই জানতেন না। সভাপতির ভাষণ শুনে তো সভাস্থ সকলের চক্ষুস্থির!

''দেখুন মশাইরা, আমি গানবাজনার কিছুই বুঝি না। তবে এইটুকু বেশ বুঝতে পারছি যে, এই ধরনের গানবাজনা করে আপনাদের ছেলেগুলো এক্কেবারে মেয়েমানুষ হয়ে যাচ্ছে। কী সব নেতিয়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে গান! আপনাদের হিন্দুস্তানি গানেরও বলিহারি, কী তার ভাষা, কী তার ভাব! বিরহের আগুনে প্রাণ ঝলসাচ্ছে, নায়িকার হৃদয়ে সর্বক্ষণ প্যালপিটেশান! চুপিসাড়ে যে অভিসারে বেরোবেন তার জো নেই, কারণ এদিকে খাণ্ডারনি ননদ আর ওদিকে দজ্জাল শাশুড়ি পাহারায় আছেন। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে, স্যাঁতস্যাঁতে বৃষ্টিতে যদি-বা কোনোমতে কেটে পড়া গেল, তো কদমতলায় বা কুঞ্জবনে প্রাণনাথের টিকির দেখা নেই—হয় দেরি দেখে সরে পড়েছেন, নয় অন্য মেয়েমানুষ নিয়ে আর কোথাও ইয়ারকি মারতে গেছেন। বলুন মশাইরা, এই কি গানের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত? এইসব গানে ছেলেমেয়েগুলোর মাথার ঘিলু গেঁজিয়ে উঠবে না? লাঠি খেলা, হা-ডু-ডু, ব্রতচারী, কুস্তি—এসব চুলোয় গেল, কেবল ওই ন্যাকা-ন্যাকা গান! বন্দুক, কামান, রাইফেল, লড়াই—এসব বিষয়ে তো একটাও গান শুনি না? আপনারা লাঠি, সড়কি, বল্লম, রণপা—এসবের গানের কম্পিটিশন করতে পারেন না?''

এরপরে প্রাইজ দেওয়া আরম্ভ হবে, কুমার অধিক্রমই প্রাইজ দেবেন। আমার পালা যখন এল, ঘোষক মাইক্রোফোনে হাঁক ছাড়লেন—'এবারে সরোদ... বুদ্ধদেব বসু।' পৈতৃক পদবিটার এরকম আকস্মিক অন্তর্ধানে চমকে উঠলাম। এগোব কি না ভাবছি, এমন সময় সামনের সারিতে উপবিষ্ট আমার পরিচিত একজন প্রবীণ উচ্চৈঃস্বরে সংশোধন করে দিলেন, 'বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত... বসু নয়... ও-লাইনে এখনো গোঁফ গজায়নি।'' যাঁর নামের অবতারণা হল তিনি আমার পিতৃবন্ধু, লেখক বুদ্ধদেব বসু, বাংলা সাহিত্যের আকাশে এবং বিদগ্ধ সমাজের মনে তখন দেদীপ্যমান। এরপরেও বহুবার নিজের অজান্তে আমাকে তিনি এইরকম বিড়ম্বনায় ফেলেছেন। সেকালে 'বুদ্ধদেব' বললেই অনিবার্যভাবে লোকের মনে এবং জিভের ডগায় 'বসু'র আবির্ভাব হত। আমার ৪০/৪৫ বছর বয়সে তিনি যখন রঙ্গমঞ্চ

খালি করে চলে গেলেন, তখনো কিন্তু আমার রেহাই মিলল না। আরো বেশ কয়েকজন বড়ো বড়ো ডাকসাইটে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে আমার সারাজীবনটাই কাটল সমুদ্রগামী জাহাজের ঢেউয়ে ডিঙি নৌকোর মতো খাবি খেতে খেতে।

এই খাবি খাওয়ার অনেক ঘটনার আরো-একটা বলে আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাব। কোনো একটি বড়োসড় নামজাদা ইলেকট্রনিক্সের দোকানে গেছিলাম খানকতক ক্যাসেট কিনতে। চারিদিকে ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, টু-ইন-ওয়ান, টিভির ছড়াছড়ি। কেনাকাটা হয়ে গেলে ক্যাশমেমো লেখার সময়ে নিজের নামটা যেই বলেছি, সেলসম্যানটির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, "ও, আপনিই স্যার বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত? বসুন স্যার, বসুন। ওরে, চা নিয়ে আয়, দ্যাখ কে এসেছেন, আমাদের কী সৌভাগ্য।" মনের আনন্দে তারিয়ে তারিয়ে চা এবং খাতির গিলছি, এই সময়ে পাশে চলতে-থাকা একটি টিভির পর্দায় ভেসে উঠল—'বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সঙ্গে কিছুক্ষণ'। সেলসম্যান বললেন, "স্যার, আপনার ইন্টারভিউ হচ্ছে, দেখুন, কবে এটা দিয়েছিলেন?"

টিভির চারধারে আরো কয়েকজন দোকানের কর্মচারী তখন ঘিরে দাঁড়িয়েছে। যে-মুখটি ভেসে উঠল সেটির মালিক আমার থেকে বয়সে ছোটো হলেও কাজকর্মে এবং খ্যাতিতে অনেক বড়ো, পৃথিবীবিখ্যাত সিনেমা পরিচালক, কবি, লেখক, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।

দোকানের সকলের মুখের চেহারা তখন পালটাতে-পালটাতে বিস্ময় এবং বিরক্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে—যেন আমি কোনো বিয়েবাড়িতে রবাহুত হয়ে খেতে গিয়ে ধরা পড়েছি। আমি ক্যাসেট এবং ক্যাশমেমো ছোঁ মেরে নিয়ে সেখান থেকে পিঠটান।

যাই হোক, শিবপুরের ঘোষক আবার হাঁক দিলেন, 'বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত'। নামবিভ্রাটে যে-ধাক্কাটা খেয়েছিলাম, তার থেকেও আরো অনেক বড়ো ধাক্কা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল জানতাম না। স্টেজে গিয়ে কুমার অধিক্রমকে নমস্কার করতেই আমায় দেখে তিনি মাইক্রোফোনের সামনেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে! তুমি আমাদের প্রফুল্লবাবুর ছেলে না? তুমিও শেষকালে এদের দলে এসে জুটেছ? যাই হোক—এই নাও?"

এরকম পুরস্কার গ্রহণ আমার জীবনে আর দ্বিতীয়বার হয়েছে বলে মনে করতে পারি না।

এই ঘটনার আমেজটা কাটতে-না-কাটতেই কুমার অধিক্রম আর-একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটালেন। অকস্মাৎ হাওড়া স্টেশনে আবির্ভূত হয়ে বেশ কিছু বিনা টিকিটের যাত্রীকে পাকড়াও করে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই নিলডাউন, কান-ধরে ওঠ-বোস ইত্যাদি করালেন, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী। চারিদিকে রইরই পড়ে গেল।

আজকালকার দুনিয়া থেকে কুমার অধিক্রমেরা বরাবরের জন্য বিদায় নিয়েছেন। থাকলেও আজ এইরকম কাণ্ড করতে পারতেন কি না সন্দেহ, হয়তো গণধোলাই খেয়ে যেতেন নিজেরাই। তাঁদের ভাগ্য ভালো বর্তমান কালটা তাঁদের চোখে দেখে যেতে হল না।

স প্ত ম প রি চ্ছে দ
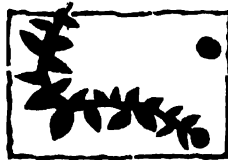
রাধুবাবু-জ্ঞানবাবু

শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটে চারটে হবে। বাবা হাফ-ডে অফিস করে এসে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করছেন, এমন সময় সদর দরজার বাইরে একটা আওয়াজ হল, 'ত্‌ড়াং ত্‌ড়াং'। দরজা বন্ধ, তাই বুঝতে পারলাম না আওয়াজ ঠিক দরজার বাইরে, না রাস্তা থেকে আসছে। তবে এটা যে চামড়ার বাদ্যের আওয়াজ সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মধ্যে মধ্যে একটা ঢোলওয়ালা রাস্তা দিয়ে যেত, কিন্তু তার ঢোলের আওয়াজটা তো ঠিক এরকম নয়।

আবার শব্দ হল 'ত্‌ড়াং ত্‌ড়াং'। বাবা ঘুম ভেঙে বিরক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে"? উত্তর এল, 'ত্‌ড়াং ত্‌ড়াং'। তারপর মোটা চাপা-গলায় শোনা গেল, "প্রফুল্লবাবু স্যার। আমি জ্ঞানপ্রকাশ স্যার। কলিংবেলটা খুঁজে পাচ্ছি না!"

"কী কাণ্ড!" বলতে বলতে বাবা দরজা খুলে দেখেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে মাটিতে তবলা বাঁয়া রাখা। আর একবার উবু হয়ে তবলায় ওই আওয়াজটা করলেন।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বহুরঙে-সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের একটা দিক ছিল তাঁর wit (কথাটার যোগ্য বাংলা প্রতিশব্দ অদ্যাবধি পাইনি), যার নানারকম আচমকা এবং অচিন্ত্যনীয় প্রকাশে আমরা হকচকিয়ে যেতাম, এবং যার জন্য তাঁর সঙ্গে আমার গুরুদেবের ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। দুজনেরই চিন্তাধারা এবং কথাবার্তা যে অকস্মাৎ কোনদিকে বাঁক নেবে কেউ কখনো ভাবতে পারত না। বাবা বলতেন, এর সঙ্গে একমাত্র একটা জিনিসেরই তুলনা চলে— আগুন ধরিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া ছুঁচোবাজি। সে যে হঠাৎ কোনদিকে ঘুরবে, ডাইনে না বাঁয়ে, সামনে না পিছনে অথবা স্যাঁৎ করে দর্শকের ধুতির মধ্যে

সেঁধিয়ে যাবে কি না, কেউ বলতে পারত না। এখানে বলে রাখি, জ্ঞানবাবু পুজোর সময় প্রচুর বাজি বানাতেন—তুবড়ি, চরকি, রংমশাল এবং বলা বাহুল্য, ছুঁচোবাজি। ওঁর তৈরি ছুঁচোবাজির দম এবং আকস্মিক দিকফেরতার তুলনা ছিল না। আমার গুরুদেব ওঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'বেঙ্গলস্ নাম্বার ওয়ান ছুঁচোবাজিst'। বস্তুত ওঁর wit এবং ছুঁচোবাজির উৎকর্ষ—এ দুটির কোনটা থেকে কোনটার উদ্ভব বলা মুস্কিল।

সেদিন সন্ধ্যায় বিলায়েত খাঁ সাহেব আমাদেব বাড়িতে সেতার বাজাবেন, জ্ঞানবাবু তবলা সংগত করবেন। কয়েক ঘণ্টা আগেই এসে গেছেন আড্ডা জমাবার জন্য। অল্পক্ষণ পরেই গুরুজি, অনিলদা এবং মোহনদা (মোহনলাল মুখার্জি, গুরুজির একজন প্রবীণ ছাত্র) এসে উপস্থিত। ওঁরা সকলে মিলে পরামর্শ করছেন একটা সংগীতচক্র করবার জন্য। তার নাম এখনো ঠিক হয়নি। প্রথম অধিবেশন আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের বাজনা দিয়ে ফার্ন বোডে হয়েছিল। আজ দ্বিতীয় অধিবেশন।

বিলায়েত খাঁ সাহেবের বযস তখন বাইশ-তেইশ হবে। অল্প বয়সে বাবা এনায়েত খাঁ সাহেবেব দেহান্ত হলে তাঁর শুভার্থীবা কিছু চিন্তিত ছিলেন ওঁর তালিম এবং বিকাশ কীভাবে হবে সেই কথা ভেবে। তাঁর মায়েব অভিভাবকত্বে এবং মাতুলবংশের তালিমে বেড়ে উঠে তিনি সকলের দুশ্চিন্তা দূব কবে একেবারে ব্যাঘ্রশাবক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ওঁর একটিমাত্র বাজনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ইতিমধ্যে—সেটি মেগাফোনের একটি টোড়িব রেকর্ড, যার শেষে উনি নিজেব নাম ঘোষণা করেছিলেন—"বিলায়েত খাঁ, সন অফ এনায়েত খাঁ অফ গৌরীপুর" বলে। বছর দশ-বারো বয়সের বাজনা। আজ আবার তাঁর দর্শন পেলাম।

তখন বিলায়েত খাঁ-র চেহারা যা ছিল, সেই চেহারায় আজ যদি তাঁকে দেখতাম তা হলে চিনতেই পারতাম না। ছিপছিপে তলোয়ারের মতো শরীর, সেতারের ওপর বিক্রম

যৌবনে বিলায়েত খাঁ সাহেব

জ্ঞানবাবু

এবং বিদ্যুৎকে লজ্জা দেবার মতো তানের গতি কেবল একটাই কথা মনে করিয়ে দেয়— চিতা! প্রাণীতত্ত্ববিদদের মতে, ব্যাঘ্রপ্রজাতির মধ্যে সবথেকে দ্রুতগামী বাঘ এই চিতা, ঘণ্টায় ৮০/৯০ মাইল দৌড়োতে পারে। রয়্যাল বেঙ্গল আয়তনে বড়ো হলেও এত ক্ষিপ্র নয়। যতদূর মনে পড়ে উনি একটা নতুন রাগ শুনিয়েছিলেন, 'গৌরীমঞ্জরী'। রাগটা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং তার গতিবিধি খুবই বৈচিত্রপূর্ণ। তারপরে কী বাজিয়েছিলেন মনে নেই।

কিন্তু এই বাজনার সূত্র ধরে তাঁর সঙ্গে আমাদের অল্পদিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতা দানা বেঁধে উঠল, বিশেষ করে যখন আমার বাবার কাছে তাঁর বাবা এনায়েৎ খাঁ সাহেবের বিষয়ে এমন সময়ের কথাবার্তা শুনলেন যে-সময়ে সবে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন কি হননি। বাবা তাঁকে নিজের সেই হিন্দু হোস্টেলের কাহিনি শুনিয়েছিলেন, যখন এনায়েত খাঁ সাহেবের বাজনা শুনতে গিয়ে সময়মতো হোস্টেলে ফিরতে পারেননি বলে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রায় বিতাড়িত হচ্ছিলেন। তখনকার দিনের সংগীতজ্ঞরা সত্যিকারেব সমঝদার শ্রোতাকে নিজেদের খুবই মূল্যবান সম্পত্তি বলে মনে করতেন। গানবাজনার আসরে দেখলেই সামনে এসে বসবার অনুরোধ জানাতেন, এবং বিলায়েত খাঁ সাহেবেরও সেই সংস্কার পুরোমাত্রায় ছিল। টাকাকড়ির জন্য সব পেশাদার সংগীতজ্ঞই গানবাজনা করেন। কিন্তু একহাতে টাকার থলি, আরেক হাতে পপকর্নের প্যাকেটশুদ্ধ সামনের সারির সোফায় বপু-এলিয়ে-দেওয়া শ্রোতার থেকে এখনো অনেকের কাছেই সত্যিকারের বিদগ্ধ শ্রোতা একান্তভাবেই কাম্য, কারণ তাঁদের কণ্ঠ বা যন্ত্র হতে উৎসারিত সংগীত ও তার বক্তব্য এঁদেরই মনের গভীরে ঢুকতে পারে। সেটাই সংগীতজ্ঞের পরম প্রাপ্তি।

বিলায়েত খাঁ সাহেব খুবই ভালো গান করতে পারতেন এবং সেটা সেই অল্প বয়স থেকেই। যন্ত্রীদের গান শিখতেই হয়, কিন্তু ওঁর মতন দক্ষ গাইয়ে-যন্ত্রী মেলা ভার। আমাদের বাড়িতে বৈকালিক আড্ডায় উনি দু-একবার এসেছেন এবং গান গেয়েছেন, খেয়াল ঠুংরি নয়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের রচিত রাগপ্রধান বাংলা গান! কথা ও সুরের অসাধারণ সমন্বয়ে এবং সাংগীতিক কল্পনার দৌড়ে এ-গানগুলি তৎকালীন সংগীতজ্ঞদের বাস্তবিকই আলোড়িত করে তুলেছিল। জ্ঞানবাবু চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর এ-গানগুলি চিরকালের জন্য রয়ে গেছে। স্বয়ং জ্ঞানবাবু মধ্যে-মধ্যেই গান করতেন সকলের অনুরোধে এবং সে-গান শুনে একটাই কথা মনে হত, ওঁর কণ্ঠ এবং ওঁর গান made for each other। যথারীতি রেকর্ড করবার যন্ত্রপাতি তখন আমার নাগালের বহুদূরে। কাজেই এইসব মণিমুক্তোগুলি হারিয়ে গেল চিরকালের মতো, যা ধরে রাখা সম্ভব হলে পরবর্তী প্রজন্মের কত কী যে শেখার থাকত তার ইয়ত্তা নেই। গানের গল্প, গাইয়ে-বাজিয়েদের গল্প, তাঁদের বিবিধ কাণ্ডকারখানা এবং মধ্যে-মধ্যে একে-অপরকে ঘোল খাওয়ানোর ক্যাহিনি, গান বা বাজনার ভালো ভালো বন্দিশ (রচনা), যার যার স্টক থেকে নমুনা ঝাড়া, একজনের বন্দিশের উত্তরে আরেকজনের নিজের ঝুলি থেকে তুলনীয় বন্দিশ বার করা এবং সেগুলির আবৃত্তির সময়ে 'সম'-এ পড়বার মুখে সকলের বিপুল উল্লসিত চিৎকার! বাইরে থেকে আওয়াজ শুনে মনে হত, কয়েকজন গেঁজেল বা সিদ্ধিখোর যেন

মধ্যে-মধ্যে হইহল্লা করে উঠছে।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন জ্ঞানবাবু গুরুজিকে বললেন, "আপনার ছাত্রকে একদিন শুনব।" শুনব মানে পরীক্ষা করব। পরীক্ষা হল। জ্ঞানবাবু আমাকে কিছু বললেন না, গুরুজিকে বললেন, "ভালো করে পালিশ করুন, বোধহয় কিছু একটা দাঁড়িয়ে যাবে।" গুরুজির তৎক্ষণাৎ জবাব, "পালিশ! আরে দূর মশাই এখনো র‍্যাঁদাঘষাই শেষ হয়নি!"

অগত্যা আমাকে র‍্যাঁদা মারবার কাজ সতেজে-সবেগে অগ্রসর হতে লাগল। লয়-এ আমার হাত-পা শক্ত করবার জন্য সব ক'জন তবলিয়া এবং জ্ঞানবাবুর সঙ্গে রফা হল, আমার সঙ্গে তবলা বাজালেই যেন তাঁরা যতবার সম্ভব আমাকে আছাড় মারতে থাকেন। ঠেকা উলটো-পালটা ব্যাঁকাচোরা করার পরও আমি আমার নিজের তাল ও মাত্রা ঠিক রাখতে পারি কি না পরখ করার জন্য এই ব্যবস্থা। যেন সেই পান্তোভূতের জ্যান্ত ছানার ঝুঁটি ধরে নেড়ে দেখা, বাচ্চা কেমন চটপটে হয়েছে। প্রায়ই ভাবতাম, আমার গুরুজি আমাকে হঠাৎ-হঠাৎ জলে ফেলে দিয়ে ভুড়ভুড়ি খাইয়ে কী মজা পান! কোথায় যেন পড়েছিলাম, গ্রিসের কাছে স্পার্টা বলে একটি দেশ আছে, যেখানে মা নবজাত শিশুকে একটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে ফেলে দিতেন। গড়াতে গড়াতে উপর থেকে পাহাড়ের তলদেশ অবধি পৌঁছিয়ে তখনো যদি শিশুটি বেঁচে থাকত, তবেই সে স্পার্টার উপযুক্ত বীর সন্তান। না-হলে তার বাঁচার অধিকার ছিল না। কিন্তু এসব ব্যবস্থা গ্রিস-রোম-স্পার্টার তাগড়া-তাগড়া মানুষছানার ওপরে প্রযোজ্য, ন্যাড়বেড়ে হাত-পা, পেট ডিগডিগে বাঙালির বাচ্চার ওপরে কেন? দু-চার হাত গড়াতে গড়াতেই সে তো টেঁসে যাবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা?

বাচ্চার হাত-পা কিন্তু খুব একটা শক্ত হবার লক্ষণ দেখা গেল না। কিছুদিন বাদে জ্ঞানবাবুর বাড়িতে আমার একটা রেকর্ডিং হল। জ্ঞানবাবুদের ডালহৌসি স্কোয়ারে বিশাল দোকান, রেডিও সাপ্লাই স্টোর্স, রেডিও এবং রেকর্ডিং-এর যন্ত্রপাতির আড়ত। নতুন নতুন রেকর্ডিং-এর যন্ত্রপাতি আমদানি হলেই তার দু-একটা তাঁদের বাড়িতে আসত পরীক্ষা করবার জন্য। একদিন একটা নতুন যন্ত্র এল, যাতে ঠিক গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো চাকতিতে পিনের বদলে হিরের স্টাইলাস দিয়ে দাগ কেটে সরাসরি (পজিটিভ) রেকর্ডিং হয়, নেগেটিভের প্রয়োজন হয় না। ততদিনে আমি জ্ঞানবাবুর পঁচিশ নম্বর ডিক্সন লেনের বাড়ির অন্তঃপুরে ঢুকে গেছি, তাঁর বিরাট যৌথ পরিবারে ভাইপো-ভাইঝি, ভাগনে-ভাগনিদের ঝাঁকে মিশে গেছি। বাড়িতে যারা গানবাজনা করত (বিশেষত অসাধারণ সুকণ্ঠী বাণীদি, জ্ঞানবাবুর ভাগনি), তাদের রেকর্ডিং হতে থাকল। জ্ঞানবাবু একদিন আমাকেও বসিয়ে দিলেন। কিন্তু হায় মা কালী! আমার সঙ্গে তবলা নিয়ে উনি স্বয়ং বসে পড়লেন। আমার করুণ চাউনি দেখে গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে অভয় দিলেন, ধাক্কাধুক্কি দেবেন না।

সোয়া তিন মিনিটের মামলা। দম বন্ধ করে প্রায় পেরিয়ে এসেছি, শেষের দিকটা একটু কায়দা করে নাচ দেখিয়ে থামব, হঠাৎ পায়ের তলায় ঠেকার জমিটাও কেমন যেন নেচে উঠল। আছড়ে পড়লাম।

(দাঁড়িয়ে) জ্ঞানবাবু, বাধুবাবু, বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায।
(বসে) সুবেশ চক্রবর্তী, দবিব খাঁ, বীবেন্দ্রকিশোব বাযচৌধুবী

এখানেই দুঃখেব শেষ নয। জ্ঞানবাবু বলে ফেললেন, "বেতালা হয়েছে।" রেকর্ডিংযের স্টাইলাসটি সে-কথাটিকে নিঁখুতভাবে বেকর্ড করে দাগ-কাটা শেষ করল। আব শুধু শেষই কবল না, আগের দাগেব সঙ্গে মিলিয়ে দিল। গ্রামোফোন রেকর্ড শেষ হলে স্টাইলাসটি যেমন বাববার একই দাগে ঘুরতে থাকে, সেই ব্যবস্থা আব কী! ফলে বাজনা শেষ হবার পরে বেকর্ড ঘুবে-ঘুরে ক্রমাগতই বাজতে থাকল—বেতালা হযেছে! বেতালা হয়েছে! বেতালা হয়েছে! বেতালা হয়েছে!..

বহুকাল অবধি এই মহামূল্য রেকর্ডিংটি আমি সংরক্ষণের চেষ্টা করেছিলাম। শেষ অবধি একদিন অস্পষ্ট হতে-হতে ওটিতে শুধু পিন ঘষার আওয়াজটুকুই বাকি থাকল।

তবলা এবং তালের ব্যাপারে আমাকে ক্রমাগত এইরকম নিষ্পেষণে রাখার পেছনে গুরুজির উদ্দেশ্য ছিল, আমি যেন বাজাবার সময় তাল এবং মাত্রার হিসাব নিজের মাথার মধ্যে রেখে চলি—তবলার ঠেকার আওয়াজ শুনে তবে তালের আবর্তনে কোন মাত্রায় আছি সেটা চিনতে না হয়। প্রাথমিক অবস্থায় সকলেই এই পর্যায়ে থাকেন। কিন্তু যিনি *যতটা এবং যত তাড়াতাড়ি নিজের হিসাব নিজে রাখতে শেখেন তাঁর ততই মঙ্গল,* নতুবা তবলিয়া ইচ্ছে করলে ঠেকার আওয়াজ উলটো-পালটা করে ল্যাং মেরে তাঁকে ধরাশায়ী করে দিতে পারেন।

সুতরাং প্রতিটি গাইয়ে-বাজিয়েকেই এই ক্ষমতাটা অর্জন করার যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়। এবং এই ক্ষমতার বিভিন্ন চমকপ্রদ স্তরে আমি বড়ো বড়ো সংগীতজ্ঞদের দেখেছি। আমার গুরুদেব গল্প করতে করতে গৎ এবং তান বাজাতে পারতেন। তালের আবর্তনের যে-কোনো মাত্রায় একটা তানকে থামিয়ে দিয়ে, পুরো এক আবর্তন চুপ করে থেকে ঠিক পরবর্তী মাত্রায় তানটা আবার ধরতে পারতেন। জ্ঞানবাবু তবলাতেও এই কাণ্ড করতে পারতেন অবলীলাক্রমে। তাঁরই বাড়িতে কিছুদিন অতিথি হয়েছিলেন রামপুরের সুপ্রসিদ্ধ বীণকার উজির খাঁ সাহেবের ছোটোভাই সগির খাঁ। তিনি বিলম্বিত খেয়াল ধরে সমের পর গাইতে গাইতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন যাতে জ্ঞানবাবুর তবলার ঠেকা কানে না যায় এবং বারান্দায় একবার গাইতে গাইতে ঘুরে এসে পরের বারের 'সম'টা ঠিক ফেললেন দরজার বাইরে হাজির হয়ে। তারপর জ্ঞানবাবুকে বললেন, সমের আওয়াজটা করবার পর টিপে টিপে আঙুল দিয়ে ঠেকার হিসাব রাখতে যাতে তবলার কোনো আওয়াজ না-হয় এবং একবারে পরের সমটাতে যেন সজোরে আওয়াজ করেন। তারপর যথারীতি নির্ভুলভাবে উলটোদিকে তাকিয়ে গানের মুখড়া ফের সমে এনে ফেললেন। নিজে নিজে তবলা বাজিয়ে নিজের গানের সঙ্গে সংগত করবার বহু দৃষ্টান্ত আছে। কেরামৎউল্লা খাঁ সাহেবের বাবা ওস্তাদ মসিদ খাঁ পাঁচটা বিভিন্ন তালের হিসাব একসঙ্গে রাখতে পারতেন। এক হাতে তিনতালের তান দিচ্ছেন, একপায়ে ধামার, এক পায়ে পঞ্চম সওয়ারি, মুখে আড়াচৌতালা! মেধা এবং অনুশীলন কতটা প্রবল হলে এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়।

মধ্যে মধ্যেই উড স্ট্রিটের বাড়িতে গানবাজনার আসর বসত। তার প্ল্যান করা হত বৈকালিক আড্ডায়। একদিন শোনা গেল, দক্ষিণ দেশ থেকে একজন গাইয়ে এসেছেন। তিনি হিন্দুস্তানি গান করেন। ব্যাপারটা কী তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হতে লাগল। একজন বললেন, "দক্ষিণী লোক হিন্দুস্তানি গান গাইবে, এ তো সোনার পাথরবাটি!" আরেকজনের মন্তব্য, "আমি সাউথ ইন্ডিয়ান খানা এবং গানা দুটোই ট্রাই করে দেখেছি। তার 'রসম্' আমার ধাতে সয়নি।" তৃতীয় জন বললেন, "তা বটে, ওরা গান করতে করতে বাইশটা শ্রুতির কোনটা কখন ধাঁ-করে লাগিয়ে দ্যায় যে আমাদের নর্থ ইন্ডিয়ান কানটা খিঁচিয়ে ওঠে! তা ছাড়া ওদের গমকের মধ্যে বড্ড বেশি ধমক, বুক গুড়গুড় করে। রক্ষঃকুল ঘরানা কিংবা দ্রাবিড় ঘরানা আর কী!"

রাধুবাবু বললেন, "আপনারা কী ঘোরের মাথায় রিসার্চ করছেন জানি না। বলছি আমি স্বকর্ণে শুনেছি, ভদ্রলোক শুদ্ধ হিন্দুস্তানি সংগীত গান, অপূর্ব গলা, একেবারে ন্যাচারাল মিউজিশিয়ান এবং পরিণত আর্টিস্ট।"

অতএব ভদ্রলোককে ধরে আনা হল। সত্যিই অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠস্বর। গানের মধ্যে ইডলি ধোসার গন্ধের বিন্দুবিসর্গও নেই। চেহারাটিও আকর্ষণীয়। ইনিই হলেন কানন সাহেব, পঞ্চাশ বছরের ওপর যিনি আমাদের সংগীতের মঞ্চ আলো করে বিরাজ করেছেন। সুরমাধুর্য, বাচনভঙ্গি এবং পরিবেশনা তাঁর গানকে একটা একান্ত নিজস্বতা দিয়েছিল। এবং জনপ্রিয়তার এতটাই উচ্চশিখরে তিনি আরোহণ করতে পেরেছিলেন যে, একইদিনে একই সঙ্গে কলকাতায় কোথাও গোলাম আলি সাহেব গান করছেন, আরেক

জায়গায় একজন বিরাট যন্ত্রীর প্রোগ্রাম—কানন সাহেবের অনুষ্ঠানে তবুও হল-ভর্তি।

এবারে ফ্ল্যাশব্যাকের বদলে ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ড করে বছর ছয়েক বাদের পাটনাতে চলে যাই। সেখানে বিখ্যাত সংগীতবেত্তা রবীন্দ্রলাল রায় এবং তাঁর বড়ো মেয়ে মালবিকার সঙ্গে পরিচয় হয়, শুনলাম তিনি তখনই গান গেয়ে সংগীতজগতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। কিছুকাল বাদে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং তার কিছুকাল বাদেই মালবিকা কানন হয়ে যান।

সেকালে মুসলমান ওস্তাদরা অধিকাংশই থাকতেন কলাবাগান বস্তি, রাজাবাজার ইত্যাদি অঞ্চলে। আমার গুরুদেব একদিন সন্ধ্যাবেলায় কিছু টাকাকড়ি নিয়ে তাঁর ওস্তাদ মহম্মদ আমির খানকে দেবার জন্য যাচ্ছিলেন। ওই সময়ে ওখানে যাওয়া অনেকের কাছেই খুব ভয়ের ব্যাপার ছিল, কিন্তু রাধুবাবু ছিলেন ডেয়ার-ডেভিল। ওই অঞ্চলে ঢুকতেই হঠাৎ একটি গুন্ডা তাঁকে ধরল, "এ বাবুজি! কহাঁ যা রহে হো? রুখ্ যাইয়ে, আপকে সাথ দো-চার প্যার কি বাতেঁ করনা হ্যায়।" চেহারা দেখেই বুঝেছিল, রইস ঘরের ছেলে, পকেটে মালকড়ি পাওয়া যাবে।

রাধুবাবু বললেন, "ভাই, আমায় ছেড়ে দাও। আমার কাছে কিছু টাকাকড়ি আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা আমি আমার ওস্তাদ বৃদ্ধ দরিদ্র মহম্মদ আমির খানকে দিতে যাচ্ছি। বিশ্বাস না-হয় আমার সঙ্গে চলো।"

নামটা যেন মন্ত্রের মতো কাজ করল। লোকটা জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বলল, "আমার সঙ্গে চলুন. আমি নিয়ে যাচ্ছি, আমিও ওঁর শাগির্দ। আর কখনো এই সময়ে এখানে আসবেন না।"

গুরুজি পথ চলতে চলতে অবাক হয়ে ভাবছেন, এ আবার কী ধরনের শিষ্য! ওস্তাদের ঘুপচি ঘরে পৌঁছতেই তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "আরে রাধু, তুই এই সময়ে এখানে? আর আনোয়ারই বা কী করে তোকে নিয়ে এল?"

মালবিকা কানন

এ. টি. কানন সাহেব

আনোয়ার সেলাম করে বলল, "বাতাইয়ে হুজুর! ইস টাইম পে ইস মহল্লে মে আ পঁহুচা। খুদা কে শুক্‌র হ্যায় কি ম্যাঁয় উনকো পকড়া, নহি তো আজ কুছ না কুছ হো যাতা!"

রাধুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "উনিও বুঝি সরোদ শেখেন আপনার কাছে?"

"না রে বেটা না, তুই বুঝি ভাবছিস আমি শুধু সরোদেরই ওস্তাদ? তবে দ্যাখ—"

এই বলে খাঁ সাহেব হাতে একটা বড়োসড়ো গোছের রুমাল নিলেন। ঘরের কোনায় একটা লাঠি রাখা ছিল, সেইটে দেখিয়ে বললেন, "ওটা হাতে নে, আমাকে মারবার চেষ্টা কর!"

"এ আপনি কী বলছেন! ও আমার দ্বারা হবে না।"

অগত্যা ওস্তাদের ইঙ্গিতে আনোয়ার লাঠিটা তুলে নিয়ে ওস্তাদের ওপর বেধড়ক লাঠি চালাতে শুরু করল। একবার মাথায়, একবার ঘাড়ে, একবার ঊরুতে, একবার গোড়ালির দিকে, একবার বাহুর ওপরে। রাধুবাবু আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাণ্ড দেখছেন এবং নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

একটা লাঠিও খাঁ সাহেবের গায়ে পড়তে পেল না। প্রত্যেকবার দেখা গেল লাঠিটা দু-হাতে টান-করে ধরা রুমালের ওপর গিয়ে পড়ছে। যে-বৃদ্ধ প্রায় সর্বক্ষণই আফিং-এর নেশায় ঝিমোতেন, তাঁর রুমাল-ধরা হাত সাপের ছোবলের ক্ষিপ্রতায় লাঠিকে রুখে দিচ্ছে।

এরপর ওস্তাদ আনোয়ারকে দিয়ে চা-বিস্কুট আনিয়ে শিষ্যকে খাওয়ালেন। খানিকক্ষণ তালিমও হল। তারপরে বললেন, "বড়াবাবুকে বলে দিস আমি মহরমের পরে বাড়ি যাব।" বাড়ি অর্থে রাধুবাবুদের দেশের বাড়ি, রাজশাহিতে। আর 'বড়াবাবু' হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র, রাধুবাবুর বাবা।

আমির খাঁ সাহেব যখন প্রথম ওঁদের কাছে আসেন তখন রাধুবাবুর ঠাকুর্দা ললিতামোহন মৈত্র ছিলেন বড়োবাবু। তাঁর দেহান্তের পরে এই নামটা স্বাভাবিকভাবে রাধুবাবুর বাবার ওপর বর্তায়। ললিতামোহন (ললিতমোহন নয়) নামটা যদি পাঠকের একটু অস্বাভাবিক ঠেকে তাহলে বলি ওঁদের বংশে সব পুরুষ-মানুষেরই শ্রীকৃষ্ণের কোনো-না-কোনো নামে নাম ছিল, যথা ললিতামোহন, ব্রজেন্দ্রমোহন, গোপীকুলমোহন, রাধিকামোহন। একমাত্র রাধুবাবুর ছোটোভাই হাবুকাকাই এই নামকরণ-পরম্পরার বাইরে কেমন করে যেন ছিটকে বেরিয়ে যান, স্বেচ্ছায় কিনা জানি না, তাঁর নাম ছিল রবীন্দ্রমোহন মৈত্র।

ললিতামোহন ভালো পাখোয়াজ বাজাতেন এবং মহম্মদ আমির খাঁকে নিজের সঙ্গে বাজাবার জন্য জমিদারিতে এনে রেখেছিলেন। আমির খাঁ সাহেব তাঁর মুলুক দ্বারভাঙাতে অধিকাংশ সময়েই থাকতেন না, কাটাতেন বাংলাদেশে, কখনো ময়মনসিংয়ের গৌরীপুরে ব্রজেন্দ্রকিশোর বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীদের ওখানে অথবা রাজশাহিতে রাধুবাবুদের বাড়িতে। রাধুবাবুকে তিনি জন্মাতে দেখেছেন, কোলে করে ঘুরেও বেড়িয়েছেন। আর কলকাতায় যখন আসতেন, তখন কোথায় থাকতেন তা তো আগেই বলেছি।

ললিতামোহনের মৃত্যুর পরে আমির খাঁ সাহেব কিছুদিন আবার গৌরীপুরে চলে যান, সেখান থেকে আরো কয়েক জায়গায়। কোনোখানেই তাঁর মন টিকল না, তিনি আবার রাধুবাবুর বাবার কাছে এসে হাজির হলেন। ওঁকে দিয়ে কী করা যায়, বিস্তর ভেবেচিন্তে রাধুবাবুর বাবা এবং কাকা দুজনেই ওঁর কাছে সরোদ শিখতে শুরু করলেন।

হাতে-পায়ে ভীষণ দুরন্ত সাত-আট বছরের রাধুকে শাসানো হল—খবরদার, যন্ত্রের ঘরে ঢুকে যদি সরোদে হাত দিয়েছ তা হলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।

এই শাসানিটাই তো রাধুবাবুর কৌতূহল উসকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বাবা-কাকা এবং আমির খাঁ সাহেব যখন দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর নিদ্রামগ্ন, তখন চুপিসাড়ে যন্ত্রের ঘরে গিয়ে সরোদ নাড়াচাড়া শুরু হল। কাকা তখন একটা কাফির গৎ শিখছিলেন, রাধুবাবু শুনে শুনে সেটাই অপটু হাতে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

গৎটা মোটামুটি শুনলে চেনা যায়, এই অবস্থায় যখন পৌঁছেছে, তখন আমির খাঁ সাহেব আকস্মিকভাবে একদিন যন্ত্রের ঘরে উপস্থিত। ছেলে তো সরোদ ফেলে দিয়ে একলাফে ঘরের বাইরে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু আমির খাঁ সাহেব তাকে পাকড়াও করে ফেললেন। রাধুবাবু ভ্যাঁ করে কেঁদে বললেন, "আমায় ছেড়ে দিন। বাবা-কাকা জানতে পারলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবেন।"

আমির খাঁ রাধুবাবুর দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরে অনেকক্ষণ তার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সেখানে কী দেখলেন, কী বুঝলেন তিনিই জানেন। তারপরে বললেন, "সরোদ শিখবি?"

আরেক প্রস্থ লম্ফঝম্ফ, চ্যাঁচামেচি, "ওরে বাপ রে! বাবা মেরে আর আস্ত রাখবে না। আপনার পা-ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনো সরোদের ঘরে ঢুকব না।"

এইভাবেই শিশু রাধিকামোহনের জীবনে উপস্থিত হয়েছিল শিক্ষারম্ভের মহালগ্ন।

এই কলাবাগান বস্তি অঞ্চলে হিন্দুস্তানের বড়ো বড়ো গায়ক বাদকরা অনেকেই জীবনের কিছু কিছু অধ্যায় কাটিয়ে গেছেন। সারা সংগীত-জগতের প্রণম্য প্রবাদপুরুষ খলিফা বাদল খাঁ সাহেবের জীবনের একটি ঘটনার কথা বলছি। বাবা তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন এবং হিন্দু হোস্টেলে থাকেন। তরুণ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে খুবই সৌহার্দ্য ছিল। তাঁর বাড়ি একদিন গেছেন। ভীষ্মবাবুকে ফরমাইশ করে নানা গান শুনছেন, এমন সময় হঠাৎ বাদল খাঁ সাহেবের প্রবেশ। তখনই বোধহয় নব্বুই-এর কাছাকাছি বয়স হবে, জরাজীর্ণ চেহারা, ততোধিক জরাজীর্ণ বেশভূষা। ভীষ্মবাবু একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, "আরে ওস্তাদ, আপনি এই সময়ে এখানে, কী ব্যাপার?"

খাঁ সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, "বেটা, তিনদিন পেটে কিছু দানাপানি পড়েনি।" ভীষ্মবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "আমার ওস্তাদ না-খেয়ে আছেন আর আমি খবর পাইনি? পরশুদিন তো আপনার কাছে গেছিলাম, তখন তো আমায় কিছুই বললেন না?" খাঁ সাহেব বললেন, "সারি জিন্দেগি আল্লাহ্‌তালা ঔর সংগীত কো বান্দা রহা, আভি উনহোনে মুঝকো আধি রোটি ভি অগর না দেঁ তো ইস শর্ম্ কি বাত কিস্‌কো কহুঙ্গা বেটা?"

ভীষ্মবাবু আর কথা না-বাড়িয়ে লোক পাঠিয়ে তখনি খাবার আনিয়ে খাঁ সাহেবকে ভালো করে খাওয়ালেন। পরিতৃপ্ত বৃদ্ধ তখন শাগরেদকে বললেন, "আব কুছ তালিম লেওগে?" ভীষ্মবাবু তখনই হারমোনিয়াম নিয়ে তৈরি। বাবা একাগ্রচিত্তে শুনতে লাগলেন; এমন সুযোগ আর আসবে না। কিন্তু হায় হরি, খাঁ সাহেবের কণ্ঠ এতই ক্ষীণ এবং কম্পমান যে বাবা তার বিন্দুমাত্র রসগ্রহণ করতে পারলেন না, বুঝতেই পারলেন না খাঁ

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

খলিফা বাদল খাঁ

সাহেব কী গাইছেন! ভীষ্মবাবুর এতদিনের অভ্যাস, তিনি কিন্তু চটপট প্রতিটা জিনিস হারমোনিয়ামে তুলে ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠিক হুয়া হুজুর?" অধিকাংশবারই ঠিক হল, এক-আধবার বেঠিক হলে খাঁ সাহেব শুধরে দিলেন। তারপর ভীষ্মবাবুর গলায় সেই জিনিসগুলির রূপ দেখে বাবা বুঝতে পারলেন খাঁ সাহেবের বক্তব্য কী।

সন্ধে হয় হয়। খাঁ সাহেবকেও ডেরায় ফিরতে হবে, বাবাকে হিন্দু হোস্টেলে যেতে হবে। ভীষ্মবাবু সযত্নে একটি পাঁচ টাকার নোট (আজকালকাব দিনের প্রায় পাঁচশো টাকা) খাঁ সাহেবের পকেটে গুঁজে দিয়ে বললেন, "ওস্তাদ! আর যেন কখনো না শুনি যে আপনার শাগরেদ বেঁচে থাকতে আপনি না-খেয়ে আছেন। টাকা শেষ হবার আগেই আমি যেন খবর পাই; আর আমাকে এই রকম গুনাহে ফেলবেন না।"

খাঁ সাহেব আশীর্বাদ করে গুটিগুটি হাঁটতে লাগলেন। বাবারও গন্তব্যস্থল একই দিকে। বাবাও পেছন পেছন সামান্য একটু দূরত্ব রেখে চলতে থাকলেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল, ফুটপাথে বসে একটি অন্ধ মুসলমান ভিখারি আকাশের দিকে হাত তুলে আল্লাহ্‌কে তার কষ্ট এবং অনশনের কথা উচ্চৈঃস্বরে জানাচ্ছে এবং তাঁর করুণা ভিক্ষা করছে।

বাদল খাঁ সাহেব মিনিট খানেক তার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর কোনো কথা না-বলে পকেট থেকে ভীষ্মবাবুর দেওয়া পাঁচ টাকার নোটটি বার করে তার হাতে দিয়ে চলে গেলেন।

এবার আর একজন ওস্তাদের কথা বলি, যিনি থাকতেন পার্ক স্ট্রিটের একেবারে পূর্বপ্রান্তে ব্রাইট স্ট্রিট-শামসুল হুদা রোড অঞ্চলে। জরাজীর্ণ রোগা শরীর, হাতে সর্বক্ষণ জপের মালা, সারাদিন বাড়ির পাশে একটা মসজিদে পড়ে থাকতেন।

বাড়ির দশা ওস্তাদেরই মতন, তারই মধ্যে তাঁর পাঁচ ছেলে—একজন সেতারি, একজন গাইয়ে, একজন তবলিয়া, একজন সরোদীয়া আর বড়োজন মৌলবি এবং টেইলর। প্রতিবার ফতেহাদোয়াজদহমের রাত্রে ওস্তাদ চেয়েচিন্তে টাকা জোগাড় করে বহু লোককে খাওয়াতেন এবং সারারাত্তির তাঁর মহল্লায় গানবাজনা করাতেন। ভোর থেকে একটি বিশালকায় বিরিয়ানির হাঁড়ি চড়ত আশপাশের খাটা পায়খানার ধারেই। সারাদিন ঢিমে কাঠকয়লার আঁচে পরিপক্ক হত। আর বাকি মেনু পরোটা কাবাব। বাড়ির উঠোনে খানকতক মাদ্রাসার বেঞ্চি টুল পেতে তার ওপর নিমন্ত্রিতরা বসতেন। ওঁদের সম্প্রদায়ের একটি মহৎ গুণ আমি দেখেছি, যেটা আমাদের মধ্যে নেই, পরবে বা সামাজিক উৎসবে ধনী-দরিদ্রের কোনো ভেদাভেদ নেই। একই সঙ্গে পাশাপাশি নামাজ, একই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া। আমার বেশ মনে আছে—আমি বসে খাচ্ছি, আমার বাঁ-পাশে কলকাতার সবথেকে বিখ্যাত ব্যারিস্টার আলিয়া সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী, আর আমার ডান-পাশে একজন ভিখারি, যাকে খাঁ সাহেবের বাড়ি যাবার পথে ফুটপাথে দেখেছি। তাতে কারো কোনো আড়ষ্টতা নেই বিন্দুমাত্র। এটা আমাদের নিতান্তই শিক্ষণীয় বিষয়।

শৌকত আলি খাঁ সাহেবের আমার প্রতি স্নেহ-ভালবাসা এবং তাঁর বাড়ির বিরিয়ানি কাবাব পরোটা বাস্তবিকই তুলনাহীন ছিল। আমাকে এবং তাঁর 'বহু মা'কে নিজের বিছানার ওপরে বসিয়েও তিনি খাইয়েছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের বাকি দিকটার স্মৃতি তেমন আনন্দঘন নয়। উনি গুরুজির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং গুরুজি তাঁকে সময় সুযোগ পেলেই আমাকে ধরে 'ছ্যাচ্‌বার' কথা বলে রেখেছিলেন যথারীতি। খাঁ সাহেব বন্ধুর এই অনুরোধ অত্যন্ত ঐকান্তিকতার সঙ্গে নিষ্ঠাভরে পালন করতেন। যখন তখন পার্ক সার্কাস থেকে সাদার্ন অ্যাভিনিউ অবধি পায়ে হেঁটে আমার বাড়ি উপস্থিত হতেন। বলতেন, "বুধুবাবু! সরোদ লে আও।" আমি প্রণাম করলে আমার মাথার ওপরে জপের মালা ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে 'দোয়া' পড়তেন এবং প্রায়শই অস্ফুটস্বরে কী যেন একটা বলতেন, সেটা কানে আমার এইভাবে পৌঁছোত—"আল্লাহ্‌কা শূকর হ্যায় তুম...(বাকি কথা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট এবং অবোধ্য)...শও বরষ জিও।" প্রথমবার পিলে চমকে উঠেছিল, কিন্তু নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলেছিলাম, যিনি আমাকে এত ভালোবাসেন, স্নেহ করেন, তাঁর কথায় আমি আল্লার শুয়োর হয়েও একশো বছর বাঁচতে রাজি আছি।

পরে, বহুবার এই একই কথা শুনতে শুনতে এবং দৈবক্রমে একবার একজন উর্দুভাষী ভদ্রলোকের সাহায্যে বাকি কথাটা বুঝতে পারলাম। "আল্লাহ্‌কা শুক্‌র হ্যায় তুম য্যায়সা শরিফ ঔর ইমানদার লড়কা ইস দুনিয়ে মে আয়া, শও বরষ জিও।" অর্থাৎ আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীর চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করেছি। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ (শুক্‌র)।

যাই হোক, সরোদ নিয়ে তাঁর সঙ্গে বসবার পর যে-কাণ্ডটা হত সেটা এখনো মনে করলে কলমের কালি শুকিয়ে যায়। খাঁ সাহেব অত্যন্ত সুপণ্ডিত এবং লয়দার তবলিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁর হাতের আওয়াজ ছিল ভীষণ কড়া এবং বোলগুলির নকশা ও প্যাঁচ ঝানু-ঝানু বাজিয়েরও মাথা গুলিয়ে দেবার মতো। এর ফলে কোনো যন্ত্রী বা গাইয়ে ওঁকে

সংগতীয়া হিসাবে নিতে চাইতেন না, একক বাজনা বাজিয়েই তাঁর জীবন কাটত কিন্তু সে-বাজনা শুনে স্বয়ং আহমদ্‌জান থেরাকুয়া খাঁ সাহেবও তাঁব ভূয়সী প্রশংসা করতেন। কিন্তু সংগত? উনি বাজনা শুরু করলেই মনে হত মাথার উপর একগাড়ি ইট কেউ ফেলে দিল, তার মধ্যে মাথা ঠিক রেখে সোজা হয়ে পথ চলতে হবে। মুহূর্তের মধ্যে আমি ধরাশায়ী। সমস্ত ঘটনাটাকে সব থেকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে কবিগু(ববীন্দ্রনাথের একটি ছোট্ট ছড়া, মাত্র পাঁচটি শব্দের, যেটিকে উদ্ধৃত কববাব লোভ সামলাতে পাবছি না .

ডান্ডা

ধপাৎ

ঠান্ডা

কম্পাউন্ড ফ্রাকচার।

ঠ্যাং-ভাঙা আমাকে পবম স্নেহে মাটির থেকে উঠিয়ে আবার দু-পায়ে দাঁড় কবিয়ে দিতে দিতে খাঁ সাহেব বলতেন, "ফির চলো বুধুবাবু, ফিব চলো, আভি ঠিক হো জায়গা।"

দিনেব পর দিন, বছবের পর বছব, খাঁ সাহেব এইভাবে বুনো মোষ তাড়িয়েছেন, কোনোদিনই পারিশ্রমিকেব কথা মুখ ফুটে বলা দূবে থাকুক চিন্তাও করেননি। গানবাজনার আসরে নিঃশব্দে এসে এক কোণায বসতেন। সামনে যাবার জন্য অন্যান্য উপবিষ্ট শ্রোতাব হাত-পা মাড়িয়ে এগোতেন না। কেউ তাঁকে লক্ষ করল কি না, সমাদর করল কি না, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, হাতে সর্বক্ষণ জপের মালা ঘুরছে।

যেমন নিঃশব্দে খাঁ সাহেব সংগীতের সেবা করেছেন, অসংখ্য উঠতি গাইয়ে বাজিয়েদের পরিচর্যা করেছেন, তেমনই নিঃশব্দে একদিন চলে গেলেন। জানতেও পারলাম না।

শৌকত আলি খাঁ

আজ যখন কার্গিলেব বৃত্তান্ত পড়তে পড়তে দেখি, এই সম্প্রদায়েরই কিছু লোক আমাদের ছেলেদের জীবন্ত অবস্থায় চোখ উপড়ে নিয়েছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলেছে, তখন তা বিশ্বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধর্মোন্মাদনা মানুষকে কতখানি হিংস্র করে দিতে পারে? আমাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই এই রকম লোক আছে!

আমাদের বাড়িতে অন্যান্য বাড়ির মতোই একটা পুজোর ঘর ছিল। সেটা ছিল আমার মায়ের এলাকা। মা যখন ছবি হয়ে সেই পুজোর ঘরেই অধিষ্ঠিতা
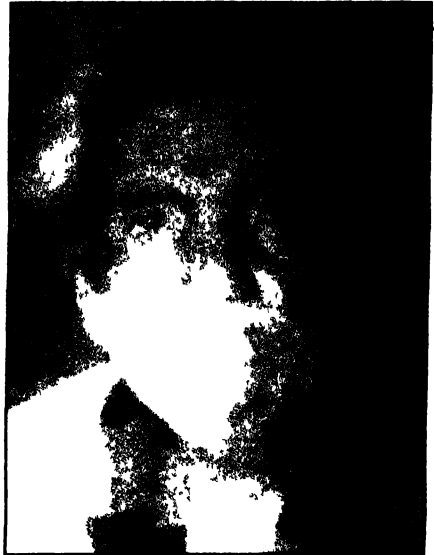
হলেন তখন পুজোর ঘরটা আমার স্ত্রীর হয়ে গেল। আমার নিজস্ব কোনো পুজোর ঘর নেই, কিন্তু মনের মধ্যে একটা পুজোর ঘর আমি সাজিয়েছি—সেখানে আমার বাবা-মা, ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, মাতামহ-মাতামহী, বাজনার গুরুদেব এবং দীক্ষামন্ত্রের গুরুদেব, পড়াশুনোর মাস্টারমশাইরা, এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবির মধ্যে শৌকত আলি খাঁ সাহেবের ছবিটাও জ্বলজ্বল করছে।

নানা কারণেই বারো নম্বর উড স্ট্রিটের বাড়িটির কথা বারবার মনে পড়ে। এখান থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম। বাড়ির কম্পাউন্ডের এক কোণায় একটি গ্যারেজ, গাড়ি না-থাকাতে সেটি আমার পড়বার ঘর এবং বাজনা রেয়াজ করবার ঘর দুই-ই ছিল। একপাশে একটি জানলা, সেটি রাস্তার ওপরে খোলে, এবং খুললেই দেখা যায় রাস্তার উলটোদিকে একটি বড়ো দোতলা বাড়ির একটি জানলা, যেটি আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোজ সন্ধেবেলা পড়তে বসার পরেই তাকিয়ে দেখতাম একটি বিদেশি কিশোরী মেয়ে জানালাটা খুলে দিত এবং তারপরই তা দিয়ে ভেসে আসত কিছু বিদেশি অর্কেস্ট্রা। তিন-চারটির বেশি রেকর্ড ছিল না। ঘুরেফিরে সেগুলিই বাজত, ফলে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অনেক পরে সুরগুলির এবং তাদের স্রষ্টাদের নাম জানতে পারি।

পড়তে বসে ঘনঘন সেই জানালার দিকে তাকাতাম, কখন সেটি খোলে, আমার সেই পরীকে একবার দেখতে পাই এবং অর্কেস্ট্রা শুনতে পাই। চটকা ভাঙত নাকে নস্যি-বোঝাই সুধীর মাস্টারমশাইয়ের মৃদু তিরস্কারে, "মাঁথাটা এবার স্তাইন্টি ডিগ্রি ঘুরিয়ে চোখটা একটু অ্যালজেব্রার দিকে আঁড়লে ভালো হয়।" সুধীরবাবুকে আমি স্বভাবতই সর্বদা মাস্টারমশাই বলেই ডেকেছি, পদবিটা হারিয়ে গিয়েছিল। খুলনাতে ক্লাস টেন-এ পড়বার সময় আমি প্রথম তাঁর কবলে পড়ি। ভদ্রলোক আমার ঘুণধরা মস্তিষ্কে অঙ্ক ঢোকাবার ব্যাপারে একেবারে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। পার্টিশনের পর খুলনা থেকে কলকাতায় চলে এসে ভেবেছিলাম তাঁর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচলাম। কিন্তু মুক্তি পাইনি, বাবার মতো তিনিও গভর্নমেন্টের চাকরি করতেন এবং দেশভাগের পর হিন্দুস্তানে বদলি নিয়েছিলেন। তখন আমার শিয়রে-শমন ম্যাট্রিক পরীক্ষা। ভালো মাস্টার পাওয়া যাচ্ছে না। এই সময়ে তিনি হঠাৎ একদিন ছাতাবগলে উপস্থিত হলেন। বাবা-মা তো আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। আমার পেষাই চলতে লাগল, প্রত্যহ, রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত। জীবনে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেননি, ও-রাস্তাটা নস্যিতে কবেই চিরকালের মতো বুজে গিয়েছিল। অঙ্কেতে জবরদস্ত হলেও তাঁর কণ্ঠস্বর এবং বলবার ধরন আমার প্রগাঢ় সুষুপ্তির উদ্রেক করত। এবং তিনি আমার সেই ঢুলন্ত চেতনাকে ধাক্কিয়ে সজাগ করবার জন্য কথার মধ্যে মধ্যেই বই, ছাতা, পাথরের পেপারওয়েট ইত্যাদি পড়ার টেবিলটার ওপর সশব্দে আছড়াতেন। সুতরাং রাত্রের দিকে কেউ গ্যারেজ ঘরের বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে যে শব্দ-পরম্পরা তার কানে আসত তার ধরনটা অনেকটা এরকম,

"তোঁবাকে লক্ষবার বললেও তোঁবার বঁন্ডে থাকবে ন্ডা, কোয়াড্রাটিক ইক্যুয়েশন্ডের ফরবুঁলা হচ্ছে (ধড়াম!) বাঁইন্ডাস বি প্লাস বাঁইন্ডাস রুটওভার বি স্কোয়্যার (ছ্যাড়াৎ, ছ্যাড়া ছ্যাৎ!) বাঁইন্ডাস ফোর এসি বাই টোয়াইস এ (দুড়ুদ্দুম!), বুঝলে?

খিঁচড়ে-ওঠা মেজাজটার প্রতিবাদের নানা রাস্তা ছিল, যথা ছাতা লুকিয়ে রাখা বা একপাটি চপ্পল লুকিয়ে রাখা অথবা পাথরের মতন চোখ করে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকা। তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার। একদিন খালি পায়েই হেঁটে রওনা দিলেন, গেট অবধি পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই আমি বাপ রে, মা রে বলে লুকোনো জুতো বের করে পায়ে পরিয়ে দিয়ে এলাম, উনি যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে চলে গেলেন।

শেষকালে একদিন বিস্তর ভেবেচিন্তে মোক্ষম দাওয়াই প্রয়োগ করলাম। নস্যির ডিবেটা লুকিয়ে ফেললাম, ভাবলাম এইবার ওঁকে কাবু করা গেছে, কিন্তু হায় রে ইডিয়ট আমি! লুকিয়ে রাখার আর জায়গা পেলাম না, রাখলাম মায়ের ড্রেসিং টেবিলের শিশিপত্তরের জঙ্গলে। মাস্টারমশাইয়ের সাধ্য কী যে ওখানকার কথা ভাবেন। উনি খানিকক্ষণ খুঁজে না-পেয়ে চলে গেলেন। ভাবতেও পারিনি যে মা সেটিকে একনজরে দেখেই ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করে ফেলবেন।

মা আমায় কাছে ডাকলেন। তারপর কোনো কথা নয়, একেবারে অ্যাকশন। গালে একটি বিরাশিসিক্কার থাপ্পড়। অবশ্য চড়ের আওয়াজটা বাদে, তাঁর বক্তব্য এবং আমার সেটি হৃদয়ঙ্গম করা—এ দুটোই একেবারে নিঃশব্দে সম্পন্ন হল।

আমি মায়ের কাছে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সময় অবধি মার খেয়েছি, শারীরিক ক্লেশ কিছুটা হলেও মনে তার জন্য কোনো কষ্ট ছিল না। বাস্তবিক মায়ের মারে মানসিক এবং চারিত্রিক শুদ্ধিই শুধু হয় না, শরীরেরও নানাবিধ উপকার হয়। কানমলায় এবং চড়ে মুখে-গালে প্রচুর রক্ত সঞ্চালন হয়ে থাকে। চুল-টানাতে মস্তিষ্কে। হায়, মাগো, যতদিন তুমি নিয়মিত আমার চুল টেনেছ, চুল ধরে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে দেওয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে ঠকাঠক মাথা ঠুকে দিয়েছ, ততদিন আমার চুলের স্বাস্থ্য এমন ছিল যে, কার সাধ্যি আমার একটা চুলও টেনে ছেঁড়ে! যেদিন সেটা বন্ধ করলে সেদিন থেকেই চুল পাকতে এবং পড়তে শুরু করল।

পড়াশুনো এভাবেই চলতে থাকল। বলা বাহুল্য, সুধীর মাস্টারমশাইয়ের এই ঐকান্তিক নিষ্পেষণের ফলে আমি ম্যাট্রিকে অঙ্কে লেটার পেয়েছিলাম, কিন্তু সেটা জীবনে প্রথম এবং শেষবার। পরীক্ষার পরই মাস্টারমশাই একেবারে মিলিয়ে গেলেন, বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি তাঁর সান্নিধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছি। রেজাল্ট বেরোবার পর একদিন এসে জিজ্ঞাসা করলেন আমি অঙ্কে কত পেয়েছি। মার্কশিট দেখালাম। দেখে সেই প্রথম তিনি নস্যিতে-গাদা নাক দিয়ে বিচিত্র এক শব্দ করলেন, যেটা হুঃ এবং খুঁঃ-এর সংমিশ্রণ, বোধহয় নাকের ভেতর দিয়ে একটু বাতাসের পথ করবার জন্য, কিন্তু কিছু কাজ হল না। তারপরে জানতে চাইলেন, আই.এস.সিতে আমি অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট হিসাবে অঙ্ক নিচ্ছি কি না। যখন শুনলেন আমি বায়োলজি নিচ্ছি, তখন আরেকবার "খুঁঃ" করে বললেন, "তাহলে ব্যাঁগ, গিন্ডিপিগ, এইসব কাটবে?"

খানিকক্ষণ বাদে চা-টা খেয়ে বিদায় নিলেন। তারপর শেয়ালদার কাছে তাঁর বাড়িতে কয়েকবার গেছি। হঠাৎ একদিন গিয়ে দেখি তালাবন্ধ। কোথায় গেছেন, কবে ফিরবেন কেউ কিছুই বলতে পারল না।

প্রায় বিশ বছর পরের কথা। আমি তখন শ্যামনগরে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর মুলাজোড় পাওয়ার স্টেশনে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট-এর কাজ দেখছি। একদিন সকালে স্টেশনের কোল ইয়ার্ডে ঘোরাফেবা করছি, মেইন গেটের দারোয়ান এসে খবর দিল, "স্যার, একটা ময়লা জামাকাপড় পরা লোক, তার একটা হাত নেই, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে। আপনাকে না-জিজ্ঞাসা করে ভেতরে ঢুকতে দিইনি, ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে নিয়ে আসব?"

মেইন গেট কাছেই ছিল, দোতলার অফিসঘর অবধি না গিয়ে ওখানেই গেলাম। গিয়ে তো একেবারে আক্কেল গুড়ুম! সুধীর মাস্টারমশাই! একটা হাত নেই, জামার খালি হাতা ঝুলছে।

আমি সেখানেই ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। দুই নম্বর সাহেবের এবংবিধ রূপ পরিবর্তনে দারোয়ান নিতান্তই হকচকিয়ে গেল, বললে, "স্যার, আমি মাপ চাইছি। আমি তো বুঝতে পারিনি উনি কে, তা হলে ওঁকে দাঁড় করিয়ে রাখতাম না। সোজা আপনাব কাছে নিয়ে আসতাম।"

আমি বললাম, "তোমার কোনো দোষ নেই।"

মাস্টারমশাইকে ঘরে এনে চা-বিস্কুট খাইয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এতদিন কোথায় ছিলেন?" যা বললেন তার সারর্মম হল, উনি নিতান্তই একা, জীবনের শেষ দিন ক'টা শ্যামনগরে কাটাচ্ছেন। কবে কোন অ্যাক্সিডেন্টে হাতটা জখম হয়ে অ্যামপিউট করতে হয়েছিল।

আমি খুবই ভয়ে ভয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কোনোভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারি কিনা। উত্তর পেলাম, "আঁবি ভালো আছি। কিছুই চাহিদা ন্তেই। তুঁবি ভালো থাকো, আর্শীবাদ করি।"

অল্পকাল বাদে মুলাজোড় থেকে অন্যত্র বদলি হয়ে গেলাম। মাস্টারমশাই আবার মিলিয়ে গেলেন। এবারে চিরকালের মতো।

ষাট বছর পেরিয়ে এসে, সংসার ও পৃথিবীর নানা ধাক্কা এবং গুঁতো সামলাতে সামলাতে ক্লান্ত এবং অবসন্ন অন্তরাত্মা মধ্যে মধ্যে আর্তনাদ করে ওঠে, "মাস্টারমশায়! আমাকে আবার সেই ১৯৪৮-এর উড স্ট্রিটের বাড়িতে গ্যারাজ ঘরে নিয়ে যান। সারারাত্রি ধরে পড়ান, একটুও বাঁদরামি করব না।"

অ ষ্ট ম প রি চ্ছে দ
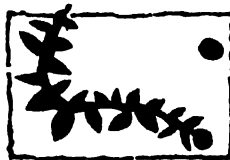
রেডিওতে প্রোগ্রাম ও অন্তাদা

১৯৪৯ সালে আমি প্রথম রেডিওতে প্রোগ্রাম কবি। আমার বেডিওতে ঢোকার অডিশন এবং প্রথম রেডিওতে বাজানো, এই দুটি কাহিনিই সমান মর্মন্তুদ। সেকালে রেডিওতে অডিশন দিতে গেলে আজকালকার মতো ক্লেশকর কঠিন প্রচেষ্টার কোনো প্রয়োজন হত না। কর্তাব্যক্তিরাই নজর রাখতেন কোথায় কোন ছেলে বা মেয়ে ভালো গান গাইছে বা বাজাচ্ছে। অনেক সময় তাঁরাই এদের ধরে নিয়ে আসতেন, আজকালকার মতো লাইন দেওয়া এবং লাইন টপকানোর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার দরকার ছিল না। আমাকে যিনি রেডিওতে নিয়ে যান তাঁর নাম প্রদ্যুম্নকুমুদ মুখোপাধ্যায়। সুগায়ক, সুপণ্ডিত এবং অতিশয় বিদগ্ধ বড়ো বংশের (শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়-এর) ছেলে। রেডিওতে প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ ছিলেন। আমার বাজনা শুনে বললেন, "এবার তোমাকে রেডিওতে ঢুকতে হবে। অমুক দিন যন্ত্র নিয়ে এক নম্বর গারস্টিন প্লেসে চলে এসো।" গুরুজির খুব একটা সম্মতি ছিল না, বলেছিলেন, "আর ক'টা দিন যাক না।" প্রদ্যুম্নদাই জোরজার করে আমাকে নিয়ে গেলেন।

অডিশন হয়ে গেল, যন্ত্রপাতি গোটাচ্ছি, হঠাৎ প্রদ্যুম্নদা বললেন, "একটা বিলম্বিতের গৎ বাজাও।" আজকালকার মতোই তখনো অডিশন সামনাসামনি হত না। পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষকরা আলাদা আলাদা ঘরে বসতেন, মাইক্রোফোন সহযোগে শ্রবণ এবং বাক্যালাপ হত । গলাটা শুনেই বুঝলাম প্রদ্যুম্নদার প্রশ্ন। তখন আমি আমার বয়সি ছেলেদের মতোই নিজের কীর্তিতে মস্ত্ হয়ে আছি, অর্থাৎ চ্যাংড়াদের ভাষায় 'ফাটিয়ে দিয়েছি'— এইরকম একটা ভাব। বিলম্বিত শুনে মনে হল এটা কোনো ব্যাপারই নয়।

ব্যাপারটা যে কতখানি আত্মঘাতী পদস্খলনে পর্যবসিত হবে তা আমার কল্পনাতেই

আসেনি। যে গৎটি বাজালাম সেটি মোটেই বিলম্বিত নয়, খুব অল্পকাল আগে গুরুজির কাছে শিখেছিলাম, অনেকটাই বিলম্বিতের মতন তার গতি, কিন্তু তবলা তার সঙ্গে ডবল স্পিডে বাজে। যাঁরা গানবাজনা করেন তাঁরা শুনলেই বুঝবেন, তিনতালের সবশুদ্ধ ষোলোটি মাত্রা, তবলার ঠেকাতেও স্বাভাবিকভাবেই তাই। এ গৎটি বিলম্বিতের আটমাত্রার মধ্যেই শেষ হয়ে পুনরাবৃত্ত হয়, তবলা তার সঙ্গে ডবল স্পিডে বাজে বলে তবলায় সেই সময়ে ষোলো মাত্রা পূর্ণ হয়। সেটা আমি তবলিয়াকে বলিনি, তিনি আমার গৎ-এর চাল শুনে বিলম্বিত লয়েরই তিনতালের ঠেকা ধরেছেন। সুতরাং তবলার আটমাত্রা শেষ হতেই আমার গৎ-এর শেষ।

স্পিকারে প্রশ্ন হল, "কত মাত্রায় আজকাল তিনতাল হচ্ছে?"

ভীষণ থতমত খেয়ে বিড়বিড় করে জবাব দিলাম, "আজ্ঞে ষোলো মাত্রা।"

"হল ষোলো মাত্রা?"

তারপরে যে আর কী বললাম, কী করলাম কিছুই মনে নেই। কান-টান লাল করে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাড়িতে তখন বৈকালিক আড্ডা জমে একেবারে ক্ষীর হতে চলেছে। বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, গুরুজি, অনিলদা, নৃপেনকাকা (নৃপেন গাঙ্গুলি, সেতারি, শিবপুর) এবং আরো কেউ কেউ। তখনকার দিনে রেডিওতে এত নিয়মের কড়াক্কড়ি ছিল না, আমি বাড়ি পৌঁছোবার আগেই খবর পৌঁছে গেছে টেলিফোনে, ছেলে ধেড়িয়েছেন।

বাড়ির গেটের কাছাকাছি হতেই দেখি আমার মেজোমামা (ফুলমামা বলে ডাকতাম) গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছেন। মামা এবং মামাবাড়ি সকলের কাছেই পরম আহ্লাদের বস্তু, কিন্তু আমার চার মামা শুধু মৌখিক আহ্লাদ নয়—বহুভাবে, বহু বিপদে-আপদে বুক দিয়ে আমাকে এবং আমার বাবা-মাকে সাহায্য করেছেন আজীবন। এঁদের মধ্যে ফুলমামা ছিলেন আমার মায়ের থেকে অল্প কিছু ছোটো, বুড়ো বয়সেও সর্বক্ষণ দুই ভাইবোনে খুনসুটি লেগেই থাকত। বিশেষ করে ফুলমামার কথা-বলার ধরন এবং তৎসঙ্গে মুখের অভিব্যক্তির একটা বিশেষ মাত্রা ছিল, যাতে হঠাৎ নিতান্ত অর্থহীন আজগুবি কথাকেও সত্যি বলে মনে হত। উন্নত মানের 'ননসেন্স' লেখা বা বলা যে কত দুঃসাধ্য কাজ তা যাঁরা সুকুমার রায়ের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সবাই জানেন। এদিক দিয়ে ফুলমামা ছিলেন সুকুমার রায়ের একলব্য শিষ্য। উদাহরণ, বারো-তেরো বছর বয়সে আমি ওঁর কাছে 'ওমর খৈয়াম' কী ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে উনি তৎক্ষণাৎ ভীষণ গম্ভীর মুখে কপালে পাঁচ-সাতটা ভাঁজ ফেলে বলেছিলেন, "আরব দেশে ওমর নামে একটা লোক ছিল। আর খৈয়াম মানে হচ্ছে খই! ওমর জন্মাবধি খই ছাড়া আর কিছু খেত না, সর্বদা নিজের কাছে খই-এর বয়াম রাখত, তাই তাকে খৈয়াম বলা হত।" বহুদিন এই ধারণাটা আমার মনে বদ্ধমূল ছিল।

ফুলমামা আসন্ন আড়ংধোলাই থেকে ভাগনেকে রক্ষে করার জন্যই গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাছাকাছি হতেই চোখ কপালে তুলে বললেন, "শোনো হে কারিয়া পিরেত (এই নামেই আমাকে ডাকতেন)! ঢুকে একদম বাঁদিকে তাকাবে না, সটান

ডানদিকে গ্যারেজের মধ্যে চলে যাবে।" কিন্তু বিধি বাম হলে যা হয়, ঢুকে গ্যারেজের আশ্রয় আর নিতে হল না। দাশু জ্যাঠামশায় অর্থাৎ বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় চেঁচিয়ে বললেন, "এই যে, ওস্তাদ! I am very pleased to know that you have unfortunately got plucked in the examination!"

এই 'unfortunately got plucked' কথাটি তৎকালীন বঙ্গসন্তানদের চাকরির দরখাস্তে বহুল ব্যবহৃত একটি বয়ান ছিল : 'রিগার্ডিং মাই কোয়ালিফিকেশনস, স্যার, আই বেগ টু স্টেট দ্যাট আই অ্যাপিয়ার্ড ইন দি লাস্ট বি. এ. এগজামিনেশন বাট আনফর্চুনেটলি গট প্লাকড।'

হুতুমপ্যাঁচার মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি, জ্ঞানবাবু বললেন, "অ্যাঁ! একেবারে pillar of success!"

কথাটার অর্থ তখন বোধগম্য হয়নি, পরে ইংরেজি প্রবচনটি মনে পড়ে গেল!

অনিলদা বিপন্ন মুখে মাথা চুলকোচ্ছেন, যেন অডিশনে উনিই ফেল করেছেন। বাবাও চুপ, বোধহয় মনে মনে ভাবছেন, ছেলের তুলো ধুনে জীবিকা নির্বাহ করবার দিন আগতপ্রায়। ওস্তাদ বারুদের স্তূপ হয়ে বসেছিলেন, এবার তাতে অগ্নিসংযোগ হল, "আরে আমি তখনি প্রদ্যুম্নকে বলেছিলাম আর কিছুদিন যাক। তা আমার কথাই শু(ই)ন্‌ল না। উনি নতুন ট্যালেন্ট খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এখন ট্যালেন্টের কাঁপ ছটকে গিয়েস্! বেশ হয়েস্! আর পাঁচ বছর ওমুখো হবে না!"

একমাত্র মা-ই আমায় কিছু বললেন না। কেন জানি না। অডিশনে ফেল করলাম আমি, কিন্তু আমার থেকে প্রদ্যুম্নদারই যেন অপরাধবোধটা বেশি হয়ে দাঁড়াল, তিনি আমায় নিয়ে গেছিলেন বলে। ফলে ছ-মাস কাটতেই গুরুজির নিদান উপেক্ষা করে আবার আমাকে অডিশনে নিয়ে গেলেন। আগেই ধমকে দিলেন, "ভেবেচিন্তে বাজাবে। ওরকম উদ্‌ভুট্টি কাণ্ড আবার করবে না।"

গতবার ফেল করবার অপমানের জ্বালা তখনো আমাকে পুড়িয়ে মারছে। ঠিক করলাম—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, তিনতাল তো সোজা তাল, এবারে ধামার বাজাব। সে-বয়সে অনর্গল এবং সাবলীলভাবে ধামার বাজাবার ক্ষমতা আমি কেন, আমার বাবারও থাকার কথা নয়। সব তান-তেহাই পূর্বপরিকল্পিত এবং মুখস্থ। পরীক্ষার আগে ইতিহাস ভূগোলের প্রশ্নের উত্তর যেমন মকসো করা হয়, সেইরকমভাবে আদাজল খেয়ে প্র্যাকটিস চলল। অকুস্থলে গিয়ে খানকতক তান এবং প্যাঁচোয়া তেহাই ঝাড়তেই স্পিকারে দৈববাণী হল, "হয়েছে হয়েছে, এবার বাড়ি যাও।"

এর কিছুদিন বাদে রেডিওতে বিমান ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক আমাকে ডেকে পাঠালেন। একটা কনট্রাক্ট সামনে দিয়ে বললেন, "সই করো। পঁচিশ টাকা দক্ষিণা, পনেরো মিনিট বাজনা।" এই হল আমার প্রথম রেডিও-প্রোগ্রাম। এখন যেমন অধিকাংশ রেডিও প্রোগ্রামই আগে রেকর্ড করে রেখে পরে বাজানো হয়, তখন তেমন ব্যবস্থা ছিল না, সরাসরি যা গাওয়া হত, বাজানো হত, সেটিই ব্রডকাস্ট হয়ে যেত। যেহেতু রেডিওর প্রতিটি প্রোগ্রাম ঘন্টায় মিনিটে বাঁধা, সেহেতু ঠিক সময়ে অর্থাৎ প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট সময়ের

অন্তত আধঘণ্টা আগে অবশ্যই রেডিওতে হাজির হতে হত। তারপর চলত কোনো একটি খালিঘরে (স্টুডিও) যন্ত্রপাতি মেলানো, তবলার সঙ্গে দু-মিনিট কুচকাওয়াজ, মাইক্রোফোনের সেটিং ইত্যাদি, আর-কোনো-একটা স্টুডিওতে তখন অন্য কোনো প্রোগ্রাম চলছে। আর্টিস্ট যদি বেশি দেরি করে আসতেন অথবা অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় আসতেন, তা হলে অফিসার-অন-ডিউটির (মতো ছিল তাঁর প্রোগ্রাম বাতিল করে দেবার। তাঁর জায়গায় তখন গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানো হত। প্রোগ্রাম শুরু হবার নির্দিষ্ট সময়ের মিনিটখানেক আগে সেই স্টুডিওর দরজা বন্ধ করা হত, রুদ্ধশ্বাসে দেওয়ালে লাগানো বড়ো ঘড়িটির সেকেন্ডের কাঁটার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে হত, তারপরে দেওয়ালে লাগানো একটি স্পিকারে ঘোষকের বাণী শোনা যেত. 'কলকাতা থেকে বলছি' অথবা 'অল ইন্ডিয়া রেডিও, কলকাতা। এবারে অমুক চন্দ্র তমুক খেয়াল শোনাচ্ছেন, রাগ...'। তারপরেই ঘড়ির ওপরে লাগানো একটি লাল বাতি জ্বলে উঠত, অর্থাৎ তোমার স্টুডিও এখন on the air।

দেরি হয়ে গেছে বলে একজন শিল্পী একবার ট্রাম থেকে নেমে দৌড়োতে দৌড়োতে হাজির, তাঁর প্রোগ্রাম শুরু হবার তখন পাঁচ মিনিট বাকি। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছেন। তাঁকে প্রোগ্রাম করতে দেওয়া হল না। বলা হল, 'নির্দিষ্ট শিল্পীর অনুপস্থিতিতে '।

যাই হোক, অবশেষে এল আমার সেই বহু প্রতীক্ষিত দিন এবং ক্ষণ। স্টুডিওর দরজা বন্ধ হয়ে গেল, লালবাতি জ্বলে উঠল, আমি on the air। কম্প্রবক্ষে বাজনা শুরু করলাম। মিনিটখানেক আলাপ বাজিয়েছি, পটাং করে একটা তার গেল ছিঁড়ে, গৎ বাজাবার সময়ে তার ছিঁড়লে তবু রক্ষে, মেরামত করবার সময়টুকু তবলা নানারকম খেলা দেখায় শ্রোতাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য। এখন তো তবলা শুরুই হয়নি. কাজেই তবলার তুবড়িবাজি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং তবলা অসহায়ের মতো চুপ করে বসে
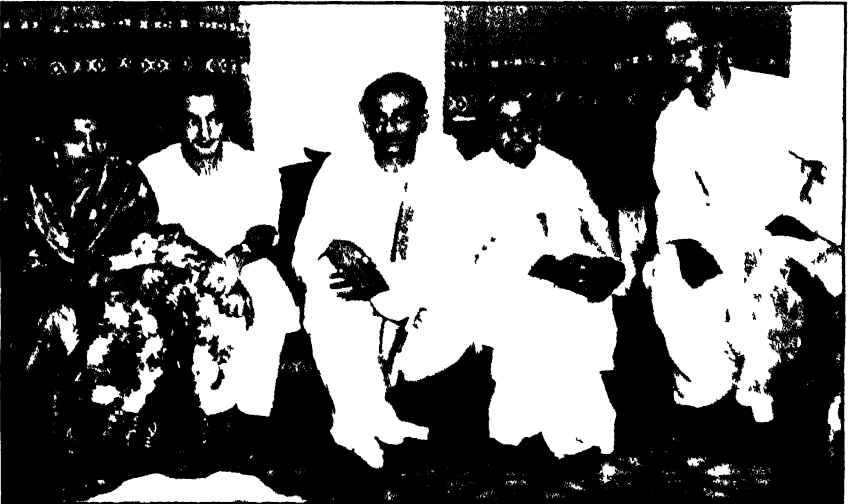
অমলাশংকর, উদয়শংকর, মন্মথ ঘোষ, ও.সি গাঙ্গুলি এবং জ্ঞানবাবু

রইল, শুধু তানপুরোটা গ্যাঁও গ্যাঁও করে বেজে চলল। তার লাগিয়ে আবার শুরু হল বাজনা। শেষ হবার মিনিট তিনেক আগে আবার সেই হতভাগা তার আরেকবার ছটকে গেল! আবার লাগিয়ে বাজনা শুরু করলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই বাজনা শেষ। একটা পাঁঠা বলি দিতে অষ্টাদশ কোপে কার্য সমাধা হল। বেরিয়ে এলাম। রেডিওর Duty Officer বললেন তাঁকে রিপোর্ট লিখতে হবে—Artiste should use better quality string—it broke twice। আমি নিরুপায়ের মতো মাথা নাড়লাম।

বাড়ি ফিরেই ওস্তাদের টেলিফোন। রাগে প্রায় তোতলা হয়ে গেছেন, "তু-তুৎ-তুমি কি ওখানে সরোদ নিয়ে এয়ার্কি মা(ই)র্‌তে বসছিলে, হ্যা?"

"আজ্ঞে, এ তার আপনারই দেওয়া, আমি জোগাড় করিনি।"

ব্যাস, অগ্ন্যুৎপাত সঙ্গে সঙ্গে ডবল হয়ে গেল। "ফের এঁড়ে তক্কো! ব্যাদড়া ছেলে কোথাকার! আমার দেওয়া তার হলেই চিরকাল ঠিক থা(ই)ক্‌বে, মরচে ধ(ই)র্‌বে না! একদিন আগে লাগিয়ে পিটিয়ে দেখে নিতে পারোনি?"

আরো খানিকক্ষণ গলিত লাভা উদগীরণ করে আগ্নেয়গিরি ক্ষান্ত হলেন।

এই ছন্নছাড়া জীবনে গানবাজনার পথে চলতে চলতে হঠাৎ-হঠাৎ অদ্ভুত সব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কেউ কেউ একবার অল্পক্ষণের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছেন, কারুর সান্নিধ্য কিছুদিন পেয়েছি, তারপর তাঁরা কালের গর্ভে বিলীন হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কথাবার্তায় এমন এমন ছাপ রেখে গেছেন, যা মনের মধ্যে চিরকাল জ্বলজ্বল করবে, কখনো মুছে যাবে না।

আমার বড়ো পিসিমা একবার কিছুদিন আমাদের উড স্ট্রিটের বাড়িতে ছিলেন। একদিন আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর শ্বশুরকুলের দূর-সম্পর্কের এক গানপাগলা মামাশ্বশুরের সঙ্গে দেখা করাতে। ভদ্রলোক পূর্ববঙ্গ থেকে আর পাঁচজনের মতোই দেশভাগের পরে সর্বস্ব খুইয়ে কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। ঘরদোর জমিজমা সম্পত্তি ভালোই ছিল, এখন কষ্টে আছেন, কিন্তু আগেকার অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। আগের মতো রাজকীয় খাওয়া নাই জুটুক, মিনিটে একটা করে পান মুখে চালান করছেন। কথাবার্তায় বুলেটের মতো থুতুর কণিকা এবং পানসুপুরির কুচি চতুর্দিকে ছিটোচ্ছে। প্রণাম করে নিরাপদ দূরত্বে বসলাম। উনি খুব ভালো তবলা বাজাতেন, রায়বাহাদুর কেশব ব্যানার্জির শিষ্য। সম্বোধন হল, "দাদু, তুই সরোদ বাজাইস? তোর গুরু রাধুরেও হুনছি, তার গুরু আমির খানরেও হুনছি। সর্বক্ষণ চন্ডু আফিং এইসব খাইয়া ঝিমাইত, কিন্তু সরোদ হাতে লইলে অন্য মানুষ! আমার গুরু রায়বাহাদুর ক্যাশব বেনার্জির মুরাপাড়ার বাড়িতে আসে নাই এমন উস্তাদ হিন্দুস্তানে ছিল না। উনারে দ্যাখছ? ছুটোখাটো নিরীহ চেহারা, কিন্তু পর্বতপ্রমাণ মহাপ্রাণ মানুষ। কত লোকেরে যে সারাজীবন পালছেন, কত উস্তাদেরে আশ্রয় দিছেন, তার ইয়ত্তা নাই। ঢাকা শহরে আইস্যা থই পাইতেছ না, খুইজ্যা-খাইজ্যা ক্যাশব বেনার্জির বাড়িতে উপস্থিত হও, ব্যাস আর চিন্তা

নাই। আমারে খুব ভালোবাসতেন, যত্ন কইর‍্যা তালিম দিতেন, কিন্তু আমি ছিলাম রাম বান্দর। দিল্লির উস্তাদ নাথ্থু খাঁ সাহেব উনার বাড়িতে প্রায়ই আইয়া থাকতেন। নাথ্থু খাঁ সাহেবের একখান র‍্যালা আছিল, চইলত্যাছে তো চইলত্যাছেই, ফুরায় না। আমার বিদ্যা আর কী, কানে হুইন্যা তুইল্যা ফেলুম, কিন্তু মনে দারুণ ধইর‍্যা গেছিল। তবলের বাণী যা সামান্য কিছু জানতাম তাই সাZাইয়া হেই র‍্যালার একখান পেরোডি বানাইছিলাম, গুরুদেব তাই হুইন্যা আমারে গোল্ড মেডেল দিছিলেন।''

''বলেন কী! কোথায় বাজিয়েছিলেন রেলাটা?''

''গুরুদেবেরই বাড়িতে এক জলসায়। চাইর লাইন বলি, চাইর লাইন বাZাই, চাইর লাইন বলি, ফের চাইর লানি বাZাই। খানিকবাদে মাইক্রোফোন হালায় গেল চুপ মাইর‍্যা, আর কথা ধরে না। আমি আরো জোরে জোরে চ্যাচাই। তখন গুরুদেব উইঠ্যা তারাতারি গোল্ড মেডেল ডিক্লেয়ার কইর‍্যা দেন।''

আমি পরিষ্কার বুঝে গেলাম 'হালা' মাইক্রোফোনের চুপ করে যাবার কারণটা। ওই পরিমাণ থুতু এবং পানের পিক সুপুবির কুচি নিক্ষেপের ফলে সম্পূর্ণ বুজে গিয়ে বেচারির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়েছিল নিশ্চয়ই। অনুরোধ করলাম রেলাটা যদি একবার শোনান।

''বহুদিন তবল ধরি না রে দাদু, তয় মুখে কইতে পারি, হুনবা?'' সভয়ে আরো হাতখানেক পিছিয়ে বসলাম। মিনিট পাঁচেক ধরে রেলা চলল। রেলাটির এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না। পাঠকবর্গ স্রেফ ছড়া হিসেবেই পড়তে পারেন, তবলিয়ারা আরো বেশি মর্মোদ্ধার করবেন।

''তবলের আর বায়ার বাণী কুনটা কি বুঝতে পার? খুলি আর মুদি কারে কয় Zান? কুনকুন বোলে তবলা শুধু বাজে, বায়া চুপ থাকে, কুনকুন বোলে বায়া বেশি বাজে তবলা কম বাজে অথবা চুপ থাকে। তবলার বাণী হৈল, তা, না, তি, দি, টে ইত্যাদি। বায়ার বাণী ক, খ, গ, ঘ, কি, গি, ঘি, ঘে এই সমস্ত। এই র‍্যালায় চাইরখান মোটে বোল ঘুরত্যাছে, কিতি, গিদি, নাড়া আর ঘদা। তয় শুরু করি; ঠিক কইর‍্যা হাতে তাল দেও :

''কিতি কিতি কিতি নাড়া, গিদি গিদি গিদি নাড়া,
কিতি কিতি কিতি নাড়া, গিদি গিদি গিদি নাড়া,
কিতি কিতি নাড়া, গিদি গিদি নাড়া, কিতি কিতি
নাড়া, গিদি গিদি নাড়া, কিতি নাড়া, গিদি নাড়া,
কিতি গিদি গিদি, কিতি গিদি গিদি, কিতি নাড়া,
গিদি কিতি কিতি, গিদি কিতি কিতি, গিদি নাড়া,
(খুলি মুদি লইক্ষ করত্যাছ?)
নাড়া কিতি, নাড়া কিতি, নাড়া কিতি, কিতি নাড়া,
নাড়া গিদি, নাড়া গিদি, নাড়া গিদি, গিদি নাড়া
নাড়া নাড়া নাড়া কিতি, নাড়া কিতি, কিতি নাড়া,
নাড়া নাড়া নাড়া গিদি, নাড়া গিদি, গিদি নাড়া,
নাড়া কিতি কিতি, নাড়া কিতি কিতি, নাড়া নাড়া,

নাড়া গিদি গিদি, নাড়া গিদি গিদি, নাড়া নাড়া,
গিদি কিতি, গিদি কিতি কিতি, গিদি গিদি নাড়া,
কিতি গিদি, কিতি গিদি গিদি, কিতি কিতি নাড়া,
কিতিক কিতিক কিতি, কিতি কিতি কিতি নাড়া,
গিদ্দিগ গিদ্দিগ গিদি, গিদি গিদি গিদি নাড়া,
(এবার বায়া খুব জোবদার হইব, দাদু)
ঘদা ঘদা ঘদা ঘদা, ঘদা কিতি ঘদা নাড়া
গিদি গিদি ঘদা ঘদা, ঘদা গিদি ঘদা নাড়া
ঘদা গিদি গিদি, ঘদা কিতি কিতি, ঘদা নাড়া,
ঘদা কিতি কিতি, ঘদা গিদি গিদি, ঘদা নাড়া।''

আর অধিকক্ষণ এই রেলা চালালে পাঠকবর্গ হাতের কাছে জুতো, ছাতা, লাঠি, যা পাবেন তাই নিয়ে আমার বাড়ি অথবা দিশা সাহিত্যের অফিসে ধাওয়া করবেন, কাজেই এবার তেহাইটা দিয়ে শেষ কবছি ''নাড়া না। নাড়া না! নাড়া নাড়া! না-না-! ধ্যাৎ। ধা-(গাধা কোথাকার), নাড়া না, নাড়া না। নাড়া নাড়া! না-না-। ধ্যাৎ। ধা!(গাধা কোথাকার) নাড়া না, নাড়া না! নাড়া নাড়া! না-না। ধ্যাৎ! (ধা)।''

একেবারে পাক্কা তিনতাল। ঠিকভাবে পড়তে পারলে, বিশেষত তবলিয়ারা আনন্দ পাবেন, আশা করি, পবীক্ষা করে দেখতে পারেন। ঢাকাইয়া দাদুকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''এরকম অপূর্ব জিনিসের চর্চাটা চালিয়ে যাচ্ছেন না কেন?'' উত্তর দিলেন, ''তাকি আর থাকে রে দাদু! দ্যাশ থিক্যা পলাইয়া আইয়া সর্বস্ব হারাইছি, শ্যাখের পোলারা সব নিয়া নিছে, মায় তোর আটিমার হাত হইতে গয়নাগাটি শুদ্দা। উনারে লইয়া গেলেও ভালো হইত, ঝারা হাত পাও হইয়া থাকতাম। বাকি আছে বসতবাটিখান, আর কিছু খাটপালঙ্ক

জ্ঞানবাবুর সংবর্ধনা সভায় গুণমুগ্ধরা

চেয়ার টেবুল খানকতক তবল বায়া আর তম্বুর। সে সবও অ্যাদ্দিনে নিশ্চয় সাফ কইরা লইছে সুমুন্দির পো-রা। এক বগলে ট্যাহাকড়ির স্যুটকেস আরেক বগলে তর আস্তিমারে লৈয়া শিয়ালদহে নামছিলাম রে দাদু, কাজেই এ্যাহনে গানবাজনার পাট চুইক্যা গেছে, অ্যাহনে খালি খাওন আর হাগন!"

"আর কোনোদিন দেশে যাবার চেষ্টা করেননি, অন্তত বাড়িখানার কী অবস্থা দেখবার জন্য?"

উত্তর এল, "হুঃ! ইচ্ছা করে বই কী! অনেক দিন ধইর‍্যা ভাবতে লইছি এইবার একবার যামু, বাপ পিতামোর ভিটায় মাথাডা ঠ্যাকানের লইগ্যা। এবারে এক্কেরে নির্ভয়ে যামু, আমারও আর হারাইবার কুন কিছু নাই, শ্যাখের বাচ্চাদেরও আর নেওনের কিছু নাই। ফের যদি আমারে ঠাইস্যা ধরে, '—' দুইখান পাইবো হালারা!"

দাদু অবলীলাক্রমে যে দেহাংশটির কথা উল্লেখ করলেন সেটা আমি এখানে উদ্ধৃত করতে পারছি না। পিলে চমকে উঠলেও বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করলাম— অশ্লীল ভাষায় (বিশেষত সেটা যদি আমাদের পূর্ববঙ্গীয় হয়) নানারকম পরিস্থিতি এবং তজ্জনিত মনের ভাব এমনই প্রকটভাবে প্রকাশ করা যায়, যেটা সাধু এবং মার্জিতভাষার সাধ্যাতীত।

প্রণাম করে বিদায় নিলাম। পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, দাদু নিশ্চয় এখন ওপারে। কাদের রেলা শোনাচ্ছেন, কে জানে!

দ্বিতীয় আগন্তুক অনন্ত নাগ, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচয় এবং সম্পর্কটা খুব সংক্ষিপ্ত নয়। কোথায় তাঁর বাড়ি, কী করতেন, আত্মীয়স্বজন কে আছেন কিছুই জানতাম না, জানবার চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। আমার ওস্তাদের চারধারে তিনি সর্বদা ছায়ার মতো লেগে থাকতেন। ওস্তাদ কোথাও গেলে 'অন্তাদা'ও সেখানে বিলক্ষণ হাজির। কিছুদিন বোধহয় বাজনা শেখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোনোদিন তাঁকে যন্ত্র হাতে নিতে দেখিনি, তৎসত্ত্বেও বাজনার ব্যাপারে তাঁর মতামত ছিল বহুমূল্য। ওস্তাদের সেবায় তিনি সমর্পিতপ্রাণ ছিলেন। ওস্তাদ যে তাঁকে কতটা ভালোবাসতেন সেটা বাইরে থেকে বোঝা যেত না, সর্বক্ষণ গালাগালি আর নানাপ্রকারের উৎপীড়ন চলত। অন্তাদাকে কিছুই স্পর্শ করত না।

'শালা' এবং 'মাইরি' এই দুটি শব্দের বহুল এবং সার্থক প্রয়োগে অন্তাদা তাঁর কথাবার্তাকে এমন সমৃদ্ধ করে তুলতে পারতেন যে, চেষ্টা করেও অন্য কেউ সেখানে কোনোদিন পৌঁছতে পারবে না, কারণ সে-ভাষা পাখির গানের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত। আমি তাঁর কথা যা উদ্ধৃত করব তা তুলনায় নিতান্তই জলীয়।

বিয়ে-থা করেননি, মেয়েদের ত্রিসীমানার মধ্যেও কেউ কোনোদিন তাঁকে দেখেনি। কিন্তু বাজনা না-বাজিয়েও তিনি যেমন বাজনায় জ্ঞানের সাগর, মেয়েদের ধারে-কাছে না-থেকেও তিনি তেমন কামশাস্ত্রের অমৃতকুম্ভ। দু-দণ্ড এই বিষয়ে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শুনলেই স্থির বিশ্বাস হত, বাৎস্যায়ন এখনো সকাল-বিকাল ওঁর কাছে কোচিং নিয়ে যান।

বিভিন্ন বিখ্যাত মহিলার ইতিহাস এবং ভূগোল তাঁর নখদর্পণে, এবং তাঁর বর্ণনা শুনে মনে হত জীবনে কয়েক হাজার নারীদেহ অস্তাদা সযত্নে জরিপ করেছেন।

বাজনার বিষয়ে তিনি ছিলেন আমার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী। কী করলে আমার বাজনা আরো উপভোগ্য হয়ে উঠবে, সেই নিয়ে ছিল তাঁর সর্বক্ষণ চিন্তা। কিন্তু সেটা করবার জন্য আমাকে যে নানাবিধ প্রেসক্রিপশন দিতেন, সে দাওয়াই গলাধঃকরণ করবার সাধ্য আমার সেই পনেরো-ষোলো বছর বয়সে ছিল না। যতই 'দুর্ধর্ষ' বাজাই-না কেন, কিছুতেই অস্তাদার মন পেতাম না। বাজনার পরেই মাথা নাড়তেন আর বলতেন, "হইল না ভাই। এখনো বাজনাটাকে ঠিক 'কুৎ' ক(ই)রতে পা(ই)রছ না।"

'কুৎ' করাটা যে বাস্তবিক কী ব্যাপার, এবং কী করলে বাজনাটাকে ঠিক 'কুৎ' করা যাবে, বহুবার জিজ্ঞাসা করেও তাঁর কাছে সদুত্তর পাইনি। আমি নাছোড়বান্দার মতো বললাম, "বলুন পরিষ্কার করে, নইলে আজ ছাড়ছি না।"

দাদা বললেন, "খুব তো পরিশ্রম ক(ই)রে হাত তোয়ের ক(ই)রেছো। দারুণ তানতোড়া দিরিদিরি কুন্তন গমক ঝা(ই)রছ কিন্তু শেষ অবধি দাঁড়া(ই)চ্ছে শুষ্কং কাষ্ঠং! তোমার বাজনায় কোনো রস পয়দা হয়নি এখনো।"

"কী করলে রস পয়দা হবে?"

"অনেক কিছুই ক(ই)রতে হবে। শোনো মন দিয়া— "

এই সময়ে সাক্ষাৎ যমের মতন ঘরে ওস্তাদের প্রবেশ।

"কী কথা হচ্ছে?"

আমি কাঁচুমাচু মুখ করে গুরুদেবকে জানালাম, "আমার বাজনায় নাকি এতদিনেও কোনো রস হয়নি, কী করে রস পয়দা হবে অস্তাদা তাই শেখাতে যাচ্ছেন।"

"অস্তা, ছেলেটাকে বখাচ্ছিস, না রে ছোঁড়া? নিজের বাজনায় রস তো একেবারে গেঁজিয়ে তাড়ি হয়ে বসে আছে, ওটার বারোটা বাজাচ্ছিস কেন?"

অস্তাদা সাত হাত জিভ কেটে বললেন, "না রাধদা, মাইরি না!"

"ফের ওর সামনে ওসব ছেটোলোকি লবজ?"

"আর মুখ দিয়ে বাইরোবে না দাদা, এই শালা আপনার সামনে নাকে-খত দিলাম!!"

ওস্তাদ হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু সেদিন আর অস্তাদার কাছে বাজনায় রস পয়দা করার ফর্মুলা শেখা গেল না, কারণ ওস্তাদ চলে যাবার পরে ঘরে আরো অনেক লোক ঢুকে পড়ল। পরের সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। পরের দিনটা ওস্তাদের বাড়িতে যেতে পারিনি। তারপরের দিন গিয়ে দেখি অস্তাদা আসেননি। সেই যে এলেন না, তারপরে সাত আটদিন নো-পাত্তা। ওস্তাদের বাড়িতে উনি আসেননি, এটা একটা বিশাল বিপর্যয়! আমার গুরুপত্নীর মেজাজ খারাপ, ওস্তাদ ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করে গালাগাল দিচ্ছেন। শেষকালে বললেন, "বে আক্কেলে হতভাগা, এবার আসুক না! I shall vulturise him!"

ইংরেজিতে 'ভালচারাইজ' কথাটা কখনো শুনিনি, ভালক্যানাইজ কথাটা রবারের টিউব, টায়ারের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কিন্তু এই নতুন শব্দটার তাৎপর্য ঠিক অনুধাবন করতে

পারলাম না। শেষে, যাঁকে গুরুদেব vulturise করার সংকল্প করেছিলেন তাঁরই সঙ্গে যখন দেখা হল জিজ্ঞাসা করলাম। অন্তাদা মৃচকি হেসে বললেন, "বুইল্লে না? রাধ্দা আমারে কুচি কুচি করে কাট্যে শালা শকুন দিয়ে খাওয়াবে। তাই ভালচারাইজ।"

"সাতদিন কেন হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন দাদা?"

"আর ব(ই)লো না মাইরি! সেদিন তো তোমার সঙ্গে আর কথাবার্তা হ(ই)ল না! পরের দিন রাধদা বউদিকে নিয়ে গেলেন শালা দেশপ্রিয় পার্কে, পি মজুমদারের দোকানে, শালির বিয়ের জন্য শাড়ি কিনতে। সে কি শাড়ি কেনার বহর মাইরি! শাড়ি কেনার থেকে শাড়ি দেখাই বেশি। দেখা আর শেষ হয় না। বউদির পছন্দ তো! উনি আবার শালা সুযঙ্গের রাজবাড়ির মেয়ে। দশটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত দোকানদারের মাইরি কালঘাম ছুটিয়ে ছেড়ে দিলেন। এ কাপড়টার জমি চলনসই হ(ই)ল তো পাড়টা শালা বোকা বোকা, ওটার পাড়টা মনে ধ(ই)রল তো জমি জ্যালজেলে। দোকানদারের বগলের কাঁপ ছ(ই)ট্‌কে গেল মাইরি, খালি ওঠাচ্ছে আর নাবাচ্ছে। শেষমেশ দেড়টা নাগাদ হুকুম হল অন্তা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়। দেড়টার সময় খাওয়া-দাওয়ার টাইমে ট্যাক্সি পাওয়া কি মাইরি ছেলের হাতের মোয়া! রাস্তার এধার থেকে ওধার ছুটোছুটি ক(ই)রছি, হাত তুলছি, ভেংচি কাটছি, কোনো শালা ট্যাক্সি ভিড়ছে না। বৌদি আবার রাস্তায় নেবে দাঁড়িয়ে থা(ই)কতে পারেন না, ট্যাক্সি এসে একেবারে দরজা খুলে দাঁড়াবে তবে উনি দোকান থেকে না(ই)বেন। পনেরো মিনিটটাক এইভাবে কাটবার পর দেখি, বউদি আর না-পেরে শালা রাস্তায় না(ই)বে পড়েছেন, রাধ্দা জ্বলন্ত কয়লার মতন চোখে এদিক-ওদিক তাকা(ই)চ্ছেন। দেখে তো আমার ভাই হয়্যা গেল। চিৎকার করে বললাম, বৌদি ভেতরে যায়া বসুন, আমি এখনো ট্যাক্সি পাইনি, পাল্যেই ডেকে নেব। হবি তো হ, ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে এক শালা ট্যাক্সি পোঁ-ওৎ পোঁ-ওৎ করে হর্ণ দিতে দিতে বৌদির সামনে আইসে থা(ই)মল, বউদি আমার দিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাট্‌কা(ই)য়ে ট্যাক্সিতে উঠে গেলেন, পেছনে রাধ্দা। বলো তো মাইরি, ভগবান শালা সর্বক্ষণই যদি এইরকম পোঁদে লাগ্যে থাকে আমাকে ডাউন দেবার জন্য, তাহলে কী করি। আমি তো জানি বাড়িতে আ(ই)সলে আমার কী খোঁয়াড় হবে, আমি আর এদিক পানে আসি?"

"ভালচারাইজেশনটা কী রকম হল অন্তাদা?"

"আমি তো শালা ভাবতে ভাবতে আসচি, ঢোকামাত্তর এক পক্কড় ঝাড় হয়্যা যাবে। কিছুই হল্যো না ভাই। ওস্তাদ শালা গুম হয়ে বসে আছে, শরীর নাকি খারাপ। শরীর খারাপ হলে বা জ্বরটর হল্যে উনি গুণগুণ করে গান করতে থাকেন, তাই শালা চ(ই)লছে অনবরত। হবে না শরীর খারাপ! ঘুম থেকে উঠ্যা প্রথমেই শালা অন্তাকে দাঁত খিঁচোবেন, তারপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় নরকস্থ ক(ই)রবেন, তবে তো ওনার শালা ধাত ঠিক থা(ই) কবে! এই কয়দিন না আস্যে ওস্তাদকে মাইরি জবর টাইট দিয়েছি।"

শেষমেশ বহুদিন বাদে ওস্তাদকে অন্তাদা সত্যিই একেবারে মোক্ষম টাইট দিয়েছিলেন। এই পর্বের শেষে সে-কথা হবে। আপাতত বাজনায় রস পয়দা করার ফর্মুলা। মনোযোগ সহকারে অন্তাদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"মেয়েদের দিকে কোনোদিন ভালো ক(ই)রে তাকিয়েছ? মেয়েদের দেখলে কী মনে হয়?"

"এ আবার কী কথা অন্তাদা! বাড়িতেই তো বহুত মেয়ে সর্বক্ষণ দেখছি! মাকে দেখলেই গা ছমছম করে, কখন কী ঝাড় খাব। ঠাকুমা, পিসিমাকে দেখলেই আহ্লাদ, মোয়া, মালপোয়া আমসত্ত্ব, নাড়ু! দিদিটাকে (রেখাদি, আমার বড়োপিসিমার বড়োমেয়ে) দেখলেই ইচ্ছে করে খুনসুটি করি, পেছনে লাগি। মেজোপিসিকে দেখলে—"

"তুমি একটি আস্ত উজবুক মাইরি। বাড়ির মেয়েদের কথা ব(ই)লছি না। তোমার বয়সি অন্য অচেনা মেয়েকে দেখলে কী মনে হয়? বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে না?"

"কতটা কাছাকাছি দেখলে গুড়গুড় করবে? সে রকম হয়েছে কিনা জানি না।"

"আহা, কাছাকাছি তো কের্মে কের্মে হবে, একটু দূর থেকেই আগে ভালো ক(ই)রে তাকাও না! এই যে তুমি সেদিন অল বেঙ্গল কম্পিটিশনে গ্রিনরুমে যন্ত্র বাঁধছিল্যা, ঘরের অন্যদিকে একটি সুন্দরী মেয়ে, অজন্তা লাহিড়ি, সেতারের কম্পিটিটর, তোমার দিকে কী জুলজুল কর্যা তাকিয়ে ছিল লক্ষ কইরেচো?"

"অন্তাদা, আমি ট্যারা নই যে এক চোখে যন্ত্রের দিকে, আরেক চোখে ঘরের উলটোদিকে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকব!"

"তবেই হয়েচে! শোনো হে অবোদা চৈতন, ভাল ক(ই)রে মেয়ে না ঘাঁ(ই)ট্‌লে ভালো আর্টিস্ট কোনোদিনই হতে পা(ই)রবে না, এই তুমাক বুইল্যে দিলাম শেষ কথা! বাজনা তবে এইরকম ঘ্যাটর ঘ্যাটরই থেকে যাবে।"

"আমার ওস্তাদের বাজনা এত ভালো হল কী করে? উনি কি খুব মেয়ে ঘেঁটেছেন?"

"ওনার মতো চেহারা আর কপাল নিয়্যা তুমি আমি জন্মাইনি মাইরি, ওনার কোনোদিন মেয়েদের পেছনে শালা ছুটতে হয় নাই, মেয়েরাই ওঁর চারধারে কাঁঠালে-মাছির মতো শালা সর্বক্ষণ ভন্‌ভন্ ক(ই)রছে। উনি তার থেকেই রস নিয়্যা নিচ্ছেন, ছোঁয়াছুঁয়ির দরকার নাই। আর মধ্যে মধ্যে চোখ পাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে সব তাড়িয়ে দিচ্ছেন, এক দঙ্গল গেল তো শালা নতুন আরেক দঙ্গল আইস্যে প(ই)ড়ল তখুনি।"

"আমার নিজে নিজে কিছু করবার হিম্মৎ নেই দাদা! আমারও চারধারে যদি মেয়েরা ওরকম কাঁঠালে-মাছির মতো ঘিরে ধরে, তবে রস পয়দা হবে, না হলে হবে না, কী করব!"

"তুমি এইরকম কাঠকয়লাই থা(ই)কবা চিরকাল।"

অন্তাদার তিরস্কার মধ্যে মধ্যেই চলতে লাগল। কিন্তু তাঁর ফর্মুলাটা প্রয়োগ করার ইচ্ছে হলেও উপায় ছিল না, কারণ যুৎসই মেয়ে সব নাগালের বাইরে। কলেজে দুই-একজন যাঁরা ছিলেন, আমার থেকে ঢের করিৎকর্মা 'হ্যান্ডসাম' চগবগে ছেলেরা তাঁদের ঘিরে রয়েছে, মিনমিনে আমি ধারেকাছেও যেতে পারব না। সুতরাং বাজনায় রস আনবার সংকল্প কাজে পরিণত হল না!

অন্তাদাব এইরকম রোমাঞ্চকর অভিভাবকত্বে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলাম।

হঠাৎ একদিন শুনলাম অন্তাদার ক্যানসার হয়েছে। খুবই অ্যাডভান্স্‌ড স্টেজ, লিভার প্যাংক্রিয়াস গলব্লাডার পাকস্থলী সব একসঙ্গে জড়িয়ে। অপারেশন ছাড়া গতি নেই। অপারেশন করলেও ফলাফল অনিশ্চিত। ভারতের একজন বিখ্যাত সার্জেন অপারেশন করলেন। তিন চারদিন টানাপোড়েন চলল। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে অন্তাদা মারা গেলেন।

বাড়ির লোক আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল কি না জানি না। গুরুভাইরা হাসপাতালে ছুটল, শরীরটাকে নিয়ে সৎকার করতে। ওস্তাদও যাবেন বলে তৈরি হচ্ছিলেন; হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে বললেন, "আমি আর ও হতভাগাটাকে চোখে দেখতে পারব না। তোমরা যাও, যা করার করো। কোনো ত্রুটি না হয়!"

যে ওস্তাদকে নিজের স্ত্রীর চিতায় শায়িত মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করবার সময়ে একটুও বিচলিত হতে দেখিনি, তাঁর এই বাঁধভাঙা চোখের জলের থেকে বড়ো আশীর্বাদ, বড়ো পাথেয় আর কী হতে পারে? অন্তাদা তাই মাথায় নিয়ে অনন্তের পথে পাড়ি দিলেন।

ন ব ম প রি চ্ছে দ
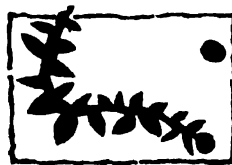
প্রেসিডেন্সি কলেজ

মধ্যবিত্ত ঘরেব ছেলে, পড়াশুনা না-কবলে কুলিগিরি করে খেতে হবে। কুলিগিরি জীবিকাটি তখন মনে যে-শঙ্কার উদ্রেক করত, আজকালকার রেলস্টেশনে কুলিদের বিক্রম ও রোজগার দেখলে মনে হয়, তার কোনো ভিত্তি আর নেই। যাই হোক, কলেজে ভর্তি হতে হবে এবং সায়েন্স পড়তে হবে, ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, না-হলে খাওয়া জুটবে না, এই ছিল ভবিষ্যতের হিসেব! সুতরাং ভর্তি হতে ছুটলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে, যে-কলেজ থেকে একদিন আমার পিতৃদেব এনায়েত খাঁ সাহেবের বাজনা শুনে হিন্দু হোস্টেলের আবাসিকদের নিয়মভঙ্গ করে গভীব রাতে ফেরবার অপরাধে বিতাড়িত হতে বসেছিলেন।

ভর্তি হয়েও গেলাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন স্কুল থেকে, বহু ছাত্র এবং তুলনায় অল্প সংখ্যক ছাত্রী সেখানে উপস্থিত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করবার জন্য মনে যে স্ফীতিটুকু গজিয়ে উঠেছিল সেটা অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে মেশবার পর নিঃশেষে অন্তর্হিত হল। আমি তো শুধু পড়ার বই এবং সরোদ নিয়েই জীবন কাটাচ্ছি। এদের পড়াশুনোর বিস্তৃতি, সাধারণ জ্ঞান, বাকপ্রতিভা ইত্যাদি আমায় মুগ্ধ করত এবং মনে কিছুটা দৈন্যবোধেরও উদ্রেক করত। এ ছাড়া নতুন বন্ধুদের সঙ্গে মিশে বিশেষভাবে উপলব্ধি করলাম যে, ম্যাট্রিকুলেশন (বা বর্তমানে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষায় প্রথম শ'দুয়েক ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে-কোনোজন ফার্স্ট হতে পারে। সেটা নির্ভর করছে গ্রহ-নক্ষত্র এবং নানান পরিস্থিতির ওপর। আমাদের সময়ে বোধহয় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা লাখও ছিল না, বর্তমানে যা চার-পাঁচ লাখ ছাড়িয়ে যায়। এই বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর খাতা যদি একজন মাত্র পরীক্ষককে দিয়ে দেখানো হত এবং খাতা দেখার সময় তাঁর মানসিক এবং শারীরিক (বাঙালি পরীক্ষক হলে পৈটিক) অবস্থা

যদি একই রকম থাকত তবেই প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হত। সেটা বাস্তবে হওয়া অসম্ভব। যদি আমি খাতা দেখতে বসি তবে বাড়ির নানা সমস্যা, কর্মসংক্রান্ত নানা দুর্ভাবনা, ব্রাহ্মণীর (যদিও আমি ব্রাহ্মণ নই) মেজাজের মার্কারির ওঠানামা, এইসবের তাড়নায় আমার খাতা দেখার মন কদাপি এক স্তরে থাকবে না। পরিস্থিতির ঝালটা আমি কোনো নিরীহ পরীক্ষার্থীর খাতার ওপর ঝাড়ব।

আরেকটি সত্যও উত্তরকাল বারবার প্রমাণিত করেছে যে, লিখিত পরীক্ষাতে চমকপ্রদ ফললাভ করলেও জীবনে ও জীবিকায় প্রতিষ্ঠালাভ সেই অনুপাতে না-ও হতে পারে। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বরাট হয়েছেন, তাঁদের তুলনায় আমি অনেক পিছনে রয়ে গেছি, এটাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই।

নোবেল পুরস্কারবিজয়ী অমর্ত্য সেন, ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত, অর্থনীতিবিদ সুখময় চক্রবর্তী, পার্থসারথি গুপ্ত, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মনোজকুমার মুখার্জি এবং গণেন্দ্রনারায়ণ রায়, সুহাসচন্দ্র সেন, শিল্পজগতের শীর্ষে বিরাজমান সুসীমমুকুল দত্ত, অরবিন্দ রায়, পূর্ণেন্দু গুপ্ত, বিমলগতি রায়, রণজিৎ দত্ত এবং আরো অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কিছুদিন এক কলেজে পড়াশুনা করেছি এটা আমার পরম শ্লাঘার বিষয়।

বাড়িঘরদোরের বিশালত্ব দিয়ে একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানের উচ্চতা নির্ধারণ হয় না কোনোদিনই, হয় যে-সমস্ত দিকপাল অধ্যাপক সেখানে তাঁদের পদচিহ্ন রেখে গেছেন তাঁদের দিয়ে। মাত্র দু-বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিলাম কিন্তু তার মধ্যেই বেশ কয়েকজন অধ্যাপক আমার মনের মাঝে চিরকালের জন্য স্থান করে নিয়েছেন।

যদিও বাংলা আমরা মূল বিষয় ছিল না, তবু বাংলার অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর চেহারা এবং জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর আজও চোখ বুজলেই দেখতে বা শুনতে পাই। ফলপ্রসূ এবং চিত্তাকর্ষক পড়ানো যে নিতান্ত চঞ্চলমতি ছাত্রকেও সারা পিরিয়ড কীভাবে সম্মোহিত করে রাখতে পারে, সেটার প্রমাণ প্রতিদিনই তাঁর ক্লাসে মিলত।

বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বিশেষত 'মেঘনাদবধকাব্য' জনার্দনবাবুর রসনায় যেন নৃত্য করত। তিনি ছিলেন মধুসূদনের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। মেঘনাদবধের একটা সামান্য অংশ আমাদের প্রবেশিকা বাংলা সংকলনে ছিল। সেটা পড়াতে গেলেই তিনি অনিবার্যভাবে অন্তত একবার মধুসূদনের সমাধিলিপি "দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব..." আবৃত্তি করতেন। তাঁর মুখনিঃসৃত "দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন" কথাটি মধুসূদনকে যেন আমাদের চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিত। স্পষ্ট দেখতে পেতাম, সাগরদাঁড়িতে কপোতাক্ষ তীরে পিতৃগৃহে কোনো একটা ঘরে মধুসূদন অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজি কবি হবার বাসনায়। ভেবে পাচ্ছেন না, কী করলে মিশনারিদের কৃপালাভ করে ইংল্যান্ডে যাবেন।

স্যারের ক্লাস করতে করতে হঠাৎ একদিন খেয়াল হল, পুরো মেঘনাদবধটাই পড়তে হবে। পাশেই কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকান। মেঘনাদবধ অবশ্যই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তার দামটা তখন আমার ঠিক নাগালের মধ্যে নয়। রাস্তায় নেমে সেকেন্ডহ্যান্ড বইয়ের দোকানে একটি মোটামুটি পরিষ্কার সভ্যভব্য চেহারার বই মিলল, সেটার দাম

প্রফেসর জনার্দন চক্রবর্তী
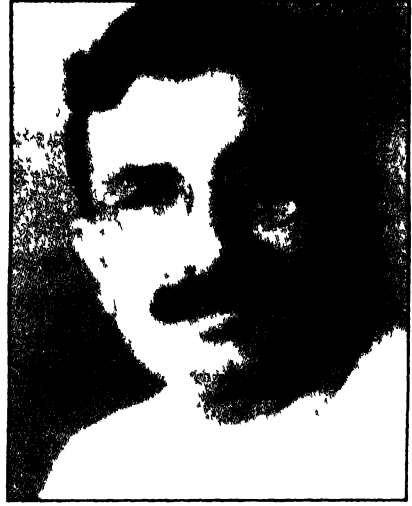
প্রফেসর খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কম কিন্তু সে-পয়সাও তখন আমার কাছে নেই। এবং দোকানি বলল, ওটা সে রেখে দিতে পারবে না, তখনই নিতে হবে। বইটার খুব চাহিদা।

কী ভেবে একদৌড়ে চলে গেলাম জনার্দনবাবুর কাছে। মাস্টারমশাইদের কাছে কোনোদিন কোনো অবস্থাতেই টাকা ধার করার কথা ভাবিনি, দরকারও হয়নি কখনো। কিন্তু আজ পরিস্থিতি আমাকে সেই কাজই করিয়ে ছাড়ল। বললাম, "স্যার, আমাকে কয়েকটা টাকা ধার দিতে পারেন?"

উনি একটু হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, কী জন্যে টাকার দরকার?" জানি না, হয়তো-বা ভেবেছিলেন বন্ধুবান্ধব (হয়তো-বা বান্ধবী) নিয়ে কফি হাউস বা দিলখুসা রেস্টুরেন্টে আড্ডার রেস্ত জোগাড় করছি। যখন বললাম, মেঘনাদবধকাব্য কিনবার চেষ্টা করছি, তাঁর মুখের গম্ভীর রাশভারি চেহারাটাই বদলে গেল। একবার শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, পরের দিন বাড়ি থেকে টাকা এনে কিনতে পারি না কেন। আমি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা—নতুন বইয়ের দাম, পুরনো বইয়ের দোকানদারের হুমকি, তাঁকে খুলে বললাম।

আর কোনো বাক্যব্যয় না-করে স্যার টাকা দিলেন। বই হস্তগত হল। পরের দিন যখন টাকাটা ফেরত দিতে গেলাম, উনি বললেন, "টাকা নেব না।" আমি হাঁ-করে তাকিয়ে আছি দেখে তিনি বললেন, "ওটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম। এতদিন ছেলে পড়াচ্ছি, কেউ আমাকে এসে বলেনি যে, সে এখনই মেঘনাদবধকাব্য কিনতে চায়! তোমাকে এতখানি অনুপ্রাণিত করতে পেরেছি, এ আমার পরম প্রাপ্তি! বইটা আগাগোড়া পড়ো। একবার নয় বারবার।"

এখনকার তুলনায় তখন অধ্যাপকেরা নিতান্তই দরিদ্র ছিলেন। বিশ-বাইশ হাজার মাইনে তো পেতেনই না, উপরন্তু ক্ষেত্রবিশেষে কোচিং ক্লাস খুলে আরো বেশ কয়েক

হাজার রোজগার তাঁদের চিন্তার বাইরে ছিল। সেই সময়ে একজন শিক্ষকের কাছ থেকে এমন একটি অঙ্কের টাকা লাভ করলাম, যা অন্তত তাঁর দু-দিনের বাজার খরচ।

জনার্দনবাবু শুধু আমার নয়, ক্লাসের অনেক ছাত্রের কাছেই বাংলাভাষার এক অপরূপ রাজ্যের পথ খুলে দিয়েছিলেন মাইকেল পাঠের মধ্য দিয়ে। ভাষাতে শব্দের এমন অভাবনীয় ব্যবহার ও ব্যঞ্জনার সন্ধান আগে পাইনি। বিশেষ্যকে ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত করার কৌশলটি আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করত। বেশ কিছুদিন অমিত্রাক্ষর ছন্দে ও মাইকেলের ভাষায় নানাজনে কবিতা লেখার চেষ্টা করতে লাগল। আবার কেউ কেউ তার প্যারোডিও করতে থাকল। যেমন, একদিন দেখা গেল ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা, "টেবিলিলা সূত্রধর বাটালিয়া কাঠ"। এটা কারো নিজস্ব সৃষ্টি, না কোনো মাইকেল-সমালোচকের উদ্ধৃতি, জানতে পারিনি। জনার্দনবাবু গম্ভীরভাবে ডাস্টার দিয়ে লেখাটি মুছে পড়াতে শুরু করলেন।

এই অসাধারণ শিক্ষকের আর একটি কাহিনির কথা উল্লেখ করব, যদিও তার সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম না। ওঁর ক্লাসে পারতপক্ষে কেউ অনুপস্থিত থাকত না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, ক্লাসে সামান্য গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে বসে আছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন যে, ছেলেরা আজ কফি হাউসে জমায়েত হয়েছে কোনো বিশেষ কারণে মিটিং জাতীয় কিছু একটা করতে এবং বলাবাহুল্য, তৎসহ আড্ডা ও কফি-পকোড়া সাঁটতে।

জনার্দনবাবু সহসা অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারটি তুলে নিয়ে ক্লাসে উপস্থিত ছেলেমেয়েদের বললেন, "বাবারা! মা লক্ষ্মীরা! আমার সঙ্গে এসো তো, আমি আজ কফি হাউসেই ক্লাস করব!"

এই বিচিত্র প্রসেশনটি কফি হাউসের দরজা দিয়ে হলের ভেতর ঢুকতেই সারা হল স্তম্ভিত! ক্লাস-পালানো ছাত্ররা লাফিয়ে উঠে এককেটি স্ট্যাচু হয়ে গেল, হাতের সিগারেটগুলো পটাপট ছিটকে গেল টেবিলের তলায়!

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জনার্দনবাবু বললেন, "তোমাদের যখন ক্লাসের পরিবর্তে কফি হাউস এতটাই বাঞ্ছনীয়, তখন এইখানেই ক্লাস করব। সব বসে পড়ো।"

ছাত্রদের কারো মুখে বাক্যস্ফূর্তি নেই।

বঙ্গসন্তানদের বীরত্ব এবং সাহস সেকালে আজকালকার মতো উচ্চকোটিতে পৌঁছোয়নি। ডানপিটে ডাকাবুকো ছেলে সেখানেও উপস্থিত ছিল দু-একজন, কিন্তু কারোরই হিম্মত হল না যে অধ্যাপকের জামার কলার খামচে ধরে জিজ্ঞাসা করে "আমি ক্লাস না-করলে আপনার পিতৃদেবের কী?" রোলকলে বিশেষ সাড়া না-পেয়ে জনার্দনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হল?" এতক্ষণে একজনের মুখে কথা ফুটল, "অন্যায় হয়ে গেছে স্যার, ক্ষমা করে দিন। আমরা সব ক্লাসে যাচ্ছি।"

অতএব, মিছিলটি দৈর্ঘ্যে অনেক লম্বা হয়ে কফি হাউস থেকে বেরিয়ে আবার কলেজের ক্লাসরুমে ঢুকল।

এই পর্বটি লেখবার সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের কিছু ছবি তোলার আকাঙ্ক্ষায় গিয়েছিলাম। মাস্টারমশাইয়দের কমনরুমে ঢুকতেই মনে পড়ে গেল মোটামুটি

কোনখানটায় জনার্দনবাবু বসতেন। বলা বাহুল্য, সে-জায়গা এখন খালি। উলটোদিকে দেয়ালে চোখ পড়তেই নজরে এল—জনার্দনবাবু ছবির ভেতর থেকে প্রসন্ন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

জনার্দনবাবুর পরেই বাংলা বিভাগে ছিলেন আরো দুই দিকপাল—হরপ্রসাদ মিত্র এবং দেবীপদ ভট্টাচার্য। এঁদের কাছেও পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়বার পরেও নানা ব্যাপারে অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের স্নেহচ্ছায়া লাভ করেছি।

আরেকজন স্মরণীয় অধ্যাপক ছিলেন খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অঙ্কের দিকপাল। ক্লাসের কোনো ছেলের কথা বলা দূরে থাক, দৃষ্টি বিন্দুমাত্র বিপথগামী হলেই সেটা তাঁর চোখ এড়াত না। আমাকে তিনি প্রথমবার সম্ভাষণ করেছিলেন এই বলে : "Now, now, my boy! I want your undivided attention."

তীক্ষ্ণ গলায় উচ্চারিত তাঁর এই কথাটি ক্লাসের বাইরে থেকেও শোনা যেত প্রায়ই। শুনেই লোকে বুঝতে পারত ভেতরে খগেনবাবুর ক্লাস চলছে। তাঁর কিছু কিছু তিরস্কার খুবই রসিকতাসমৃদ্ধ ছিল। কেউ দেরি করে ক্লাসে এলেই বলতেন, "You are too early for the next class!" একটি ছেলে একদিন এক সহপাঠিনীকে অঙ্কের একটি অংশ বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল, তাকে বললেন, "Physician! Heal thyself !"

উত্তরকালের বহু অঙ্কশাস্ত্রে-ব্যুৎপন্ন ছেলের ভিত দৃঢভাবে তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি। ক্লাসের বাইরে এবং ছাত্রাবস্থার পরেও তিনি ছাত্রদের প্রত্যেকের খোঁজ রাখতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পরেও তাঁর কাছে নানা ব্যাপারে সাহায্যের জন্য গিয়েছি, তাঁর দরজা সবসময়েই আমাদের জন্য খোলা থাকত। পাটনা রেডিওতে প্রোগ্রাম করতে যাব শুনে পাটনায় তাঁর বন্ধু রঙিন হালদার নামে এক ভদ্রলোকের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে একটি চিঠি দিয়ে দেন তিনি। তাতে লেখা ছিল, হালদার মশায় যেন সর্বপ্রকারে আমার দেখাশুনা করেন। পঁচানব্বুই বছর বয়স অবধি বেঁচে ছিলেন। চোখ এবং কানের সামান্য দুর্বলতা ছাড়া কোনোপ্রকারের শারীরিক বিকার ছিল না। সমগ্র শিক্ষকজীবনে যে হাজার হাজার ছাত্রকে তিনি পড়িয়েছেন, তিরিশ চল্লিশ বছর বাদে তাদের দেখামাত্র চিনতে পারতেন এবং নাম ধরে সম্বোধন করতেন।

এ ছাড়া ইংরেজির অধ্যাপনায় ছিলেন তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সংক্ষেপে টি পি এম), আমার পিতৃবন্ধু সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, তারক সেন, সোমনাথ মৈত্র। রসায়নে প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত, প্রফুল্লকুমার দত্ত। পদার্থবিদ্যায় কুলেশচন্দ্র ধর, রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত, ব্রজেন সেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলাবিশ প্রেসিডেন্সি কলেজেরই ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের একটি ঘরে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের গোড়াপত্তন করেন। শিক্ষাজগতের ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁর নাম কোনোদিনই মুছে যাবে না।

কলেজজীবনে সাবালকত্ব পেতে হলে যে-কয়েকটি ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী, তার মধ্যে একটি হল সিগারেট খাওয়া আর একটি হল প্রক্সি দেওয়া। দুটোর কোনোটাতেই আমি খুব জুত করতে পারিনি। ধাক্কা খেয়েছিলাম

ভীষণভাবে। প্রথম সিগারেটে টান দিয়ে, বিষম খেয়ে, দমবন্ধ হয়ে মরবার উপক্রম।

আর প্রক্সি? ফিজিক্সের ক্লাসে একদিন অধ্যাপক ব্রজেন সেন পড়াতে এসেছেন। রোলকল হচ্ছে। একটি বিশেষ নম্বরে কেউ সাড়া দিল না, সে-নম্বরটা আমি মনে রেখে দিলাম। ব্রজেনবাবুর অভ্যাস ছিল, একবার রোলকল হয়ে গেলে অনুপস্থিত নম্বরগুলো আর-একবার ডাকা। সেই নম্বরটি যেই তিনি দ্বিতীয়বার ডেকেছেন, আমি বলে উঠেছি, "Yes sir"। ব্রজেনবাবু সঙ্গে সঙ্গে খাতা থেকে মুখ তুলে বললেন, "অ্যাঃ! কে সাড়া দিল? দেখি দেখি উঠ একবার মুখখান দেখি!" বলা বাহুল্য, উনি বাঙাল ছিলেন এবং কথাবার্তায় সেটা বোঝা যেত।

আমার উঠে দাঁড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। ব্রজেনবাবু মৃদু হেসে বললেন, "প্রক্সি দিবা? এখনো হাড্ডি পাকে নাই! তোমার নাম কি শ্রীমতী রীণা গুহ?" সমস্ত ক্লাস হো-হো করে হেসে উঠল। আমার দু-কান লাল, ধপ্ করে বসে পড়লাম। ক্লাসের পরে গিয়ে মাপ চাইতে বললেন, "আমি মোটেও রাগি নাই! তোমার অল্পবুদ্ধিতা এবং দুর্দশা এনজয় করত্যাছিলাম মাত্র।"

উত্তরকালে ব্রজেনবাবুর বাড়ি অবধি ধাওয়া করেছি পড়াশুনো নিয়ে। তিনি হাসিমুখে অক্লান্তভাবে সাহায্য করেছেন, বিনিময়ে একটি নয়া পয়সাও প্রত্যাশা করেননি।

কো-এডুকেশন চালু থাকলেও প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের ক্লাসে সহপাঠিনীরা ছিলেন সংখ্যায় খুবই অল্প। আশিজনের ক্লাসে মোটে দুজন! তাঁদের একজন অসম্ভব রকমের ফরসা, অন্যজনকে ভগবান ততটা দয়া করেননি—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণও বলা মুশকিল। একটা আলাদা বেঞ্চে তাঁরা পাশাপাশি বসতেন, আর আমরা বলাবলি করতাম, "আহা! যেন পূর্ণিমা আর অমাবস্যা পাশাপাশি বসেছে রে!"

আলাদা বেঞ্চে বসলেও সহপাঠীদের মধ্যে তাঁদের যথাসম্ভব নৈকট্য বিশেষভাবে কাম্য ছিল। কাছাকাছি বেঞ্চে বসবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। অনেকে, এমনকী টিফিন পিরিয়েডেও, তাঁদের নির্দিষ্ট বেঞ্চের পেছনে গিয়ে বসে থাকত—এসপ্ল্যানেড থেকে কালীঘাটের দিকে যেতে গেলে কেউ কেউ যেমন উলটোমুখী ডালহৌসিগামী ট্রামে চড়ে বসেন সুবিধামত সিট পাবার মতলবে।

স্কটিশ চার্চ কলেজে সহপাঠিনীর এবংবিধ দুর্ভিক্ষ ছিল না। সেখানে তাঁরা তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক ছিলেন বলে স্কটিশ চার্চের ছাত্রদের প্রতি আমাদের ছিল তীব্র ঈর্ষা। স্কটিশে পাঠরত দু-একজন বন্ধুর সাহায্যে অনেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সেখানকার ক্লাসও করেছে দুর্দমনীয় জ্ঞানপিপাসার ছল করে। বড়ো বড়ো গ্যালারিসম্বলিত লেকচার হলগুলিতে ধরা পড়বার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম, মাস্টারমশাইয়রাও এ-বিষয়ে অত কড়া ছিলেন না।

এখনকার স্কুলে-কলেজে কিশোর-কিশোরীদের সহজ সান্নিধ্য ঘনীভূত হতে হতে পারস্পরিক সম্বোধনটা যেমন অল্পকালের মধ্যেই তুই-তোকারিতে পর্যবসিত হয় (এবং অনেকক্ষেত্রে প্রেমঘটিত বিবাহের পরেও সেটা বজায় থাকে), তখনকার দিনে সেটা অকল্পনীয় ছিল। আপনি থেকে তুমিতে উত্তরণ (না কি অধঃপতন!) নিতান্ত দুঃসাহসিক

কাজ বলে পরিগণিত হত এবং কোনো ছেলেমেয়ের মধ্যে এই অঘটন ঘটলে আমরা ধরে নিতাম, প্রজাপতির নির্বন্ধ সমাসন্ন! কফি হাউসে নিয়ে যেতে পারলে তো কথাই নেই, পৃথ্বীরাজের সংযুক্তাকে ঘোড়ায় উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবার মতো বীরবত্তা ছিল সেটা! অধিকাংশ ছেলেদের এতটা হিম্মত হত না কখনই। কাঙ্ক্ষিতার সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের চোখাচোখিব আশায় দুরুদুরু বক্ষে তাদের কমনরুমের আশেপোশে ঘোরাফেরা এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে সেই দুর্লভ স্বপ্নময় সময়টুকু উদ্দেশ্যহীন হিজিবিজি সংলাপে কাটিয়ে দেওয়া, সেদিনকারই কোনো ক্লাসের পাঠ্যবিষয়ের আড়াল দিয়ে। আরো ভাগ্যবান হলে, অনুনয়-বিনয় করে কোনোমতে সহপাঠিনীর সঙ্গে ক্লাসনোট আদানপ্রদান করতে পারলেই একেবারে মালাবদলের রোমাঞ্চ!

পাঠকের হয়তো কৌতূহল হবে, বর্তমান কথকের ছাত্রজীবনে কোনো রোমান্সঘটিত ব্যাপার ছিল কি না বা হয়েছিল কি না। উত্তরে বলি, আমার বয়েসি আর পাঁচটি ছেলের মধ্যে যে-সব কল্পনা-বাসনা নানা রঙয়ের ঊর্ণজাল বুনতে পারে, আমি মোটেই তার বাইরে ছিলাম না। কিন্তু সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। পর্যাপ্ত সময়, শৌর্য এবং দক্ষতা থাকলে আকাঙ্ক্ষাকে নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত করতে পারতাম। আজ সত্তরের গণ্ডি পেরিয়ে প্রেম-প্রণয় ইত্যাদির সম্বন্ধে যে উপলব্ধিতে এসে দাঁড়িয়েছি, তা হল : প্রথম পর্যায়ে মনুষ্যশাবক যাকে প্রেম ভেবে আহ্লাদে গড়াগড়ি খায়, তা হল নিতান্তই শরীরের মধ্যে হরমোনের লম্ফঝম্প। এই অবস্থায় সে রাস্তায়-ঘাটে ট্রামে-বাসে দিনের মধ্যে একশোবার প্রেমে পড়তে পারে এবং পাত্রী হতে পারে সুন্দরী অভিনেত্রী থেকে শুরু করে প্রখর-যৌবনা পরিচারিকা যে কেউ! দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাপারটি আরেকটু পরিশীলিত হলে তাতে কয়েক চামচ কাব্যরস গুলে যা তৈরি হয়, তা হল মহামতি পরশুরামের ভাষায় চাঁদের সরবত! এবং অন্তিম পর্বে মানুষেব যে চৈতন্যোদয় হয় সেটার বর্ণনা করতে গেলে আবার পরশুরামেরই শরণ নিতে হবে : প্রেমে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ঘোল আরো উপকারী!

সকাল দশটা বাজে। ট্রাম থেকে নেমে প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের কাছাকাছি পৌঁছেছি, হঠাৎ চারিদিক থেকে "আরে-রে-রে গেল-গেল" রব উঠল। তাকিয়ে দেখি লোকজন এদিক-ওদিক পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে, দু-একজন 'থ' হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা ফাইটার প্লেন কাটা ঘুড়ির মতন লাট খেতে খেতে নেমে আসছে, দেখেই বোঝা যায় তার আর নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। যেভাবে নেমে আসছে, আমাদের ওপরেই আছড়ে পড়বে, নয়তো কলেজ বিল্ডিং-এ ধাক্কা খাবে।

চলৎশক্তিহীন হয়ে তাকিয়ে রইলাম সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিকে—গহন জঙ্গলে একটা বাঘকে ছুটে আসতে দেখলে লোকে যেমন পাথর হয়ে যায়, সেইরকম।

কিন্তু না, আমাদের ওপরে পড়ল না, মেইন বিল্ডিংয়েও ধাক্কা খেল না। কাটা ঘুড়ির গতিপথ দেখে যেমন ঠিক বোঝা যায় না শেষ অবধি কোথায় পড়বে, সেইরকম টলতে টলতে কলেজ বিল্ডিং ছাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে বেকার্স ল্যাবরেটরির বাড়ির ওধারে বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বাড়ির কোণার ওপরে।

ছুটলাম কী হয়েছে দেখতে।

ট্রপিক্যাল স্কুল বিল্ডিং-এর একটা কোণায় প্লেনটা গিয়ে লেগেছে, তার একটা ডানা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে ট্রেনে কাটা হাত বা পায়ের মতো, বাকিটা দুমড়ে মুচড়ে জ্বলছে। পাইলট বেচারি হয়তো শেষ অবধি প্লেনটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, ফলস্বরূপ সেও ককপিটের মধ্যে চুরমার হয়ে জ্বলছে। দমকল এসে আগুন নেভাতে লেগে গেল। পুলিশ এসে ভিড় হাঁকিয়ে দিলে।

ঘটনাটা একটা বিশাল পাথরের মতো চেপে রইল সারাদিন। ছাত্রেরা, মাস্টারমশাইরা কেউই আর পড়াশুনোয় মন দিতে পারলেন না। ক্রমে নানারকম খবর এবং দুর্ঘটনার কারণ কানে আস্তে লাগল। এয়ারফোর্সের দুটি টেমপেস্ট ফাইটার একসঙ্গে খুব কাছাকাছি ওড়ার মহড়া দিচ্ছিল। হঠাৎ নাকি একটার সামনে একটা উড়ন্ত শকুন বা চিল এসে পড়ে। আজকালকার ফাইটার প্লেন হলে (যার গতিবেগ ঘণ্টায় দেড় হাজার মাইলের কাছাকাছি হতে পারে) আর দেখবার শোনবার সময় থাকত না। কিন্তু তখনকার ফাইটার প্লেন তিন-সাড়ে তিনশো মাইলের বেশি যেত না, বোঝা যেত সামনে কিছু পড়লে। সেই পাখির ধাক্কা থেকে বাঁচতে গিয়ে একটা প্লেন সামান্য বাঁক নেবার চেষ্টা করতেই অন্যটার সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। একটাকে পড়তে দেখলাম আমরা, আরেকটা পড়েছিল গিয়ে কেশব সেন স্ট্রিটে একটা গার্লস স্কুলের ওপর। তার পাইলট প্যারাশুট নিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল।

অনেকের হয়ত মনে হবে, একটা পাখিকে এড়াবার চেষ্টা কেন? তার তো রক্ত মাংসের শরীর আর প্লেনটা লোহা অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। লাগলে কী হত? পাখিটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত, প্লেনটার তো কিছু হবার কথা নয়? কিন্তু যন্ত্রবিজ্ঞান এবং বলবিজ্ঞান অন্য কথা বলে। পাখিটা নিশ্চিহ্ন হত ঠিকই, কিন্তু ওই ধাক্কায় প্লেনটিও ভালরকম জখম হত, বিশেষ করে প্রপেলারে লাগলে প্রপেলার ব্লেড ভাঙা অবধারিত ছিল। তাই হতভাগ্য পাইলটের সেই অন্তিম প্রচেষ্টা, যা কার্যকর হয়নি।

আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হতে লাগল। অন্য প্লেনের পাইলট তো দিব্যি প্যারাশুটে করে নেবে পড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে, এ কেন এইভাবে মরতে গেল? এও তো লাফিয়ে পড়ে বাঁচতে পারত?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। ধ্বংস যখন অনিবার্য, তখন নিমজ্জমান জাহাজের ক্যাপ্টেন বা পতনোন্মুখ উড়োজাহাজের পাইলট লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচালে কোনো দোষ নেই। কিন্তু বাস্তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা হয় না। জাহাজ বা উড়োজাহাজের চালক যন্ত্রটির সঙ্গে এমনভাবে একাত্মবোধ এবং আত্মসম্মানবোধে মিশে যান যে, শেষ মুহূর্ত অবধি তার থেকে নিজেকে আলাদা করার কথা ভাবতেই পারেন না, এ ঘটনা বহুবার ঘটেছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজের সঙ্গেই ডোবেন বা নিজেকে গুলি করেন শেষ মুহূর্তে। পাইলট, বিশেষ করে যাত্রীবাহী বিমানের পাইলটও শেষ অবধি ককপিটে থাকেন। কিন্তু আমাদের এই পাইলট তো একাই ছিল, তার ওপর আর কোনো যাত্রীর প্রাণ বাঁচাবার দায় ছিল না, তবে?

খবরের কাগজে জোর রিসার্চ চলতে লাগল এই নিয়ে। শেষকালে একজন বিশেষজ্ঞ মত দিলেন, এই পাইলটটি যখন বুঝতে পারল যে আর কিছু করার নেই, তখন শেষ চেষ্টা করছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের খেলার মাঠে পড়বার, যাতে বাড়িঘর-দোর পথচারীদের ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম হয়। যদিও মাঠে পড়েনি তবু এক হিসেবে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। তবে তাকে প্রাণ দিতে হল ককপিটে আটকে থেকে চুরমার হয়ে এবং আগুনে জ্বলে।

দুর্ঘটনার পরের দিন বাংলার ক্লাসে মাস্টারমশাই এসে বললেন, "তোমাদের একটা শোচনীয় খবর শোনাচ্ছি। কেশব সেন স্ট্রিটে যে প্লেনটা পড়েছিল, তাতে দুজন ছাত্রী মারা গেছে।"

"তারপরে আবো একটা শোচনীয় খবর আছে স্যার।" পেছনের দিকের বেঞ্চি থেকে কে একজন হঠাৎ বলে উঠল।

"কী খবর?"

"এই দুটি মেয়ের মারা যাবার খবর পেয়ে স্যার, দুটি ছেলে স্যার, কাল রাত্রে স্যার, সুইসাইড করেছে স্যার।"

দুঃসংবাদটির অন্তর্নিহিত ফাজলামিটা উপলব্ধি কবতে একটু সময় লাগল, তারপর চারিদিকে চাপাহাসির শব্দ। মাস্টারমশাই কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শুদ্ধ বাংলাভাষায় বললেন, "তুমি অবিলম্বে ক্লাস থেকে নিষ্ক্রান্ত হও। এদের সকলের সৎকার কার্য এবং শ্রাদ্ধ-শান্তি সম্পন্ন না-হওয়া পর্যন্ত আর এসো না।"

কলেজ জীবনে যে সমস্ত বাঁদরামি দেখেছি এবং কবেছি, তাকে মূলত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একটি হচ্ছে সবাক, সশব্দ বাঁদরামি, আরেকটি নিঃশব্দ, নির্বাক। দ্বিতীয় প্রকারটিতে পরিণত বুদ্ধিমত্তা একটু বেশি প্রয়োজন।

যে-সব মাস্টারমশাইয়ের পড়ানো তুলনামূলকভাবে নীরস এবং ক্লান্তি উদ্রেককারী ছিল, তাঁদের ক্লাসেই নষ্টামিটা বেশি হত। একদিন অঙ্কের ক্লাসের স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে হাতির শুঁড়ের মতো বড়ো বড়ো চিহ্ন এঁকে ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস বোঝাচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর নজরে এল, পিছনের একটি বেঞ্চিতে ছয়জনের মধ্যে দুজন নিম্নস্বরে গল্পগুজব করছে। বাকি চারজন ঘুমে আচ্ছন্ন।

ধমক দিয়ে তাদের চৈতন্য পুনরুত্থিত করে মাস্টারমশাই হুকুম দিলেন, "বেঞ্চিসুদ্ধ সবাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও।"

এ পর্যন্ত যা ঘটল তা যে-কোনো ক্লাসে যে-কোনো কালেই ঘটতে পারত। কিন্তু তার পরে যেটা ঘটল সেটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম। দণ্ডিত ছাত্ররা মাস্টারমশাইয়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল।

তারা নিঃশব্দে বেঞ্চিটাকে তুলে নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

পদার্থবিদ্যার ক্লাসের অধ্যাপক যখন মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব বোঝালেন, তখন অনিবার্যভাবেই নিউটনের আপেলের কাহিনি শোনালেন এবং শেষ করলেন এই রসিকতাটি করে "Show great respect to the apple before you chew it up–

it taught the theory of gravitation to Newton!"

কয়েকদিন বাদে এই অধ্যাপকের ক্লাস ফিজিক্স গ্যালারিতে। এই গ্যালারি বস্তুটি হচ্ছে এমন একটি কাঠের পাটাতনের তৈরি জিনিস, যাতে একদম পেছনের সারির ছাত্ররা বসে সব থেকে উঁচুতে, তারপরের বেঞ্চির সারিগুলি ধাপে ধাপে নেমে আসে। একদম সামনের সারির ছেলেরা সব থেকে নিচুতে বসে। দুপাশ দিয়ে এবং মাঝখান দিয়ে ওপরে যাবার পথ আছে।

ক্লাস চলছে. এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ—গুড় গুড় ঠক্, গুড় গুড় ঠকাং, ঠক্ ...। সবাই সচকিত হয়ে দেখার চেষ্টা করছে কী ব্যাপার, প্রফেসরও এদিক ওদিক তাকিয়ে শব্দটার উৎপত্তির কারণ বোঝবার চেষ্টা করছেন।

অবশেষে কারণটা বোঝা গেল। সামনের সারির একটি ছেলের পায়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল একটি আপেল। সেটাকে পেছন দিকের উঁচু থেকে গড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

একদম পেছন সারির থেকে একটি ছেলে দৌড়ে সামনে নেমে এল। কেউ কিছু বলবার আগেই মাটি থেকে আপেলটা কুড়িয়ে নিল, তারপর সেটাকে পরম ভক্তি সহকারে মাথায় ঠেকিয়ে তাতে একটা কামড় বসিয়ে ক্লাস থেকে উধাও হয়ে গেল।

সাহিত্যচর্চা আমাদের অনেককেই পেয়ে বসেছিল, এবং তার প্রশস্ত ময়দান ছিল ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ড। পরস্পরকে পাল্লা দিয়ে বা কাউকে ব্যঙ্গ করে আবোল-তাবোল কবিতা লেখা, কার্টুন আঁকা ইত্যাদি সবকিছুই ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর দিয়ে চালানো হত। টিফিন পিরিয়ডের পরে ক্লাসে ঢুকলেই দেখা যেত বোর্ডে কয়েকটা ছত্র লেখা আছে, অধিকাংশ লেখাই লিমেরিকধর্মী, কোনোটা মৌলিক রচনা, কোনোটা তখনকার প্রচলিত কোনো ব্যঙ্গরসবহুল পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি, কখনো কখনো তাতে দু-এক লাইন নিজের সংযোজন।

এই সময়ে আমি প্রথম রেডিও প্রোগ্রাম করি। আমার যা চিরকালের কীটদষ্ট বরাত, পনেরো মিনিটের প্রোগ্রামে বেশ কয়েকবার যন্ত্রের তার ছিঁড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে এবং তার জন্য গুরুদেবের কাছে ভালোরকম আড়ংধোলাই খেয়ে ব্যাপারটার ইতি হয়—সে-কথা আগেই বলেছি।

পরেরদিন ক্লাসে গিয়ে দেখি ব্ল্যাকবোর্ডে আমার ছবি, সরোদ-শুদ্ধ। তার ছিঁড়ে গলায় জড়িয়ে আছে, মাইক্রোফোনের ওধারে তবলিয়ার চোখ ছানাবড়া। ছবিটার তলায় ক্যাপশান দেওয়া আছে "সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস, ছিঁড়িল তার?"

কলেজের পাঠ্যক্রমে আমি অ্যাডিশনাল বিষয় হিসেবে অঙ্ক না নিয়ে বায়োলজি নিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য একটাই, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যদি জায়গা না পাই, ডাক্তারিতে চেষ্টা করতে হবে। আমার ম্যাট্রিকের সময়ের মাস্টারমশাই সুধীরবাবু আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ভদ্রলোকের সাবজেক্ট না নিয়ে আমি শেষমেষ কসাইদের সাবজেক্ট নিলাম, অর্থাৎ প্রথমে ব্যাঙ, গিনিপিগ এইসব কাটাকাটি, পরে শবদেহ।

অনিবার্যভাবে একদিন বায়োলজির প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ব্যাঙ কাটার সময় সমুপস্থিত হল। জন্তুটি নিতান্ত নিরীহ, তবু তার চেহারা এবং চলাফেরা দেখে তার প্রতি আমার একটা তীব্র ঘেন্না ছিল। তবু তার নিবিড় সান্নিধ্যে আসতেই হল।

প্র্যাকটিকাল ক্লাসের এককোণায় একটা বিরাট কাঠের বাক্সে জ্যান্ত ব্যাঙ রাখা থাকত। দপ্তরি তার কয়েকটিকে ধরে একটা বড়ো কাচের জারে ফেলে দিল, তারপরে ক্লোরোফর্মে ভেজানো একটা তুলো তার মধ্যে ফেলে দিয়েই মুখটা ঢাকা দিল। আমরা বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগলাম, ব্যাঙগুলো একটু লাফালাফি করে নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

সামনে রাখা ছিল সারি সারি ট্রে। তাতে দেড় ইঞ্চি পুরু মোম জমানো আছে। তার ওপর থুপথুপ করে এক-একটি অচৈতন্য ব্যাঙ ফেলে দেওয়া হল, ঠিক যেন বিয়ে বাড়িব কলাপাতে বেগুনভাজা পড়ল। এবার কী করা?

প্রফেসরের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাঙকে চিৎ করে মোমের ওপর রাখা হল, তার দুটি হাত এবং দুটি পা টেনে চারদিকে বিছিয়ে মোমের ওপর আলপিন দিয়ে হাত পায়েব পাতাগুলি গেঁথে দেওয়া হল। বুকের চামড়া কেটে টেনে ফাঁক কবতেই দেখা গেল হার্ট ধুপপুক করে নড়ছে, তার কাজ করে চলেছে।

পেট থেকে বমি ঠেলে উঠে এল, দৌড়ে বাথরুমে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ বাদে চোখেমুখে জল দিয়ে যৎকিঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়ে ফিরে আসতেই দেখি, প্রবীণ প্রফেসর আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছেন। পরম স্নেহভরে আমার ড্যানা ধরে নিয়ে আবার ব্যাঙের ট্রের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, ''ওরকম প্রথম প্রথম অনেকেরই হয়। আপাতত কিছুক্ষণ ব্যাঙের পেটের দিকে তাকিয়ে থাকো, তারপর সাহস বাড়লে এবং নিজের পেট-গুলোনো কমলে ব্যাঙের শরীরটা একটু ছোঁও, তারপরে হাত বুলোও, গা ঘিনঘিন কবলে আবার গিয়ে বমি করে এসো, দেখি কতবার বমি করতে পার, নিজের পেট একদম খালি হয়ে গেলে ব্যাঙের পেটে আঙুল দিয়ে নাড়িভুড়ি একটু একটু ঘাঁটতে থাক, তারপর...''

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, ''পারব না স্যার!''

''পারবে, পারবে, আলবাৎ পারবে। আমার কাছে এই ল্যাবরেটরিতে কত শত ডাকসাইটে সার্জন ছুরি ধরতে শিখল। অনেকেই পেটচেরা ব্যাঙ দেখে চোখ উলটিয়ে ভিরমি গেছিল। পরে সব ঠিক হয়ে গেল, তোমারও হবে, আরো বলছি, আজ রাত্রে হয়তো ভাত খেতে পারবে না, বিশেষ করে পাতে বড়ো সাইজের বেগুন ভাজা, বেগুন পোড়া, এসব নিও না। কিন্তু দু-চারদিন পরেই দেখবে ওই ব্যাঙের পেটঘাঁটা আঙুল দিয়েই কফি হাউসে চপ-কাটলেট-চিপস-পাকৌড়া কপাকপ মুখে পুরছ, ভালো করে অ্যালকোহল দিয়ে হাত ধোওয়ারও তর সইবে না।''

হলও ঠিক তাই। জ্ঞানবৃদ্ধ প্রফেসরের অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি প্রমাণিত হল।

এখানেই কিন্তু ব্যাঙ-কাহিনির সমাপ্তি নয়। ব্যাঙের আরো নিবিড় সান্নিধ্য উপভোগ করার সুযোগ হল দশ বারো বছর পরে, তখন আমি ইংল্যান্ডে ট্রেনিং নিতে গিয়ে ছুটিতে ইউরোপ ঘুরে বেড়াচ্ছি। ট্যাঁকের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। যে-দেশেই যাচ্ছি সে-দেশের এক টাকাতে ইয়ুথ হোস্টেলে রাত্রিবাস এবং পরদিন সকালে মোটা মোটা পাউরুটি ও কফি দিয়ে পেট ভরিয়ে পথ পরিক্রমা। গরিব ছাত্রদের এই পরম উপকারটি করেছিলেন

হিটলার, যাকে পৃথিবীর লোকে নির্মম অত্যাচারী বলেই শুধু জানে। তিনি এই ইয়ুথ হোস্টেল ধারার প্রবর্তক।

দিনেরবেলায় অধিকাংশ দিন পেটে কিল মেরে উপোস, তাতে কোনো দুঃখ নেই, কারণ প্রাণে অফুরন্ত উল্লাস। তখন প্যারিস শহর দেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সন্ধেবেলায় একটি পথের ধারের ধাবা-জাতীয় রেস্টুরেন্টের শরণ নিলাম। কিন্তু কী খাব কী করে ঠিক করি? অবোধ্য ফরাসি ভাষায় সব মেনু লেখা, ওয়েটার বার দুয়েক ঘুরে গেল, আমি গম্ভীরভাবে মেনুই পড়ছি আর সব থেকে কম দামের কী পাওয়া যায় খুঁজছি। শেষে ঠিক আমার পাশের টেবিলে বসা এক দম্পতির সামনে দুটি প্লেট এসে নামল, তাতে দেখলাম সেদ্ধ করা গাজর আলু মটরশুঁটি বিন ইত্যাদির মধ্যিখানে মাঝারি সাইজের একটা মুরগির ঠ্যাং শোভা পাচ্ছে।

আর লোভ সামলাতে পারলাম না। ইশারায় ওয়েটারকে জানিয়ে দিলাম, পাশের টেবিলের ওই খাবারই আমার চাই। খেতে অতি উপাদেয় লাগল। বিলটা সযত্নে পকেটে রেখে দিলাম, পরে এই খাবারের নামটা আবার অন্য কোথাও কাজে লাগতে পারে।

কাজে লাগল একেবারে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে। ল্যান্ডলেডি বুড়িকে ঠাট্টা করে বললাম, "তোমরা ওরকম মুরগি রাঁধতেই পারবে না।" সে জানতে চাইল পদটির নাম কী। পকেট থেকে বিলটি বার করে দিতেই তার চোখ কপালে উঠে গেল। বলল, "আমাকে বাজার থেকে গোটা কতক বড়ো সাইজের ব্যাঙ এনে দাও। জ্যান্ত এনো না, ছাড়িয়ে টুকরো করে এনো। দ্যাখো আমি ওরকম রাঁধতে পারি কি না!"

দ শ ম প রি চ্ছে দ
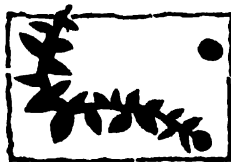
পঁচিশ নম্বর ডিক্সন লেন

শেয়ালদা স্টেশনের অদূরেই দক্ষিণে সার্কুলার রোডের ওপর প্রাচী সিনেমা। এখন টেলিভিশনেব উপদ্রবে কিঞ্চিৎ বিগতযৌবনা মলিনবসনা হলেও তখন তাব চেহারা ছিল খুবই ঝলমলে। তারই পাশ দিয়ে সরীসৃপ গতিতে এঁকেবেঁকে চলে গেছে একটি অপরিসর রাস্তা, নাম ডিক্সন লেন।

এই সাবেকি বাঙালি-পাড়ায় ডিক্সন সাহেবের নামে কেন রাস্তা হয়েছিল বা তিনি কে ছিলেন কিছুই জানি না। কিন্তু শুধু আমার নয়, তখনকার অনেক সংগীতপিপাসুর কানেই ডিক্সন লেন নামটা একটা সাংগীতিক ঝংকারের সৃষ্টি করত। কাবণ এরই পঁচিশ নম্বর বাড়িতে থাকতেন সংগীতজগতের মহীরূহ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। বাড়িটি করেছিলেন ডোয়ার্কিন কোম্পানির মালিক দ্বারিকানাথ ঘোষের পুত্র কিরণচন্দ্র ঘোষ। তাঁর চার ছেলে। বড়ো জ্যোতিপ্রকাশ ব্যবসা এবং বাড়ি-ঘরদোর সামলাতেন। মেজো ইন্দুপ্রকাশ ছিলেন বড়ো স্পোর্টসম্যান। তারপরের ভাই জ্ঞানপ্রকাশ। তাঁর সাংগীতিক কর্মকাণ্ডের কথা আজ সারা পৃথিবী জানে, কিন্তু আর দু-একটা দিক হয়তো সকলের জানা নেই। তিনি ছিলেন পালিভাষায় সুপণ্ডিত, বি.এ. পরীক্ষাতে প্রথম হয়েছিলেন এই ভাষায় অনার্স নিয়ে। এবং দক্ষ ফুটবলার ছিলেন। ফুটবল খেলতে গিয়ে একটি চোখ আঘাত লেগে নষ্ট হয়ে যায়, তখনকার চিকিৎসা ব্যবস্থায় তার আর মেরামতি সম্ভব হয়নি। সুতরাং পড়াশুনার দিকে আর না এগিয়ে তিনি সংগীতের দিকে মন দেন। ঘটনাটি কষ্টকর হলেও সংগীতজগতের এক বিরাট সৌভাগ্যের সূচনা করে। ছোটোভাই চারুপ্রকাশ ওঁদের ডালহৌসি স্কোয়ারের বিশাল দোকান 'রেডিও সাপ্লাই স্টোর্সে'র কর্ণধার ছিলেন, আর ছিলেন অভিনয়ে সুদক্ষ। সত্যজিৎ রায়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র। 'অভিযান', 'কাপুরুষ ও
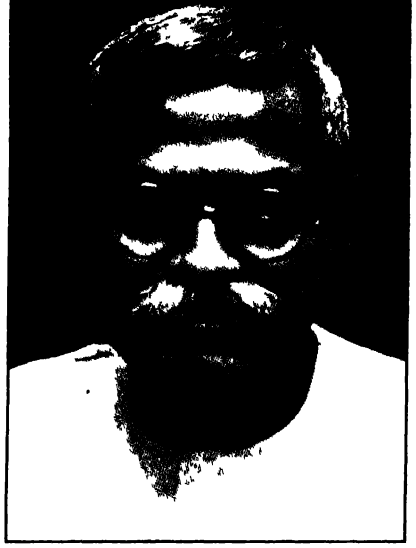
জ্ঞানবাবুব ভাই চাকপ্রকাশ ঘোষ

জ্ঞানবাবুব বাবা কিবণচন্দ্র ঘোষ

মহাপুরুষ' ইত্যাদিতে যাঁর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে।

জ্ঞানবাবুরা চারভাই একত্রে এই বাড়িতে বেড়ে উঠেছিলেন। পরে পরিবার বাড়লে বড়োভাই জ্যোতিবাবু এবং মেজোভাই ইন্দুবাবু বাড়ি করে অন্যত্র চলে যান, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ সন্তানসন্ততি তখনো এই বাড়িতেই থেকে মানুষ হয়েছিল। একান্নবর্তী পরিবাবের ছেলেমেয়েরা কতটা আনন্দে বাল্য এবং কৈশোর অতিবাহিত করতে পারে তার একটা দৃষ্টান্তস্থল ছিল পঁচিশ নম্বর ডিক্সন লেন। আর আমার শৈশব ও বাল্যকাল একা-একাই কেটেছিল বাবার বদলির চাকরির জন্য, ছিল একটামাত্র ভাই। কবে জানি না জ্ঞানপ্রকাশ আমাকে 'চলো তোমায় এ বাড়ির পল্টনের মধ্যে ঢুকিয়ে দি' বলে নিয়ে গিয়ে তাঁর বাড়িব অন্দরমহলে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে ওখানে জমে উঠল আমার বরাবরের আড্ডা।

জ্যোতিবাবুর ছেলে অশোক, ইন্দুবাবুর ছেলে দিলীপ (দুলু), এদের পিসতুতো ভাই ক্রিকেটার অসীম শূর (কুটু, উত্তরকালে বাংলা ক্রিকেটে একটি প্রসিদ্ধ নাম), তার দুই বোন শিপ্রা (কনি) ও রত্না (ঝুনি) এবং আর এক পিসিমার মেয়ে বাণী সরকার, পরে বাণী কোনার। বাণীদি অসাধারণ সুকণ্ঠী ছিলেন। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের রচিত অনবদ্য বাংলা গানগুলি তাঁর কণ্ঠের মাধ্যমেই প্রসিদ্ধিলাভ করে। এ ছাড়া ছিল চারুপ্রকাশের দুই ছেলে সুবীর (বাবলা) ও প্রবীর (মন্টি), তারা তখন খুবই ছোটো। বাবলা বয়সানুপাতে অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো কথা গম্ভীরভাবে বলত আর মন্টির সারাদিনের অবস্থান ছিল একটি ট্রাই-সাইকেলের ওপর।

এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের বর্ণময় প্রাত্যহিক জীবনের একটি দিনের ঘটনা। চরিত্রগুলির সঙ্গে পাঠকদের এইমাত্র পরিচয় হয়েছে।

একদিন রবিবার সকালে ওখানে গিয়ে দেখি, যুদ্ধ বেধে গেছে তেতলায়। টেবল টেনিসের যুদ্ধ। একদিকে দুলু, আরেক দিকে কুটু। এমনিতে বেশ ভালোভাবেই 'ফ্রেন্ডলি' ম্যাচ চলছিল, হঠাৎ দুলু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "তোকে আজ সারাদিন ধরে হারাব। বার বার হারাব।"

তৎক্ষণাৎ ম্যাচের মেজাজ বদলে গিয়ে একেবারে রণক্ষেত্র। অন্যান্য ভাইবোনেরা দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে দেখছে কী ফলাফল হয়। কুটু তুলনায় একটু স্বল্পভাষী, ও শুধু একবার 'বেশ' বলে নেমে পড়েছে।

একপাশে দাঁড়িয়েছিল চারুপ্রকাশের বড়ো ছেলে সুবীর ওরফে বাবলা। এই ম্যাচের ফলাফলের প্রতি তার কোনোই আকর্ষণ নেই, তার বদলে নিজে একবাব খেলবার ধান্দা, কিন্তু দাদারা কি তার কথা শোনে! সে বারবার বলছে ম্যাচেব মধ্যে একটা হাফটাইম দিয়ে দেওয়া হোক, যখন সে আর কনিদি একবার একটু খেলবে। দুলু হুংকার দিয়ে উঠল, এটা ফুটবল খেলা নয় যে হাফটাইম দেওয়া হবে। ম্যাচ ভীষণ তেজে চলতে থাকল, একটা শেষ হচ্ছে তো পরেরটা তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে যাচ্ছে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যেন খ্যাপা ষাঁড়, চোখমুখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

বাবলা তার মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ নিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে দাদাদের এই নির্দয় ব্যবহারের কীভাবে প্রতিবাদ করা যায়। হঠাৎ তার সুযোগ এসে গেল। একজনের মারে পিংপং বলটা টেবিলের একপাশে ঠিকরে পড়তেই বাবলা সেটাকে তুলে নিয়ে দে ছুট।

দুলু এবং কুটু রে-রে করে তাকে ধাওয়া করে গেল। খানিকক্ষণ ছুটোছুটির পর বাবলা হঠাৎ দাঁড়িয়ে দুই হাত শূন্যে তুলে বলল, "নেই-নেই-নেই। আমার কাছে নেই। বিশ্বাস না হয় আমার শার্টপ্যান্ট খুঁজে দেখো!"

দাদারা তাকে সার্চ করতে গিয়ে প্রায় বস্ত্রহীন করে ফেলে আর কী! এই সময়ে কনি হঠাৎ ফিক করে হেসে উঠল। তখন বোঝা গেল বলটা বাবলা ওকে পাচার করে দিয়েছে। এবারে দাদারা কনিকে তেড়ে গেলেন, আর ঠিক সেই সময়ই সেদিনকার সব থেকে স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটল।

কনি পালাতে গিয়ে তার মাথায় ঠোক্কর লেগে বারান্দার ধারে তাকের ওপর ঝোলানো একটি টিয়েপাখির খাঁচা ঠিকরে গিয়ে তিনতলার থেকে একেবারে একতলার উঠোনে। ছোলা জল সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার, টিয়েপাখিটা খাঁচার ভেতরে ডানা ঝটপটিয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। জ্ঞানবাবু বললেন, "গেছে। একেবারে মরে গেছে।"

বাবলা অভয় দিয়ে বলল, "মোটেই মরেনি, দিব্যি বেঁচে গেছে। নইলে ওরকম চ্যাঁচায়?" অসাধারণ স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে!

বাণীদি ততক্ষণে একতলায় পৌঁছেছেন। খাঁচাটাকে সোজা করে টিয়েপাখিটাকে ধাতস্থ করে ধমক লাগালেন, "তোদের কি কোনো আক্কেল নেই? হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে কী করলি বল তো! ওর কী ভীষণ ব্যথা লেগেছে!"

অনতিদূরে জ্ঞানবৃদ্ধ বাবলা বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে ঘটনাপ্রবাহ নিরীক্ষণ করছিল। এইবার বলল, "ব্যথা টিয়েপাখিটার লাগবে কী করে? ও তো খাঁচার

অসীম শূর (কুট্টু)

অশোক ঘোষ

বাণী কোনার

ভেতরে ছিল! ব্যথা লেগে থাকলে লেগেছে খাঁচাটার!"

বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং বাস্তববুদ্ধি মন্থন করে ওঠা বাবলার এই উক্তি সবাইকে থমকে দিল। কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। এরপরের ঘটনাগুলি নিতান্তই গৌণ।

আরেকজনের কথা খুবই মনে পড়ে, সে কুট্টু এবং কনির ছোটোবোন ঝুনি। তার আবার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল, সে একটু বিদ্রোহী ধাতের। কোনোপ্রকার কথাবার্তা বা ঘটনা তার বাঞ্ছনীয় দিকে না এগোলে তার প্রতিবাদ করবার রাস্তাগুলি অচিন্তনীয় ছিল। ঝুনির গানে খুবই প্রতিভা ছিল, যে-কোনো ধরনের গান একবার শুনে তৎক্ষণাৎ গলায় হুবহু তুলে ফেলতে পারত।

একদিন বেধে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। ঝুনি বেঁকে বসেছে, সে হোস্টেলে যাবে না। কিছুতেই যাবে না। সবাই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে শুনবার পাত্রী নয়। শেষমেশ চারতলায় চিলেকোঠার একটা ঘরের ছাদে গিয়ে বসে আছে। ছাদটা আবার সমতল নয়, দুদিকে ঢালু। একদিকে পা হড়কে পড়লে সোজা চারতলার থেকে এক্কেবারে নীচে পড়বে। চিন্তিত আত্মীয়স্বজন তিনতলার ছাদে ভিড় করে অনুনয়-বিনয় করছেন— ঝুনি অটল। 'হোস্টেলে পাঠাবে না বলো, তবে নামব।' কারো কথায় যখন কাজ হল না, তখন জ্ঞানবাবুর ছোটোভাই চারুপ্রকাশ একজন দারোয়ান সঙ্গে করে সেখানে উপস্থিত হলেন। ভীষণ ধমকে বললেন, "ঝুনি, নেমে এসো এক্ষুণি। আর সবাই ভয় পেলেও আমি পাচ্ছি না। এক্ষুণি যদি না নামো, আমি দারোয়ানকে ওঠাচ্ছি তোমায় ঠ্যাং ধরে টেনে নামাবে। পালাতে চাও তো চারতলার থেকে একতলায় লাফ দাও। দ্যাখো কী হয়!"

এবম্বিধ ব্যবস্থার আর নড়চড় হবে না বুঝতে পেরে ঝুনি নেমে এল। যুদ্ধের দ্বিতীয় কিস্তি শুরু করল হোস্টেলে গিয়ে। অনতিকাল পরেই হোস্টেলের ব্রাহ্ম শিক্ষয়িত্রীদের অসীম ধৈর্য ও তিতিক্ষায় চিড় ধরল। ঝুনির নামে নানা অনুযোগ আসতে লাগল— সর্বক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে, খায় না দায় না, ক্লাসে কেমন সর্বদাই অন্যমনস্ক। এতেও যখন বাড়ি ফেরত আনা হল না, তখন ঝুনি শেষ চাল চালল। বাড়িতে খবর পাঠাল, ওর কেবল বমি হচ্ছে, লাল বমি আর সবুজ বমি। সবাইর দুশ্চিন্তা, এ আবার কী হল!

আমি ততদিনে ওঁদের পরিবারের একজন হয়ে গেছি। আমি ওঁদের পরামর্শ দিলাম, মাস্টারদিদিদের বলতে ওর ওপর নজর রাখবার জন্য। সত্যিই ক'বার বমি করে, কীরকম বমি। আর ঝুনিকে যেন টেলিফোনে বলে দেওয়া হয়, লাল আর সবুজ বমি তেমন কিছু ভয়ের কথা নয়। এরপর যদি নীল আর হলুদ বমি হয় তবে যেন তৎক্ষণাৎ দিদিমণিদের দেখায়, তাঁরা আমাদের খবর দিলে তখন নিয়ে আসা যাবে। তখনকার মতো ঝুনি চুপ করে গেল। পরে নাকি বলেছিল, 'আমি তখনই বুঝেছি এটা বুদ্ধদার প্যাঁচ।'

ঝুনির অনেক গুণ ছিল, কিন্তু ওর এই পাগলামির কোনো সম্ভাব্য কারণ আমি বহু চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। বোধহয় ওর মনে একটা ক্ষোভ ছিল, আত্মীয়স্বজন এবং সারা পৃথিবীর কেউই ওর কথা, ওর কষ্ট, ওর দুঃখ বুঝতে পারে না।

সেই দুঃখ বুকে করে সে একদিন হঠাৎ অল্পবয়সে চলে গেল।

বাড়ির একতলায় সারাদিন কোনো-না-কোনো সাংগীতিক কর্মকাণ্ড চলছে। গান শিখছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, একটা ঘরে তবলার রেয়াজ চলছে, হয় কানাই দত্ত, নয় শিবপুরের মানিক পাল, নয় শ্যামল বসু, কিছুকাল বাদে শংকর ঘোষ। ভারতেব বড়ো বড়ো শিল্পীরা এ-বাড়িতে এসে থেকেছেন। রবিশংকর, আলি আকবর, স্বয়ং আলাউদ্দিন খাঁ এবং বড়ে গোলাম আলি খাঁ।

আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব ওখানে থাকাকালীন আমার গুরুজি রাধিকামোহন একদিন বাবা-মাকে এবং আমাকে নিয়ে গেলেন দেখা করবার জন্য। ঘরের মধ্যে একটি খাটে বৃদ্ধ ওস্তাদ বসেছিলেন, আর কোনো চেয়ার ছিল না। আমার মা ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করতেই ওস্তাদ খাট ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—"আসেন মা, বসেন মা, এইখানে বসেন মা," বলতে বলতে গায়ের চাদরটা খুলে নিয়ে মেঝের ওপর পেতে দিলেন। মা তো হতভম্ব। তিনি কিছুতেই ওই চাদরের উপরে বসবেন না, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবও ছাড়বেন না। খানিকক্ষণ এইভাবে টানাপোড়েন চলল। নিষ্পত্তিটা কীভাবে

দিলীপ ঘোষ

প্রবীর (মন্টি)
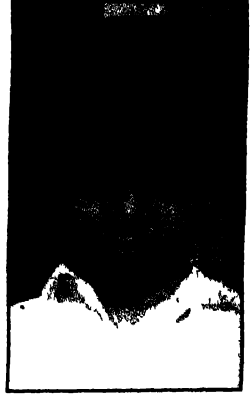
সুধীর (বাবলা)

জ্ঞানবাবুর বাড়িতে গাঙ্গুবাই হাঙ্গল, তবলায় কানাই দত্ত, হারমোনিয়ামে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

হল ঠিক মনে নেই। তারপরেই খাঁ সাহেব যন্ত্রটি টেনে নিয়ে বললেন, "কী বাজাইব মা, আদেশ করেন!"

এবার আমার মা বাস্তবিকই বাকশক্তি হারালেন। খাঁ সাহেব আবার বললেন, "বলেন মা, বলেন কী শোনবেন!"

সবশেষে মা বললেন, "কিছু বলবার ক্ষমতা আমার নেই, বাবা। আপনার মতন একজন বিরাট মানুষ আমাকে চাদর পেতে বসাচ্ছেন, কী শুনব জিজ্ঞাসা করছেন—আমি কি জেগে স্বপ্ন দেখছি? আমি আপনাকে রাগের ফরমাইস করব?"

"তবে মা, ইমন শোনেন। ইমন হৈল সকল রাগের মাতাপিতা।" এই বলে খানিকক্ষণ ইমনের আলাপ করলেন। তারপরে বললেন, "কুন দুষত্রুটি হৈয়া থাকলে মাপ কইর‍্যান মা!"

তারপর আমাকে দেখিয়ে আমার গুরুকে বললেন, "রাধুবাবা, অরে খুব শিখান, খুব শিখান।" আর আমাকে বললেন, "দাদু, খুব রেয়াZ্ কর, খুব রেয়াZ্ কর। রেয়াZ্ হৈল তপৈস্যা। তপৈস্যা।"

সেদিনকার মতন আলাউদ্দিন পর্বের সমাপ্তি ঘটল।

বাড়ি ফেরবার পথে মা গুরুদেবকে বললেন, "রাধুবাবু আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেছি। একেবারে ঋষিতুল্য লোক।" গুরুদেব উত্তর দিলেন, "ঋষিতুল্য সন্দেহ নেই, কিন্তু ওঁর কাছে শিখতে গেলেই মহাবিপদ, তখন রাগ একেবারে চণ্ডালতুল্য। আলি আকবরকে দিনের পর দিন বেধড়ক মার, তাও এমনি নয় একেবারে গাছে বেঁধে। মাইহারের রাজার আঙুল মটকে দিয়েছিলেন। তিমিরদাকে হাতুড়ি দিয়ে মাথা ফাটাতে তেড়ে গেছিলেন। ছাত্রদের পিটিয়ে অনেক সময় রাগ নামত না, তখন বাকি রাগটা গিয়ে

পড়ত বাড়ির আশেপাশের কুকুরগুলির ওপর। বেত নিয়ে গিয়ে সেগুলোকে আচ্ছা করে পিটিয়ে টেম্পারেচার নর্ম্যাল হত। একমাত্র রবিশংকরই ওঁর কাছে মার খায়নি, বোধহয় জামাই বলে। বাব্বাঃ, ভাগ্যিস ওঁর কাছে শিখতে যাইনি, শিখলে অনেক উপকার হত, কিন্তু মারের চোটে হাড়মাস আলাদা হয়ে যেত।"

খাঁ সাহেবের যে-চেহারা এবং ব্যবহার কিছুক্ষণ আগেই প্রত্যক্ষ করে এসেছি, তার সঙ্গে এই কথাগুলো মেলাতে পারলাম না মোটেই।

গোলাম আলি খাঁ সাহেবের এ বাড়িতে থাকা ছিল একটি অসাধারণ বর্ণবৈচিত্র্যময় অধ্যায়। সর্বক্ষণ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সুরমণ্ডল যন্ত্রটি বুকের ওপর রেখে টুং-টাং করে সুরের মধু চারদিকে ছিটিয়ে তার মধ্যে মশগুল হয়ে আছেন। মানুষটির সৌন্দর্যবোধ এমনই অসীম ছিল যে, তাঁব হাবভাব এবং কথাবার্তাও ছিল সংগীতময়, রেগে কাউকে বকলেও তাব কথাগুলো উচ্চারণ এমনভাবে কবতেন যে কানে মধুবর্ষণ হত। একথা পড়ে পাঠকরা হয়তো ভাববেন যে আমি মনের আনন্দে গুল মেরে যাচ্ছি, কিন্তু যাঁরাই দু-ঘণ্টা খাঁ সাহেবেব সঙ্গ করেছেন তাঁরাই এর সাক্ষ্য মুক্তকণ্ঠে দেবেন।

এ ছাড়া পারিপার্শ্বিক সবকিছুব আওয়াজ, প্রকৃতির নানা বস্তু, যথা গাছের ডাল, বাতাস, জলের মধ্যে মাছ ইত্যাদির নড়াচড়া, আকাশে পাখির গতিপথ, সবকিছুর থেকেই তিনি তাঁর সংগীতের পাঠ নিতেন—প্রতিটি আওয়াজ বা নড়াচড়াকেই তিনি একলহমায় কোনো-না-কোনো একটি তানে রূপান্তরিত করতেন। শাস্ত্রীয় সংগীতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ বাগরাগিণীজ্ঞানহীন লোকও তা শুনে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারত উনি স্বর দিয়ে কীসের ছবি

জ্ঞানবাবুর বাড়িতে গ্রুপ ছবিতে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব

আঁকলেন। আমরা সর্বক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম সংগীতের এই অবধূতের দিকে।

একদিন এইরকম ওঁর কাছে বসে আছি, হঠাৎ অনতিদূর থেকে একটি মোষ জলদগম্ভীর স্বরে 'আঁ...ও' করে ডেকে উঠল। পরমুহূর্তেই খাঁ সাহেব মালকোষ রাগে মন্দ্রসপ্তকে ধৈবত থেকে মধ্যম অবধি একটি দীর্ঘ অবরোহী মীড় টানলেন। সকলে হায়-হায় করে উঠল।

খাঁ সাহেব তখন বললেন, ওঁর চাচা কালে খাঁ সাহেব ওঁকে এই ধরনের অনেক তালিম দিতেন। বাল্যকালে একদিন লাহোরে খাটিয়ায় বসে চাচার সঙ্গে গল্প করছেন, এমন সময় ঠিক এমনি একটি মোষ ডেকেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কালে খাঁ সাহেব ভাইপোর পেটে চিমটি কেটে বলেছিলেন, "সুন বে লৌন্ডে, সুন, সুন। অগর গলে মে জওয়ারি লানা হ্যায় তো ইস আওয়াZ্ কো ইয়াদ রাখ, ঔর নিকালনে কি কোশিস কর।"

ভাইপো খুড়োর এই উপদেশ ভোলেননি। মুক্ত আকাশে চিলের ছোঁ মারা থেকে ঘরের মধ্যে চামচিকের দিশাহারা হয়ে ঘনঘন দিকপরিবর্তন করে ওড়া, অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে মাছের এদিক-ওদিক ছোটাছুটি, বাতাসে গাছের ডাল অল্পস্বল্প নড়ার থেকে শুরু করে দমকা হাওয়ার দাপটে একটা গাছের কাত হয়ে যাওয়া, সুবেব তুলি দিয়ে এ-সবকিছুবই চিত্রণে তিনি ছিলেন সিদ্ধ।

ডিক্সন লেনে একজন নাপিত প্রত্যহ সকালে ওঁর দাড়ি কামিয়ে দিত। এদিকে ঘুম-ভাঙা থেকে ঘুমিয়ে-পড়া অবধি খাঁ সাহেবের গলা চলছে তো চলছেই, দাড়ি কামাবার সময়টুকুও চুপ করে থাকতে পারেন না, নাপিতের ক্ষুর চলাকালীন অকস্মাৎ একটা তিনসপ্তকব্যাপী গমকি তান ছাড়লেন। ভয়ে নাপিত ক্ষুর চালানো বন্ধ করল, খাঁ সাহেব

জ্ঞানবাবুর বাড়িতে তোলা ছবি। পিছনের সাবিতে রাধুবাবু, বড়ে গোলাম আলি, মুনাব্বর আলি, জ্ঞানবাবু। সামনের সারিতে বঙ্কিম ব্যানার্জি (জ্ঞানবাবুর শিষ্য), নিতাই ভট্টাচার্য (জ্ঞানবাবুর সেক্রেটারি)

তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, "কোই ডর নেহি। তুমি ক্ষুর চালিয়ে যাও। আমার গলার চামড়া কাঁপবে না, যতই তান করি না কেন।

প্রখর গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে ঘেমে সকলেই পরিশ্রান্ত, মাথার ওপর ঘুরছে এক অতি প্রাচীন ডিসি সিলিং ফ্যান, তার প্রতিটি চক্করে ক্যাঁচ-কোঁচ করে একটা শব্দমালা বেজে চলেছে। খাঁ সাহেব পাখাটাকে উদ্দেশ্য করে বিনীত অনুরোধে বললেন, "থোড়া তেজ চলনা ভাই, হাওয়াতো থোড়া জিয়াদা ফেকো!"

পাখা কথা শুনল না। সে তার নিজের স্পিডে ঘুরেই চলেছে, এর থেকে জোরে চলার ক্ষমতা নেই। খাঁ সাহেব তখন পাখাকে বললেন, "ব্যাস! সির্ফ ইতনা হি হিম্মত?" বলে পাখার আওয়াজটার হুবহু প্রতিচ্ছবি করে মূলতানি রাগের একটি ছোট্ট তান চর্কির মতো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কয়েকবার পাখাকে ভ্যাংচালেন।

গান যে কীভাবে ওঁর সমস্ত সত্তা জুড়ে ছিল তার আরেকটি স্মরণীয় উদাহরণ দিচ্ছি। মাঝবয়সে ওঁর বাঁদিকের গালের তলায় একটি বড়োসড়ো আব (টিউমার) হয়। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, থাকতে-থাকতে কখন ওটা বিপজ্জনক কিছু হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ বলছেন ওটা অপারেশন করে ফেলে দিতে। কিন্তু খাঁ সাহেবের প্রবল আপত্তি। তাঁর ধারণা, গলার ওখানটায় ছুরি চালালে ওঁর গানের গলা নষ্ট হয়ে যাবে। ওই টিউমার নিয়েই তিনি যতদিন বাঁচেন বাঁচবেন, 'আওয়াZ'টা তো ঠিক থাকবে!

শেষকালে বোম্বাইয়ের এক বড়ো সার্জেন (এবং ওঁর পরম ভক্ত) অনেক করে ওঁকে বোঝালেন, এই অপারেশনের সঙ্গে ওঁর ভোকাল কর্ডের কোনোই সম্পর্ক নেই, তিনি জবান দিচ্ছেন গলার আওয়াজের বিন্দুমাত্র হেরফের হবে না। খাঁ সাহেব শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন।

অপারেশনের পরে জ্ঞান ফেরামাত্র খাঁ সাহেব মন্দ্র সপ্তকের একেবারে তলার থেকে অতি-তার-সপ্তকের শেষপ্রান্ত অবধি একটি বিদ্যুৎগতি সাপট তান মেরে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মুনাব্বর! মেরি আওয়াZ তো নেহি চলি গয়ি?"

পঁচিশ নম্বর ডিক্সন লেনের সদর দরজায় পৌঁছে রাধিকামোহন মৈত্র তাঁর চিরাচরিত ঢঙে হাঁক ছাড়লেন, "জ্ঞানবাবু স্যার! কোথায় আপনি?"

অনেক দূর থেকে উত্তর এল, "রাধুবাবু! আসুন স্যার। বসুন স্যার। ওই, ওই, ও-ই যে আমি, আসছি!"

—ওই যে আমি! তার মানে?

—মানে খুবই সহজ। আমি যদি একতলায় আপনাকে কাছাকাছি থেকে অভ্যর্থনা করতাম, তাহলে বলতাম, 'এই যে আমি'। কিন্তু আছি অনেক দূরে, তেতলার উত্তর দিকের বারান্দায়, তাই 'ওই যে আমি'। আর কী বলব?

—কীরকম প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিলেন বলুন তো? সত্যিই আপনার 'জ্ঞানপ্রকাশ' নাম সার্থক।

বলেই রাধুবাবু দরাজ এবং বেসুরো গলায় গেয়ে উঠলেন,

"জ্ঞান-সাবানে না কাচিলে ঘিলুর ময়লা ওঠে না হায়!"

বিন্দুমাত্র দেরি না-করে তেতলার থেকে উত্তর এল,

"রাধুর পাটে আছাড় খেলে ঘিলু একদম ঘেঁটে যায়।"

দুই বন্ধুতে দেখা হওয়ামাত্র এই ধরনের কিছু বাক্য বিনিময় হতই। দুজনেরই উদ্ভাবনী শক্তি অতিশয় প্রখর এবং দ্রুতগামী, কাজেই কেউ কাগজ-কলম নিয়ে সঙ্গে থাকলে তার প্রচুর দুষ্প্রাপ্য ছড়া এবং লিমেরিক লাভ হত।

একদিন এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে দুই বন্ধু গালগপ্পো করছেন। ভদ্রমহিলার চুল কাঁচাপাকা, কিন্তু সর্বত্র সমান নয়—কিছু কিছু জায়গায় সাদা কিছু জায়গায় কালো। বোঝা গেল যে তিনি চুল পেকে যাবার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন, এলোচুল মধ্যে মধ্যেই ঝাঁকিয়ে মাথা নেড়ে সাদা অংশগুলিকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছেন। তিনি চলে যাবার পর জ্ঞানবাবু রাধুবাবুকে বললেন, কাঁচাপাকা চুলের লুকোচুরি কেমন দেখলেন? বলেই ছড়া কাটলেন :

জ্ঞানবাবু : কাঁচাপাকার আলোছায়া—

রাধুবাবু : সবই মায়া, সবই মায়া!

জ্ঞানবাবু : (কীর্তনের সুর) কাঁচাতে পাকাতে—

রাধুবাবু : পাকাতে কাঁচাতে—

জ্ঞানবাবু : কাঁচা-পাকাতে লুকোচুরি!

রাধুবাবু : দিনে দিনে হায়,

জ্ঞানবাবু : কাঁচা উবে যায়,

রাধুবাবু : পাকা পড়ে থাকে পুরোপুরি!

সংগীতজগতে তখন এই দুইজনের নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হত, যথা জ্ঞানবাবু-রাধুবাবু, প্রায় 'ছাতুবাবু-লাটুবাবু'র মতোই। জ্ঞানবাবু-রাধুবাবু এবার 'ঝঙ্কারের' মিউজিক সার্কলে আমির খাঁ সাহেবের গান লাগাচ্ছেন। জ্ঞানবাবু-রাধুবাবুদের (অর্থাৎ ঝঙ্কারের) বি. মিউজ., এম. মিউজ. পরীক্ষা সেপ্টেম্বর মাসে হবে। জ্ঞানবাবু-রাধুবাবু এবার গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার ডেলিগেশনে চিন যাচ্ছেন।

শেষোক্ত তথ্যটির একটি রোমাঞ্চকর রকমফের একদিন রাধুবাবু ট্রামে যেতে যেতে স্বকর্ণে শুনলেন সামনের সিটে দুজন ভদ্রলোকের কথাবার্তায় :

—শুনেছিস, জ্ঞানবাবু চিন যাওয়া ক্যানসেল করে দিয়েছেন।

—কেন, কী হল?

—হবে আবার কী, বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে, এখনো আইবুড়ো থাকলে যা হয়, ওঁর একটি বান্ধবী জুটেছে ইদানীং, তার নাম রাধিকা মৈত্র। কী কারণে সেই ভদ্রমহিলা যেতে পারছেন না, তাই উনিও যাবেন না।

কথোপকথনরত ভদ্রলোক দুজনকে চমকে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রাধুবাবু বললেন, "আপনাদের খবর অনেকটা ঠিক, কিন্তু একটু বেঠিকও বটে। আমিই রাধিকা মৈত্র, কিন্তু

জ্ঞানবাবুব বাড়িতে বৃন্দগানেব মহড়া সামনেব সাবিতে বেবা ঘোষ, বাণী কোনাব, ললিতা চ্যাটার্জি (পবে ঘোষ) ও রুক্মিনী শ্রীমানী। জ্ঞানবাবুব পিছনেব সাবিতে উদযশংকব, অমলাশংকব, মন্মথ ঘোষ এবং ও সি গাঙ্গুলি

শুধুই রাধিকা নই, রাধিকামোহন। সুতবাং জ্ঞানবাবুর বান্ধবী নই, বন্ধুমাত্র। বান্ধবী হলে ওঁকে এতদিন আইবুড়ো থাকতে দিতাম না মোটেই। তবে বাকিটা ঠিক, আমি কোনো কারণে যেতে পাবছি না, সুতবাং জ্ঞানবাবুরও আর যাবার বিশেষ ইচ্ছে নেই। আচ্ছা, আমার স্টপেজ এসে গেছে, চলি—নমস্কার!"

জ্ঞানবাবু অনেকগুলি বাংলা ছবিতে সুর দিয়েছিলেন, তার মধ্যে 'যদুভট্ট' ছবিটির কথা বিশেষভাবে মনে আছে। পরিচালক ছিলেন নীরেন লাহিড়ি (বেণুবাবু)। প্রত্যহ ডিক্সন লেনে রিহার্সাল বসত। যদুভট্ট (বসন্ত চৌধুরী) গান শিখছেন, গুরু অল্প বয়সে মারা গেলে নতুন গুরুর সন্ধানে দেশ-দেশান্তর উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, নানা ওস্তাদের গান শুনছেন, কোনোটা ভালো, কোনোটা পানসে, কোনোটা ভয়ংকর..., ভেবে পাচ্ছেন না কার কাছে শিখবেন, কারো কারো কাছে বাঙালি বলে প্রত্যাখ্যাত এবং অপমানিত হচ্ছেন, ইত্যাদি নানা অধ্যায়ের নানা গান। তাতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন— এ. কানন, বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বাণী কোনার, যদুভট্টেব পরিণত বয়সের কণ্ঠে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

রিহার্সাল চলছে, মাঝারি গায়কও কয়েকজন উমেদারি করতে আসছেন, সকাল-বিকেল তাঁদের শোনা হচ্ছে, সে এক এলাহি এবং মধ্যে মধ্যে লোমহর্ষক কারবার।

একজন খুবই সুপণ্ডিত এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় গায়ক ছিলেন, তাঁর গলাটি সুরেলা হলেও এতই তীক্ষ্ণ জোয়ারিদার ছিল যে, মনে হত শিরীষ কাগজ দিয়ে মরচে-ধরা লোহা

ঘষা হচ্ছে বা করাত দিয়ে কাঠ চেরা হচ্ছে। তাঁকে দিয়ে একটা টপ্পা গাওয়ানো হল— 'অ্যায়সো না মানন করিয়ে।' গাইবার ধরনে কথাগুলো এইভাবে কানে এল—'অ্যা...য় সোনা মা— নন করিয়ে।' 'অ্যা...য়'র মধ্যে একটি দানাদার টপ্পার তান একেবারে রে-রে-রে-রে করে তেড়ে উঠছে। পরের দিন জ্ঞানবাবু জিজ্ঞেস করলেন, বেণুদা, এই 'সোনা মা'কে কোথায় রাখবেন? বেণুবাবু বললেন, কোথায় রাখব ঠিক করে ফেলেছি, গায়কের চেহারাও মনে মনে এঁকে নিয়েছি। দেখো, কী সাংঘাতিক ইম্প্যাক্ট হয়। শেষে ছবির মধ্যে একজন ছাগলদাড়িওয়ালা গায়কের গলায় এই গানটি দিয়েছিলেন এবং এমন আকস্মিকভাবেই ব্যাপারটা পর্দায় এনেছিলেন যে দর্শকরা প্রথমে চমকে উঠবে, পরে হেসে কুটিপাটি হবে।

হিন্দুস্তানি গানের কথাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনভাবেই উচ্চারিত হয় যে, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা (বিশেষ করে বাঙালি শ্রোতাদের পক্ষে) দুঃসাধ্য হয়। তার ওপর শব্দগুলি স্বতন্ত্র থাকে না, অনেক সময়েই একটা শব্দের ধড়-মুণ্ডু-হাত-পা এমনভাবে আলাদা করে আরেকটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় যে, তা আরো অবোধ্য হয়। হিন্দি শব্দগুলি ঠিক না-জানা থাকায় ব্যাপারটার সম্বন্ধে অনেক সময়ই খেয়াল থাকে না, শ্রোতা শুধু সুরটাকেই উপভোগ করেন। কিন্তু ওস্তাদি গানের কথাগুলি যদি বাংলা হয়, তবে তার প্রয়োগ এইভাবে করলে বাঙালি শ্রোতার পিলে অবশ্যই চমকাবে। উদাহরণস্বরূপ, 'পীত বসন বনমালি' এই গানটি বাল্যকালে একজন গাইয়ের কাছে শুনেছিলাম, তিনি বারতিনেক 'পী-তব..., পী-তব..., পী-তব' করে সাসপেন্স দিয়ে হঠাৎ তিরবেগে 'সনবনমা-লী—সনবনমা-লী—সনবন মা' করে সমে পড়লেন, মা-এর ওপর সম। গানটি এবং গায়ককে কোনোদিনই ভুলতে পারব না।

যদুভট্টের রিহার্সালে এমনই একজন গায়ক হাজির হলেন। নীরেনবাবু গম্ভীরমুখে শুনছেন, চারধারে জ্ঞানবাবু, রাধুবাবু, বিমলাপ্রসাদবাবু ইত্যাদি বন্ধুবর্গ। গায়কের চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে তিনি গানের সঙ্গে সঙ্গে কুস্তি, বক্সিং ইত্যাদিরও চর্চা বিলক্ষণ করে থাকেন এবং তবলা যে বাজান সেটা নিজেই বললেন। তবলার বিভিন্ন লয়কারির ছন্দ এবং বিশেষ করে 'রেলা' অঙ্গটি যে তাঁর গানকে কতখানি প্রভাবিত করেছে, তা তাঁর গানের কথা টেনে লম্বা করা অথবা ভেঙে টুকরো করা এবং সেই ভগ্নাংশগুলির অভাবনীয় প্রয়োগ শুনেই বোঝা গেল। গানের কথাগুলি ছিল 'তোমায় মিনতি করি গো গিরিধারী'। যতদূর স্মরণে আছে উদ্ধৃত করছি :

তোমায় মিনতি করি, করিগো করিগো করি
করি গিরিধারী, করি গিরিধারী, করি করি
মিনতি তোমায় করি, করি করি গিরিধারী
করিগো মিনতি করি, মিনতি তোমায় করি
করিগো মিনতি করি, গিরিধারী! গিরিধারী!!
করি করি করি করি, গিরিধারী গিরিধারী
তোমায় মিনতি, গিরিধারী, করি করি করি

মিনতি তোমায় করিগো তোমায় করি করি
মিনতি করিগো গিরিধারী, করি গিরিধারী
করি গিরিধারী, করি গিরিধারী, করি গিরি (ধা এর ওপর সম)

এরপর, আড়ি ছন্দে শব্দগুলিকে টেনে টেনে, ময়ান দিয়ে—

মিইনতি কোওরিগো, মিইনতি করি, করি
করি মিইনতি করি, গিইরি গিইরি ধারী
মিইনতি কোওরি গিইরি গিইরি ধাআরী
মিইইই নোওওওতিই করি গিরিধারী
মিইইইনোওতিই কোওরি গিইরি ধাবী
(ফাইনাল তেহাই) গিরিধা গিরিধা গিরিধাআরীই, গিরিধা গি
রিধা গিরিধাআরীই, গিরিধা গিরিধা গিরি (ধা)

গায়ক গান শেষ করে 'কেমন হয়েছে?' দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকাতে লাগলেন। বেণুবাবু বললেন, বাঃ, ভাই বাঃ! অসাধারণ তোমার লয়কারির মারপ্যাঁচ, একেবারে আগ্রা ঘরানার বোল বাঁটের নিয্যস। ঠিক আছে, দরকার পড়লে তোমায় ডেকে নেব।

গায়ক নমস্কার করে চলে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত বাদে বাক্যস্ফূর্তি হলে জ্ঞানবাবু বললেন, "মিনতি করার ঠ্যালাটা দেখলেন বেণুদা!"

রাধুবাবু বললেন, "গিরিধারীকে এমন আছাড় দিয়েছে যে বেচারার হাড়গোড় আর আস্ত নেই।"

বিমলাপ্রসাদবাবু বললেন, "এরকমটাই দরকার ছিল। গিরিধারী অতিশয় ব্যাদড়া ছোকরা, নরম মেয়েছেলেদের মিনমিনে মিনতি কোনোদিন গেরাহ্যি করেছে? ওর দরকার একটি জবরদস্ত, দশাসই, বাইসেপস-ট্রাইসেপসওয়ালি রাধিকার, যে কথায় কথায় ওকে উঠিয়ে এমন পটকান দেবে যে, গিরিধারীর বাপ চোদ্দোপুরুষ মিনতি শুনতে বাধ্য হবে।"

দুর্ভাগ্যক্রমে এই গানটি যদুভট্ট ছবিতে শেষ অবধি স্থান পায়নি, দর্শকেরা একটি

ওস্তাদ কেরামৎউল্লা খাঁ

যদুভট্টের ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী (বাঁদিকে)

লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হলেন।

'যদুভট্ট প্রেক্ষগৃহে মুক্তি পেল এবং বলা বাহুল্য, সাড়া জাগিয়ে দিল। বাঙালি যুবা-সংগীত-প্রতিভার প্রতীক হয়ে উঠলেন বসন্ত চৌধুরী, কণ্ঠে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান। স্ত্রী-ভূমিকায় ছিলেন অনুভা গুপ্ত।

যদুভট্ট ছবিটি উপলক্ষ করে বসন্ত চৌধুরীর কাছাকাছি আসতে পেরেছিলাম এটা আমার একটা পরমপ্রাপ্তি। বসন্ত চৌধুরীর চেহারায়, কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে এবং পরিধানে অভিজাত বাঙালি ভদ্রলোকের উজ্জ্বল নিদর্শন। ওঁর সঙ্গে আমার মানসিক বন্ধনের আর-একটা কারণ ছিল, উনি যখন দেশ-দেশান্তরে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি জায়গায় জায়গায় একটু সরোদ বাজিয়েছিলাম। অত বড়োমাপের অভিনেতা হয়েও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষকে তিনি দেখামাত্র চিনতেন এবং নাম ধরে ডাকতেন।

একদিন পাম অ্যাভিনিউতে সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছি, এমন সময় একটি গাড়ি পাশে এসে থামল। তার ভেতর থেকে গম্ভীর গলায় আওয়াজ এল, "বুদ্ধদেববাবু, নমস্কার! ভালো আছেন?" চমকে তাকিয়ে দেখি, বসন্ত চৌধুরী গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন, আমায় দেখে গাড়ি থামিয়েছেন। অথচ বছর পাঁচেক তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।

বললাম, "এ কী বসন্তদা আপনি আমাকে 'বাবু' 'আপনি' এসব কী বলছেন? তুই থেকে আপনিতে প্রমোশনটা কবে হল? যাই হোক, দরজাটা একটু খুলুন, পায়ের ধুলো নিই।"

উনি তখন বললেন, "বাজনাটা টিকিয়ে রাখিস, চাকরির ধকলে উপে যেতে দিস না!"—বলে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন।

বারো নম্বর উড স্ট্রিটে আমাদের বাড়িতে বিলায়েত খাঁ সাহেব এবং জ্ঞানবাবুর বাজনা দিয়ে যে সংগীতচক্রটি জন্মগ্রহণ করে, তার দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি ছিল রবিশংকরের সেতারবাদন এবং সেটা অনুষ্ঠিত হয় রাধুবাবুর প্রবীণ শিষ্য মোহনলাল মুখার্জির গুরুসদয় রোডের বাড়ি টেগোর ক্যাসল-এ, এবং তখন থেকে তার নাম হয় 'ঝঙ্কার'। এখানে পর পর বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। আলি আকবর খাঁ সাহেবকে এইখানে প্রথমবার সামনে বসে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। হীরাবাঈ বরোদেকরের ভগ্নী সরস্বতী রাণের গানও এখানে হয়েছিল, তবলা সংগত করেছিলেন সে-যুগের তবলা-সংগতের একজন প্রবাদপুরুষ শামসুদ্দিন খাঁ। সব থেকে যে অনুষ্ঠানটি মনে জ্বলজ্বল করছে সেটা হল ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর গান, সম্ভবত সেটাই কলকাতায় তাঁর শেষ অনুষ্ঠান। ওঁর গান ছাড়াও ওঁর চেহারা কথাবার্তা এবং অসম্ভব পরিমার্জিত ব্যবহার যে-কোনো সংগীত-শিক্ষার্থীর স্মরণীয় বিষয়। ছোটোবড়ো গুণী এবং সাধারণ শ্রোতা সবাইকে আদাব বা তসলিম জানানো, গান শুরু করবার আগে সকলের 'ইজাজত' বা অনুমতি ভিক্ষা, গানের বিভিন্ন অধ্যায়ে তাঁর সাংগীতিক পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে দু-একটি কথা (যা বলতে বলতে তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠছিল), কেউ তারিফ করলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আদাব জানিয়ে সেটা গ্রহণ করা, কাশির সময় মুখের ওপর রুমাল চাপা দেওয়া, পিকদানিতে পানের পিক

বসে জ্ঞানবাবু ও আমিব খাঁ সাহেব। দাঁড়িয়ে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিতাই ভট্টাচার্য

রবিশংকর-আলি আকবর

ফেলার সময় রুমাল দিয়ে পিকদানি এবং মুখ দুটোকেই আড়াল করে রাখা, সব মিলিয়ে ওঁর ছবিটা মনের মধ্যে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরে 'ঝঙ্কারে'র অনুষ্ঠান হতে থাকে পঁচিশ নম্বর ডিক্সন লেনে জ্ঞানবাবুদের বাড়ির ভেতরকার উঠোনে। হীরাবাঈ বরোদেকর, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, কেশরবাঈ কেরকর, বড়ে গোলাম আলি, আমির খাঁ, আলি আকবর খাঁ, বিলায়েত হুসেন (গাইয়ে), রবিশংকর, বিলায়েত খাঁ এবং আরো অগণিত গুণীজন এখানে কয়েক দশক ধরে গানবাজনা করে গেছেন। তখন কলকাতায় দুটি মোটে বড়ো মিউজিক কনফারেন্স ছিল, পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন ঘোষ ও তৎপুত্র মন্মথ ঘোষের 'অল বেঙ্গল', এবং পরে লালা দামোদরদাস খান্নার 'অল ইন্ডিয়া'। কনফারেন্স না-হলেও গুরুত্বের দিক দিয়ে তৃতীয় স্থান ছিল 'ঝঙ্কার' সংগীতচক্রের। সারা ভারতের গুণীরা উৎসুক হয়ে থাকতেন এখানে অনুষ্ঠান করবার জন্য।

জ্ঞানবাবুর বাড়িতে সর্বক্ষণ তবলার মেলা বসে থাকত। অসংখ্য ছাত্র তিনি তৈরি করে গেছেন, যাদের মধ্যে অনেকে শুধু ভারতবিখ্যাত নয়, জগদ্‌বিখ্যাত। আমার সমবয়সি একটি ছেলে, দিলীপ দাস, ১৯৪৯ সালে এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলনে সাড়া ফেলে দিয়েছিল, এমন তুখোড় হাত যে, ওখানকার সবাই জ্ঞানবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—এ বাঘের বাচ্চাকে আপনি কোথা থেকে পেলেন? দুর্ভাগ্যক্রমে দিলীপ তার প্রাপ্য জায়গা এবং সম্মান পেতে পারেনি, কারণ বাজনাতে বাঘের বাচ্চা হলেও ব্যবহারিক দিকে সে একটু মুখচোরা ছিল এবং অল্প বয়সে একটা স্ট্রোক হয়ে তার বাজাবার ক্ষমতা প্রায় চলে যায়। নির্দোষ ভালোমানুষ ছেলেটিকে ভগবান কেন এমন শাস্তি দিলেন জানি না।

মানিক পাল এবং কানাই দত্তের কথা আগেই বলেছি। কানাইদা পরে রবিশংকরের

প্রিয়পাত্র হন এবং প্রচুর বিদেশভ্রমণ করেন। তাঁর তৈরি করা ছাত্রদের মধ্যে দুই 'দেবু' —দেবেন্দ্রকান্তি চক্রবর্তী এবং দেবাশিস সরকার আজ প্রসিদ্ধ হয়েছে। জ্ঞানবাবুর কাছেও শিখেছে কানাইদার মৃত্যুর পরে।

প্রবীণ গায়ক এবং তবলিয়া অনাথনাথ বসু একদিন অল্পবয়সি একটি ছেলের হাত ধরে ডিক্সন লেনে নিয়ে এসে বললেন, "জ্ঞানবাবু, আমার ছেলেটাকে আপনার হাতে দিয়ে গেলাম, মানুষ করুন।" এই ছেলেটি হচ্ছে পরবর্তীকালের শ্যামল বসু। তবলিয়া হিসাবে ওর নাম ভারতবর্ষ চিরকাল স্মরণ করবে। গান অথবা বাজনাকে যথার্থ ভালোবেসে যদি কোনো তবলিয়া বাজায়, তাহলে তার সংগত যে কতটা মনোগ্রাহী হতে পারে, শ্যামল তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, এদিক দিয়ে তার স্থান কেরামৎউল্লা খাঁ সাহেবের পরেই। শ্যামল বাজিয়ে হিসেবে তো বটেই, মানুষ হিসেবেও অসাধারণ, ওর বাবার ইচ্ছে সর্বতোভাবে পূর্ণ করেছে। শ্যামল আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, কত যে ওর সঙ্গে বাজিয়েছি, ঘুরে বেড়িয়েছি, আড্ডা মেরেছি তার ইয়ত্তা নেই। সম্প্রতি শ্যামল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, তার জন্য খুবই একা বোধ করি।

রাধুবাবু দুটি ছেলেকে খুবই ভালোবাসতেন—শ্যামল বোস এবং শংকর ঘোষ। শংকর শ্যামলের একটু পরে জ্ঞানবাবুর কাছে আসে। শংকরের কথাবার্তা এবং উইট অনেকটাই রাধুবাবুর মতন, লোকে বুঝতে পারত না যে ওর কথা অকস্মাৎ কোনদিকে ঘুরে গিয়ে কাকে ল্যাং মারবে। এই উইট তার তবলাবাদন এবং সংগতকে আর-একটি বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। একটি ঘটনা মনে আছে বিশেষভাবে। আমির খাঁ সাহেবের গানের সঙ্গে সংগত করছে শংকর, বিলম্বিত তিনতালের খেয়াল, ধীর গতিতে রাগের বিস্তার হচ্ছে, শংকরের ঠেকাও মৃদু, আধঘুমন্ত। একটা বিস্তারের পর্ব শেষ হতে গানের মুখড়া ধরবার জায়গাটা যেই কাছাকাছি এসেছে, শংকরের তবলা যেন ঘুম থেকে উঠে বলল, 'না? তিন? তিন? না???' মনে হল যেন একটি আধঘুমন্ত বাচ্চা ঠাকুমার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ জেগে উঠে বলল, 'তারপর? তারপর? তারপর কী হল?'

শংকরের প্রতিভা খুবই সৃজনশীল। ওর তবলার অর্কেস্ট্রা তার একটি প্রমাণ হয়ে আছে।

শ্যামল-শংকরের গোত্রীয় সঞ্জয় মুখার্জি জ্ঞানবাবুর আরেকটি 'তাগড়া' ছাত্র। খুবই বলিষ্ঠ বাজনা, কলকাতা টেলিভিশন খুললেই ওকে প্রায়ই দেখা যাবে, কিন্তু টেলিভিশনে চাকরি করতে গিয়ে ওর ভারত এবং পৃথিবী পরিক্রমা কিছুটা সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে—এটা ওর দুর্ভাগ্য নয়, সংগীতজগতের দুর্ভাগ্য।

আর-এক ছাত্র অনিন্দ্য চ্যাটার্জি এখন সারা পৃথিবীময় বিরাজমান। যেমন তার হাতের আওয়াজ তেমনি তার সংগত। আরো বহু ছাত্র সংগীতজগতের নজর কেড়েছে, মোটকথা জ্ঞানবাবুর প্রয়াণের এক বছর আগে পর্যন্ত প্রায় সব কিশোর তবলিয়া তাঁর পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছে। তাঁর পালিত পুত্র মল্লার ঘোষ তাঁর তালিমের সার্থক উত্তরাধিকারী হয়েছেন।

জ্ঞানবাবুর আর একজন ছাত্রের কথা না-বললে এই পর্ব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাঁর নাম নিশীথেশ ব্যানার্জি, ডাক নাম গুন্ডাদা। এলাহাবাদের লোক, লম্বা চওড়া চেহারা, ইংরেজি এবং রুশ ভাষায় সুপণ্ডিত। তবলাকে জীবিকা করেননি, হাইকোর্টে চাকরি

করতেন। অসাধারণ রসিক ছিলেন। উঠতি বয়সে যন্ত্রীদের রেয়াজের সময় যে তবলা সংগতের প্রয়োজন হয়, তা তিনি আমাকে দিনের পর দিন এসে দিয়ে গেছেন। সর্বক্ষণ মজার মজার কথা বলে আমাদের মাতিয়ে রাখতেন। এবং খুব খারাপ কথাও খুব সুললিত ভাষায় বলতে পারতেন।

একবার এক আড্ডায় এক ভদ্রলোক ক্রমাগতই অশ্লীল কথা বলে যাচ্ছেন, কিছুতে তাঁকে নিরস্ত করা যাচ্ছে না। গুন্ডাদা হঠাৎ তাঁকে বললেন, "মশায়, আপনার খাদ্যনালীর উপরের প্রান্তটির কাজ কি কেবল নীচের প্রান্তের মতোই?"

আর-একদিন আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে, বড়ে গোলাম আলি সাহেব যেমন দুনিয়ার সব কিছু আওয়াজ বা গতিকে গান এবং তানের মধ্যে ফেলে দেন, তবলাতে সেরকম কিছু করা যায় কি না। যেমন, পায়রার বকবকম, উড়ে যাওয়ার ফরফরানি, ইটের গাড়ি উলটোনোর আওয়াজ, মেঘ ডাকার গুড়গুড় শব্দ এমনকী বাজের আওয়াজ পর্যন্ত। গুন্ডাদা হঠাৎ বললেন, "ও হে, তবলায় এ-সব করতে যেয়ো না, বিপদে পড়বে।" আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কেন কী বিপদ?" উনি তখন বললেন, এক মফঃস্বলে কনফারেন্সে একজন তবলিয়া লহরা বাজাবার সময় এইসব বিবিধ কাণ্ড করেছিলেন— কখনো বলছেন এটা পাখি উড়ে যাবার ডানা ঝটপটানি, কখনো বলছেন ট্রেন চলবার আওয়াজ, কখনো বলছেন পায়রার বকবকম, কখনো বাঁয়াতে ববম্ ববম্ করে শিবের

জ্ঞানবাবুর বাড়িতে সারারাত্রব্যাপী তবলা সমারোহ . দাঁড়িয়ে কানাই দত্ত, মহারাজ ব্যানার্জি, জ্ঞানবাবু, শ্যামল বোস। বসে আনোখেলাল, আল্লারাখা, রায়বাহাদুর কেশব ব্যানার্জি, লালনবাবু (শত্রুজয়প্রসাদ সিং, পাখোয়াজি), গোপাল মিশ্র, কেরামৎউল্লা খান, শামতাপ্রসাদ

গালবাদ্য শোনাচ্ছেন, একবার বললেন, 'শুনুন! এবার বাঁয়ার আওয়াজ শুনুন! মেঘ ডাকছে কি না?'

পরের দিন ভদ্রলোক কলকাতার ট্রেন ধরবার জন্য স্টেশন রওয়ানা হচ্ছেন, এমন সময় গ্রামাঞ্চল থেকে দুজন লোক এসে হাত জোড করে দাঁড়াল। তাঁকে এখনি তাদের সঙ্গে রওয়ানা হতে হবে কলকাতায় যাওয়া স্থগিত করে, যত টাকা চান পাবেন। ভদ্রলোক যতই জিজ্ঞাসা করেন কোথায় বাজাতে হবে, ওরা খালি বলে, আজ্ঞে গেলেই বুঝতে পারবেন। সব ব্যবস্থা হয়ে আছে। অগত্যা ভদ্রলোক টাকার চুক্তি শেষ করে যখন তবলা বাঁয়ার বাক্সটা গাড়ির কাছে নিয়ে এসেছেন, তখন ওরা বলল, আজ্ঞে তবলাটা আর কষ্ট করে নেবেন না, খালি বাঁয়াটা নিলেই চলবে।

খালি বাঁয়াটা নিলেই চলবে? ভদ্রলোক ভীষণ হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার সঙ্গে কি তোমরা মশকরা করতে এসেছ? সত্যি করে বলো তোমরা কী চাও, নইলে আমি লাখ টাকা দিলেও যাব্ না। লোকদুটি হাঁউমাউ করে পায়ে-ধরে নিবেদন করল, ''আমাদের উদ্ধার করুন, 'না' বলবেন না। আমাদের একজন নদীতে নাইতে গেছিল, তার পায়ের আঙুলে বড়োসড়ো একটা কচ্ছপে কামড়ে ধরেছে। কচ্ছপ মেঘ না-ডাকলে কামড় ছাড়ে না, এই ভর গ্রীষ্মকালে মেঘ কোথায় পাব? তাই আপনার কাছে এসেছি, কাল কনফারেন্সে আপনার বাঁয়ায় মেঘ ডাকানো শুনেছি আমরা। দয়া করুন।''

তবলার একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হয়েছিল সারা ভারতের বড়ো বড়ো তবলাবাদকদের এবং কলকাতায় তবলিয়াদের (অধিকাংশ জ্ঞানবাবুরই ছাত্র) নিয়ে। তাতে ছিলেন যুবক আল্লারাখা, শামতাপ্রসাদ, আনোখেলাল, শত্রুজয় প্রসাদ সিংহ (পাখোয়াজি), কেরামৎউল্লা খাঁ, কানাই দত্ত, শ্যামল বসু, মহারাজ ব্যানার্জি ইত্যাদি। এতগুলি তবলিয়ার একত্র সমন্বয়ে সারারাত্তিরব্যাপী শুধুমাত্র তবলার অনুষ্ঠান কলকাতায় আর কখনো হয়েছে কি না সন্দেহ। এ ছাড়া আলাদা অনুষ্ঠানে তবলা বাজিয়েছেন জ্ঞানবাবুর ওস্তাদ মসিদ খাঁ সাহেব, আহম্মদ জান থিরাকুয়া খাঁ সাহেব, এবং তবলা জগতের পরশুরাম হবিবুদ্দিন খাঁ সাহেব।

বিশেষভাবে মনে আছে আনোখেলাল মিশ্রর এবং হবিবুদ্দিন খাঁ সাহেবের তবলাবাদন। লহরার অন্যান্য অঙ্গের শেষে আনোখেলাল তিনতালের ঠেকার 'ধা ধিন ধিন না...' প্রতিটি বাণীর স্পষ্টতা অক্ষুণ্ণ রেখে ঠেকাটিকে এমন একটি মাথা ঘোরানো অতিদ্রুত লয়ে নিয়ে গেলেন, যেটা আমার মনে হয়েছিল শত পরিশ্রম সত্ত্বেও অন্য কোনো মানুষের অসাধ্য। এক-একজন গুণীর এক-একদিকে সিদ্ধাই।

হবিবুদ্দিন সাহেবকে তবলার পরশুরাম বললাম এই কারণে যে তিনি অত্যন্ত প্রখরভাবে আত্মাভিমানী ছিলেন এবং প্রায়ই তবলাজগৎকে নিঃক্ষত্রিয় করার প্রয়াসে কুঠার চালনা করতেন। অন্তত কথায় তো বটেই। একটু সমীহ ও ভয় নিয়েই তাঁর লহরা শুনতে বসলাম। হাত যথারীতি দুর্দান্ত তৈরি, এ ব্যাপারে কোনো পেশাদার ওস্তাদ রেয়াজের খামতি রাখেন না। কিন্তু ওঁর হাতের ওপর এতটা অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণ ছিল, দারুণ স্পিডে একটা কায়দা বা টুকড়া বাজাতে বাজাতে অকস্মাৎ যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো

জায়গায় সেটাকে রুখে দিতে পারতেন। কোনো অশ্বরোহী যেন ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে এক লহমায় লাগাম টেনে তাকে থামিয়ে দিলেন, ঘোড়ার সামনের দুই পা শূন্যে লাফিয়ে উঠল গতি সামলাবার প্রয়াসে, কিন্তু ঘোড়া সেইখানে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই ব্যাপারটা তিনি মধ্যে মধ্যেই করতে লাগলেন, এবং কোথায় কবে কী জিনিস বাজিয়েছেন, কার কোন 'চিজ'-এর জবাবে কী বাজিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করেছেন, কোন দঙ্গলে কোন কায়দাটা নিতে হাতাহাতি হয়েছিল ইত্যাদির বিবরণ দিতে লাগলেন। অধিকাংশ জিনিসই ওঁর মতে 'সারে দুনিয়া গলৎ বাজাতা হ্যায়'। হঠাৎ একবার বলে বসলেন, "গিয়ান(জ্ঞান)দাদা, আপ তো জরুর হামকো রিকার্ড কর রহে হ্যাঁয়, ইস চিজ কো থিরাকুয়া সাহাবকো এক বার সুনা দিজিয়ে গা।" থিরাকুয়া সাহেব তখন তবলা জগতের অবিসম্বাদী সম্রাট।

অতিশয় লড়াকু ছিলেন হবিবুদ্দিন সাহেব। এ-বিষয়ে তাঁর স্থান ছিল ওস্তাদ আজিম খাঁর পরেই। ইনি যদি পরশুরাম হন তো আজিম খান তবলাজগতের দুর্বাসা। আজিম খাঁ বহু বড়ো বড়ো যন্ত্রীকে স্টেজে ঘোল খাইয়েছেন। একবার একজনের সঙ্গে বাজাতে বাজাতে তবলা সরিয়ে রেখে বললেন, "হামারে জরুরৎ নেহি, কোই লৌন্ডে কো বোলাও।" কোনো যন্ত্রীর সঙ্গেই সোজা ঠেকা বাজাতেন না এঁরা। তুমি তোমার তানবাজি নিয়ে নানা প্যাঁচপয়জার দেখাচ্ছো, চলো আমিও আমার তবলা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নানা দুর্বোধ্য প্যাঁচোয়া জিনিস বাজাতে থাকব, একটা মাত্রাও ঠেকা দেব না, তোমার হিম্মৎ থাকলে ঠিকঠাক মাত্রার হিসেব মনে মনে রেখে যথাসময়ে সমে পড়ো, না হলে পা পিছলে আঘাটায় পড়ো, তারপরে আমি আঙুল তুলে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দেব, ওটা নয় এইটা হচ্ছে আসল সম। ভয়ে কোনো গাইয়ে-বাজিয়ে সচরাচর এঁদের সংগতিয়া হিসাবে

হবিবুদ্দিন খাঁ
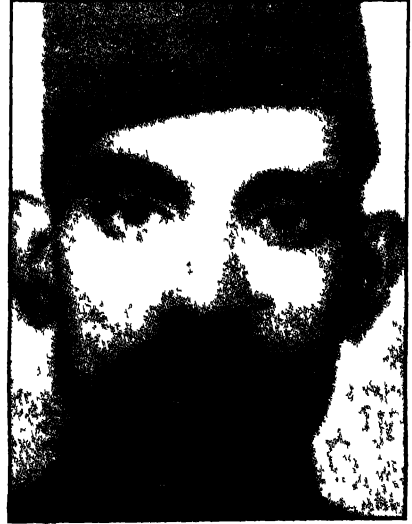
আনোখেলাল

নিতেন না, মুখ্যত লহরা বাজিয়েই এঁদের দিন কাটত।

এলাহাবাদে মিউজিক কনফারেন্সে বাজাতে গেছেন হবিবুদ্দিন। তখন নিমন্ত্রিত আর্টিস্টদের থাকবার জায়গা ছিল ইউনিভার্সিটির মাঠের এক-একটি তাঁবু। সকালে উঠে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হবিবুদ্দিন দেখেন একটি তাঁবুর সামনে ভিড় জমে আছে, ভিতর থেকে গানের আওয়াজ আসছে। জিজ্ঞাসা করলেন, "কৌন গা রহে হ্যাঁয় ভাই?" রেয়াজ করছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর দাদা তারাবাবু, তিনি বললেন, "রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, ভীষ্মদেব।"

সেইদিনই ভীষ্মদেবের গানের সঙ্গে হবিবুদ্দিনের বাজাবার কথা। তারাবাবুকে হবিবুদ্দিন বললেন, "রয়েল বেঙ্গল টাইগার কো বোল দিজিয়ে, মিরাট কো রায়ফ্‌ল ভি তৈয়ার হ্যায়।" মিরাট হবিবুদ্দিনের দেশ।

একবার অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে আমার গুরুদেবের প্রোগ্রাম, সঙ্গে আমারও বাজাবার কথা। প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছে অকস্মাৎ শোনা গেল, কেরামৎউল্লা খাঁ সাহেব আসতে পারেননি, তাঁর বদলে সংগত করবেন হবিবুদ্দিন। গুরুদেব লয়েতে পাথরের মতন দৃঢ় ছিলেন, বাজনাটা মারামারির হবে, তাতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু মুশকিল আমাকে নিয়ে, আমার যে হবিবুদ্দীন সাহেবের হাতে কী অবস্থা হবে! শেষে খাঁ সাহেব যখন গ্রিনরুমে তবলা মেলাতে এসেছেন, তখন গুরুজি তাঁকে বললেন, "খাঁ সাহেব, আপনার তবলাকে সারা হিন্দুস্থান ভয় করে, কিন্তু মেহেরবানি করে এই বাচ্চাটাকে একটু সামলে নেবেন, ওকে মেরে তো আপনার ইজ্জৎ কিছু বাড়বে না!"

খাঁ সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কুছ ডর নেহি বেটা। ম্যাঁয় তুমহারে সাথ সির্ফ সাফা সিধা ঠেকা দুঙ্গা।" বলেই গুরুজির দিকে তাকিয়ে বললেন, "লেকিন আপকে সাথ নেহি!"

এই দুর্দমনীয় তবলিয়ার শেষ জীবন বড়োই করুণ, পক্ষাঘাত হয়ে বাজাবার ক্ষমতা হারিয়েছিলেন এবং তারপরে তাঁর মৃত্যু হয়। দর্পহারী মধুসূদন তাঁর ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করেননি।

এ কা দ শ প রি চ্ছে দ

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ : প্রথম পর্ব

প্রেসিডেন্সি কলেজের পর্ব একদিন শেষ হল। শেষ হয়ে গেল ওখানকার ক্লাস-করা, ক্লাস-পালানো, আড্ডা, বাঁদরামি, কফিহাউস, দিলখুসা রেস্টুরেন্টের ফ্রাই, কাটলেট, কবিরাজি, কলেজ স্কোয়ারের একধারে পুঁটিরামের দোকানের লুচি-ছোলার ডাল, আর একধারে প্যারাগন এবং প্যারামাউন্টের দোকানের শরবত। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

অর্থকরীবিদ্যার যে-কোনো একটিকে ধরে ঝুলে পড়তে হবে, নইলে অদৃষ্টে অনাহার। অতএব চতুর্দিকে চোখ-কান বুজে চেষ্টা চলতে লাগল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ, সায়েন্স কলেজ সর্বত্র। যেখানে আগে দরজা খোলে। মেডিক্যাল কলেজ হলে ডাক্তার। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হলে ইঞ্জিনিয়ার। আমার স্বাভাবিক প্রবণতা কোন দিকে, কোথায় গেলে আমি ভালোভাবে বাড়তে পারব, ভালোভাবে কাজ করতে পারব, সেসব নিয়ে চিন্তা করবার কোনো অবকাশই নেই।

দরজা খুলল শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের। বাবা-মায়ের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সবাই একবাক্যে বলতে লাগলেন, এ তাঁদের বহুজন্মের পুণ্যের ফল। শিবপুরে ছেলে ভর্তি হওয়া মানেই তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কন্যাদায়গ্রস্ত বাবা-মায়েরা পেছন পেছন তাড়া করল বলে। আমার মামারা সকলেই নানারকম ভালো ভালো কথা বলতে লাগলেন। ছোটোমামা বললেন, "আমাদের ল্যাচাড্যাং 'বুইধ্যা' এইবারে একটু চালাক-চতুর হবে।" ফুলমামা মাকে বললেন, "সোনাদি, তোমার ছেলে ছুটিতে বাড়ি এলে আর ডালভাত, তরকারি, মাছের ঝোল ওর মুখে রুচবে না, শিবপুরে সকাল-দুপুর-বিকেল-সন্ধে ব্রিটিশ খানা খেয়ে।"

শিবপুর ব্রিটিশ আমলে তৈরি ভারতবর্ষের দ্বিতীয় এবং বাংলার প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং

কলেজ। ১৮৫৬ সালে এর পত্তন হয়েছিল তৎকালীন রাইটার্স বিল্ডিং-এ তিনটি ঘর নিয়ে। প্রিন্সিপ্যাল ই.সি. উইলিয়ামসের মাইনে ছিল মাসিক ছশো টাকা, যা আজকালকার মূল্যে লাখ টাকাকেও ছাড়িয়ে যাবে। ১৮৮০ সালে শিক্ষায়তনটি উঠে আসে গঙ্গার ধারে পুরোনো বিশপস্ কলেজের বাড়িতে, যে বিশপস্ কলেজে মাইকেল মধুসূদন কিছুদিন আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তখন এর নাম হয় গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, হাওড়া। পরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর। এ ছিল সেই আমল যখন বাঙালিদের নামের বানান সাহেবদের জিভের উচ্চারণক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হত, তিনকড়ি ছিলেন টিন্‌কৌরি, অধীর দত্ত অ্যাডেয়ার ডাট্ট্র। প্রথম পাস করে বেরোনো বাঙালি ছাত্রদের কয়েকটি নাম জানা যায় (পাঠকরা আসল নাম আন্দাজ করতে চেষ্টা করুন) ডিন্নো ন'থ সেন, মোথোরা ন'থ চ্যাটার্জি, ওমেস চান্ডার ঘোষ, জাডুব চান্ডার ডে, বয়কান্টো ন'থ ডে।

যে-কলেজের জন্মবৃত্তান্ত এবং ঠিকুজিকোষ্ঠি এইরকম, সেটি লোকের কাছে সাহেব-তৈরির আখড়া বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য ১৯৫০ সালে কলেজের খাতাপত্রে জাডুব চান্ডার বয়কান্টো ন'থ-রা যাদবচন্দ্র এবং বৈকুণ্ঠনাথে স্বাভাবিকত্ব লাভ করেছেন, কিন্তু সাহেবি আমলের নিয়মকানুন তখনো ছাত্রদের ঘাড় ধরে আছে। ওখানকার ডিসিপ্লিন তখনো একেবারে মিলিটারির মতো। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া এবং জামাকাপড়ের সম্বন্ধে বাইরের লোকদের ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত, সেটা আমি পরে ক্রমশ টের পেয়েছিলাম।

যে ব্যাপারে আমার বুকে প্যালপিটেশন শুরু হয়ে গেল সেটা হচ্ছে, কলেজের হোস্টেলের নিয়মাবলির মধ্যে একটি শর্ত চোখ রাঙিয়ে বলছে—No musical instruments can be brought into the hostels! তবে কি আমার সরোদ বাজানোর এইখানেই ইতি? বাবা-মাকে বললাম, অন্যত্র চেষ্টা করা যাক, এই কলেজে হোস্টেলেই থাকতে হবে, বাইরে থেকে পড়ার নিয়ম নেই।

বাবা-মাও চিন্তায় পড়ে গেলেন। শেষে ব্যবস্থা হল, শিবপুরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের বড়োকর্তা প্রফেসর করুণা রায়ের কাছে দরবার করে কিছু সুরাহা করা যায় কিনা, তিনি নাকি সংগীতপ্রেমিক লোক। গেলাম দুরুদুরু বুকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

নাম করুণাময় রায়, কিন্তু তিনি সর্বত্র করুণা রায় নামেই পরিচিত ছিলেন। ভদ্রলোকের চেহারা, কথাবার্তা এবং তাকানোর মধ্যে করুণার লেশমাত্র দেখতে পেলাম না। ঘরে ঢুকে দেখি, সেখানে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমার আগের দুজন দর্শনার্থী—একজন হচ্ছেন শিবপুর কলেজ-ক্যাম্পাসের কেয়ারটেকার, আরেকজন একটি ছাগল। রায় সাহেবের অগ্নিদৃষ্টির সামনে দুজনেরই চেহারা প্রায় একই রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রায় সাহেব পাতলা ছিপছিপে চেহারার মানুষ, চোখে গোল্ড রিমের চশমা। রাগলে তাঁর চোখ দুটি এত বড়ো বড়ো হয়ে যেত যে মনে হত সেগুলো চশমার ফ্রেমের থেকেও বড়ো।

সেইরকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রায় সাহেব বলছেন, "কেয়ারটেকারবাবু, টেক কেয়ার! হাইড্রলিকস-এর লেকচারারের বসবার ঘর কি (ছাগলটার দিকে আঙুল দেখিয়ে) ওর টাট্টিখানা? অবস্থা যদি এরকমই হয়ে থাকে, তা হলে কাল থেকে তোমার অফিস ঘরটায় ওকে বসতে দাও, তুমি মাঠে চরে বেড়াও! এই সব যদি কন্ট্রোল করতে না পারো, তবে

কোনদিন দেখব যে ওটা প্রিন্সিপ্যালের ঘরে ঢুকে তাঁর চেয়ারে বসে আছে। সাবধান হও, নইলে you and (আবার ছাগলটাকে দেখিয়ে) this fellow will have to leave the College campus hand in hand!"

আমি মনে মনে ভাবছি, একটা ছাগল কীভাবে চেয়ারে বসতে পারে এবং তার হাত ধরে হাঁটাই বা কেমন করে যায়। এই সময়ে রায় সাহেবের নজর আমার ওপর পড়ল, "তোমার কী দরকার?"

আমার তখন মাথা সম্পূর্ণ গুলিয়ে গেছে। বলতে শুরু করলাম, "স্যার আমি এই কলেজে অ্যাডমিশন পেয়েছি..."

"অ্যাডমিশন পেয়েছ, তা আমাকে বলতে আসার কী দরকার? সোমবার সকালে বাক্সপ্যাটরা সুদ্ধু এসে জুতে যাও!"

মিনমিনে গলায় নিবেদন করলাম আমার সমস্যার কথা। বললাম, "আমি ছোটো বয়স থেকেই একটা বাজনা বাজাই, কিন্তু হোস্টেলে কোনোপ্রকারের বাজনা আনা নিষেধ। এই নিয়মের হাত থেকে কি কোনোরকমে আমাকে রেহাই দেওয়া যায় না?"

"দ্যাখো হে ছেলে, এই কলেজটায় সম্পূর্ণ মিলিটারি ডিসিপ্লিন। হয় বাজনা বাড়িতে রেখে আসবে, নয় এখানে আসবেই না।"

এ আবার কেমন লোকের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা! আরেকবার শেষ চেষ্টা করলাম, "স্যার; কোনো উপায়ই কি হয় না?"

"বললাম তো, একটাই উপায়—হয় বাজনা বাড়িতে রেখে এসো, নয় এসো না। এটা অত্যন্ত সিরিয়াস জায়গা, ওসব গানবাজনা-ফাজনার এখানে কোনো স্থান নেই।" এই 'ফাজনা' শব্দটি কানে ঘ্যাচ করে লাগল।

মরিয়া হলে কেঁচোও যেমন কামড়াবার চেষ্টা করে, আমার তখন সেই অবস্থা। ভয়, বিনয় সব অন্তর্হিত হয়েছে। বললাম, "আমার গানবাজনাটা ইয়ার্কি ফাজলামির সামিল নয় স্যার, আমি পড়াশুনোর মতোই 'সিরিয়াস'ভাবে ওটা করে থাকি এবং তাতে পড়াশুনোর খুব ক্ষতি হয়নি, অন্তত এই কলেজের দরজা অবধি তো আসতে পেরেছি।"
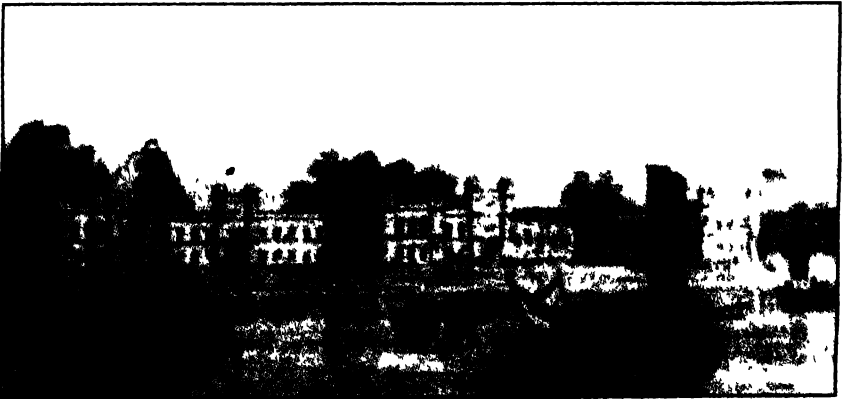
শিল্পীর চোখে বিশপ্‌স কলেজ যার একাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বি. ই. কলেজ, অধুনা কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়

"তুমি কী চাও—ইঞ্জিনিয়ার হবে, না বাজিয়ে হবে, কনফারেন্সে রেডিওতে প্রোগ্রাম করবে?"

আমি বললাম যে আমি ইতিমধ্যেই কনফারেন্সে বেশ কয়েকবার বাজিয়েছি, রেডিওতে বাজিয়ে থাকি।

"রেডিওতে বাজাও?"

আজ্ঞে এর পরের রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় আর রাত্রে নটায় আমার বাজনা আছে, অনুগ্রহ করে যদি শোনেন।

রায় সাহেবের অগ্ন্যুদ্গীরণ খানিকটা থমকে গেল, একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। এরপরে বললেন, "ঠিক আছে, কিন্তু বাজনা হোস্টেলে নেওয়া কোনোমতেই যাবে না। আমার কোয়ার্টার্সে একটা ছোটো বাইরের ঘর আছে, সেখানে তুমি যন্ত্র রাখবে। রোজ ক্লাস হয়ে যাবার পরে চারটে থেকে ছটা অবধি ওই ঘরে বসেই প্র্যাকটিস করবে। কিন্তু ছটার পরে এক মিনিটও যদি থাক, তাহলে (আবার চোখগুলো বড়ো হয়ে চশমাকে ছাপিয়ে উঠল) বাজনাসুদ্ধ কলেজ থেকে বার করে দেব।"

ফাঁসিকাঠে ঝুলবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে যদি আসামির মৃত্যুদণ্ড মকুব হয়ে যায়, তখন তার মানসিক অবস্থা যা হয় আমারও তাই হল। হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগলাম, রায়সাহেব কী ধরনের বহুরূপী।

কলেজে ঢুকে ওঁর বাড়িতে যন্ত্র রেখে দিলাম। রোজ সন্ধ্যা ছটা অবধি বাজাতাম। উনি একদিন এসে শুনে চলে গেলেন। তার পরদিন আমাকে বাড়িতে ভেতরে ডেকে পাঠালেন, দেখি উনি হারমোনিয়ম নিয়ে একজন তবলিয়ার সঙ্গে মেয়েকে খেয়াল শেখাচ্ছেন, উনি শাস্ত্রীয় সংগীত বিলক্ষণ জানেন! শুধু তাই নয়, ওঁর স্ত্রী প্রত্যহ আমি চারটের সময় ক্লাস থেকে এলে চা-জলখাবার পাঠিয়ে দিতেন।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কয়েকটি বিভাগ ছিল। সব থেকে আগে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থাৎ বাড়ি-ঘর-দোর রাস্তাঘাটা-ব্রিজ এইসব সংক্রান্ত শিক্ষা। তারপরে মেকানিক্যাল, অর্থাৎ লোহালক্কড়ের যন্ত্রপাতি, স্টিম ইঞ্জিন-বয়লার-পেট্রোল ইঞ্জিন-টারবাইন-পাম্প-ক্রেন ইত্যাদি তৈরি করার শিক্ষা। ইলেকট্রিক্যাল, নামেই বোঝা যাচ্ছে ইলেকট্রিসিটি সংশ্লিষ্ট সব যন্ত্রপাতি, কেবল এই সবের বিদ্যা। এ ছাড়া ক্রমে ক্রমে আরো কয়েকটি বিভাগ তৈরি হয়, যথা মেটালার্জি (ধাতুবিদ্যা) এবং আর্কিটেকচার বা স্থাপত্যবিদ্যা।

আমরা ঢোকবার আগে বিভাগগুলির বড়োকর্তা সাহেব ছাড়া কেউ হতে পারত না। আমরা যখন গেলাম তখন কয়েকজন ভারতীয়, অধিকাংশই বাঙালি, সেইসব পদ অলংকৃত করছেন, তাঁরা সাহেবদের থেকে কিছু কম দোর্দণ্ডপ্রতাপ নন। প্রতিষ্ঠার দিন থেকে যে-সব বিদেশি প্রিন্সিপ্যাল রাজত্ব করে গেছেন, তাঁদের নামে ছাত্রদের থাকার হোস্টেলগুলির নাম : স্লেটার, ডাউনিং, হিটন, তারপরে ম্যাকডোনাল্ড, উলফেন্ডেন। এক

কলেজে পড়ার সময়ে আমি

প্রফেসর অতুলচন্দ্র রায়

নম্বর গেট দিয়ে ঢুকলেই চোখে পড়ত লন্ডনের বিগ বেন-এর ক্ষুদ্র সংস্করণ একটি ক্লক টাওয়ার, তার ঘড়িটির ঘণ্টা-আধঘণ্টার আওয়াজ এখনো মনে প্রতিধ্বনিত হয়। কলেজের বিল্ডিংগুলি অধিকাংশই একতলা এবং ও-দেশের প্রাচীন শিক্ষায়তনগুলির ধাঁচে তৈরি, পরে বড়ো বড়ো বহুতল বাড়ি করা হয়।

বিভাগীয় প্রধানদের মধ্যে করুণা রায়ের সঙ্গে কলেজে ঢোকবার মুখেই পরিচয় হয়েছিল। আর যে-কয়েকজন চেহারা এবং কথাবার্তা মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে গেছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন : অতুলচন্দ্র রায় বা সংক্ষেপে এ. সি. রায়, মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, যিনি গ্লাসগোতে সব সাহেব-ছাত্রদের পরীক্ষায় গাঁট্টা মেরে সাহেব-অধ্যাপকদের তাক লাগিয়ে দিয়ে 'ব্ল্যাক জুয়েল' নামে ওখানে খ্যাত হয়েছিলেন (ব্ল্যাক জুয়েল নামের কারণ ছিল তাঁর কুচকুচে কালো গায়ের রঙ এবং ততোধিক কালো চোখ)। অশোক সান্যাল, ড্রয়িং-এর প্রফেসর, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে মোটামুটি পাঁচ ফুট করে, অতিশয় রাশভারি, অন্তত ছাত্রদের ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ইয়ার অবধি। ডক্টর সুধীররঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রিন্সিপ্যাল। এবং মেকানিক্যাল-এর বড়োকর্তা আর.জি.পি.এস. ফেয়ারবার্ন, কট্টর স্কচম্যান, আমরা আড়ালে ডাকতাম রসগোল্লা-পান্তুয়া-সন্দেশ ফেয়ারবার্ন বলে।

অবশ্যই আর-একজন শিক্ষকের কথা বলতে হবে, যাঁর নাম বীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, 'বীরেন মাস্টার'। ছাত্র থেকে প্রিন্সিপ্যাল অবধি সবাই যাঁকে মাস্টারমশায় বলে ডাকতেন এবং তিরিশ বছর ধরে শিবপুরের সব ছাত্রকে পড়িয়েছেন। তাঁর কিছু কিছু কথাবার্তা এবং তিরস্কার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দেয়ালে দেয়ালে গ্রথিত রয়ে গেছে। যথা সময়ে তার অবতারণা করা হবে।

কলেজে ঢোকার পরদিন সকালেই নবাগত ছেলেদের একটি ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। এই কলেজটা কীরকম জায়গা, আগেকার স্কুল-কলেজের সঙ্গে এর পার্থক্য কী, আমাদের কীভাবে চলতে হবে—এইসব বিষয়ে উপদেশের

গুলিবৃষ্টি, মূল বন্দুকবাজ হচ্ছেন প্রফেসর সান্যাল। কথার চাবুক মেরে সবাইকে একলাইনে, সোজা করে, হাত শরীরের দু-পাশে সাঁটিয়ে মাথা উঁচু রেখে, চোখের দৃষ্টি সোজা স্থির রেখে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর চলল কথার মেশিনগান। সবকিছু কথারই অন্তিম বক্তব্য, 'কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হবে'—পুজোর কিছু কিছু মন্ত্রে যেমন 'নমঃ' অথবা 'স্বাহা' কথাটা বার বার উচ্চারিত হয়। ক্লাসে আসতে এক মিনিট দেরি করলে বের করে দেওয়া হবে। কথা বললে বা গোলমাল করলে দূর করে দেওয়া হবে। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ক্যাম্পাসের রাস্তায় কেউ যদি ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে ঘোরে তাকে পত্রপাঠ মেইন গেটের দিকে মুখ ফিরিয়ে গলাধাক্কা দেওয়া হবে। শনিবার একটা থেকে রবিবার রাত ন-টা অবধি বাইরে থাকবার অনুমতি, তার বেশি থাকলে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাৎসরিক পরীক্ষায় একটা সাবজেক্টে ফেল করলেই আর পরের বছরে প্রোমোশান নেই, ওই ইয়ারেই তাকে আর-এক বছর রাখা হবে, তখন তার নামকরণ হবে repeater। দ্বিতীয়বার ফেল করলেই দূর করে দেওয়া হবে, তখন তার নাম হবে C.N.R বা can not repeat.

নবাগত ছেলেদের এই ধরনের অভ্যর্থনায় বোধহয় কলেজ কর্তৃপক্ষের একটা সুচিন্তিত কর্মধারা ছিল। তাঁদের ধারণা—সব বিভিন্ন গোয়াল থেকে এসেছে, রাস্তায় একটা গোরুর পাল ছেড়ে দিলে তারা যে-কাণ্ড করে তেমনই এই ছোকরাদের গতিবিধি। প্রথম দিন থেকে পাঁচনবাড়ি দিয়ে পিটিয়ে ঘনঘন ল্যাজ না মললে এদের বশে রাখা যাবে না।

ফায়ারিং খাবার পরে অবসন্ন চিত্তে হোস্টেলে ফিরছি, বড়দা (আমার বন্ধু প্রসূন ব্যানার্জি) বলল, "কই, মাগুর, শোল এসব জ্যান্ত মাছ কাটতে দেখেছিস? ওগুলো এত ধড়ফড় করে যে ঠিকমতো হাতে ধরে কাটা মুশকিল। তাই হয় ওদের ধরে ধরে আগে আছাড় মারে, নয়তো একটা কাঠের খোঁটা দিয়ে মাথায় ঘা মেরে অবশ করে দেয়, তারপর কাটাকুটি করে—এটা হল সেইরকম ব্যাপার।"

এরপরে ক্লাস আরম্ভ হল। নানারকম মাস্টারমশায়, নানা রকমের পড়ানোর ধারা। প্রথম দিনেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ডক্টর সুধীররঞ্জন সেনগুপ্তর ক্লাস, 'অ্যাপ্লায়েড মেকানিকস' অর্থাৎ ব্যবহারিক যন্ত্রবিজ্ঞান। ভদ্রলোক যেমন বেশি পণ্ডিত, তেমনি তাঁর পড়ানোও অবোধ্য। পড়ানো শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর অঙ্কে ব্যবহৃত একগাদা গ্রিক হরফ, যথা ডেল্টা, কাপ্পা, জাই, মিউ, ঈটা, আলফা, বিটা ইত্যাদি একমুঠো চানাচুরের মতো ছিটিয়ে দিতেন। নিজের বোধশক্তি এত দ্রুতগামী ছিল যে একটা স্টেপের পরে চার-পাঁচটা স্টেপ বাদ দিয়ে ষষ্ঠ স্টেপে উপস্থিত হতেন। যেমন, পাঁচুর সঙ্গে টেঁপির প্রেম খুব জমে উঠেছে, এটা যদি অঙ্কের কোনো একটা স্টেপ হয় তো তার পরেই দেখা যাবে—পাঁচুর একটা ছবি, একটা নেড়ামুণ্ডু ছেলে তার সামনে বসে শ্রাদ্ধের কাজ করছে, পাশে টেঁপি বিধবার কাপড়ে বসে আছে। অর্থাৎ মাঝখানে পাঁচু-টেঁপির বিবাহ, ছেলের ভূমিষ্ঠ হওয়া, পাঁচুর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি এবং দাহকার্য সমাধা, এ সবই তৎক্ষণাৎ বুঝে নিতে হবে! এতে যে-গাধার মাথা গুলিয়ে গেল, তার বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াই উচিত নয়! ভয়ে কোনো ছেলে জিজ্ঞাসা করতে পারত না,

স্যার, এখানটা একটু বুঝিয়ে দেবেন।

এইভাবে ডক্টর সেনগুপ্তের ক্লাস বীরবিক্রমে চলতে লাগল, অ্যানুয়াল পরীক্ষা শিয়রে এসে উপস্থিত, অ্যাপ্লায়েড মেকানিকস দাঁত খিঁচিয়ে তাকিয়ে আছে। প্রাণের ভয়ে ছেলেরা গিয়ে পড়ল প্রফেসর এ.সি. রায়ের কাছে। উনি সব শুনে বললেন, ''সর্বনাশ! প্রিন্সিপ্যালের ক্লাস আমি নিমু ক্যাম্‌নে? আমার চাকরিটা খাইতে চাও?'' উনিও রাজি হচ্ছেন না, আমরাও নাছোড়বান্দা। এমনি সময় হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল। খড়্গপুরে আই.আই.টি তৈরি হয়েছে নতুন, ডক্টর সেনগুপ্ত সেখানে কী কাজে সাতদিনের জন্য চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর রায় অন্যান্য সব ক্লাসগুলি বন্ধ করে সোম থেকে শনি অবধি একটানা সব কটা পিরিয়ড আমাদের পড়াতে শুরু করলেন।

সে-পড়ানো চিরকাল মনে থাকবে। আশিটা ছেলের ক্লাসকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে প্রফেসর রায় এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে অ্যাপ্লায়েড মেকানিকসের মধ্য দিয়ে দৌড়োচ্ছেন, একটা ছেলেও পেছনে পড়ে থাকছে না। গোলমেলে অধ্যায়ের বাধাবিঘ্ন সব নিমেষের মধ্যে অতিক্রম করছেন, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যেমন আস্ত একটা মোষকে কাঁধে তুলে অবলীলাক্রমে বেড়া-পাঁচিল টপকায়। ছ-দিনের মধ্যে অ্যাপ্লায়েড মেকানিকস এক্কেবারে গলে জল! ছাত্রদের মুখচোখ দেখেই তাদের মনের মধ্যে ঢুকে বোঝবার বাধাগুলি চিনে নিয়ে সেগুলি উপড়ে ফেলার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন অতুল রায়।

প্রফেসর অশোক সান্যালের ক্লাসে নানারকম চমকপ্রদ ঘটনা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। তিনি শেখাতেন ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং—বাড়ি-ঘরদোর, যন্ত্রপাতি, স্টিম ইঞ্জিন ডিজেল ইঞ্জিনের নানা অংশের নকসা। হাত-তিনেক লম্বা এবং দু-হাত চওড়া মোটা মোটা কাগজের শিট-এর ওপর বিলেত থেকে আমদানি-করা ড্রয়িংপেন্সিল এবং ইরেজার দিয়ে সেগুলি আঁকা হত বিরাট সাইজের ড্রয়িংবোর্ডের ওপরে শিটগুলোকে এঁটে। এইজন্য ড্রয়িং ক্লাসের টেবিলগুলি একটু অন্যরকমের হত। ছাত্রের বুকের দিকটা নিচু আর বাইরের দিকটা উঁচু যাতে শিটটা কাত হয়ে থাকে, সামনের দিকে না-ঝুঁকে শিটের ওপাশ পর্যন্ত দেখা যায় এবং হাত রাখা যায়। সান্যাল সাহেবের দৈর্ঘ্য পাঁচফুটের বেশি ছিল বলে মনে হয় না, সুতরাং তিনি টেবিলের ওধারে এসে দাঁড়ালে তাঁকে প্রায় দেখাই যেত না। বড়োজোর তাঁর কপালটা আর হাড়-হিম-করা চোখদুটো জেগে উঠত, ঠিক মনে হত ঝোপের ওপাশে দাঁড়ানো একটা বাঘ যেন মুণ্ডু উঁচু করেছে।

যার ওপর খুশি থাকতেন, তার পাশে একটা টুল টেনে বসে নিজেই খানিকটা এঁকে তাকে শেখাতেন, টুলের ওপর উনি বসলে পা-দুটো মাটি ছুঁতে পেত না, শূন্যেই লটরপটর করত। যার ওপর রাগ হত, তাকে ক্লাস থেকে বার করে দেওয়া, পার্সেন্টেজ কাটা, এ-সব ছাড়াও আরো ভয়ংকর শাস্তি ছিল পটাপট তার দামি ড্রইংশিটটা ছিঁড়ে ফেলা, তাতে হয়তো কয়েকদিনের কাজ করা আছে, সমস্ত পরিশ্রমটা বরবাদ। আজকালকার দিন হলে এর প্রতিক্রিয়া কী হত তা বোঝাই যায়, কিন্তু আমাদের প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না। তার কারণ, আমরা শুনেছিলাম ওঁর মতো ড্রয়িংয়ের শিক্ষক সারা ভারতবর্ষে নেই। সেই সমীহটা ছাড়াও আমাদের সংস্কারই ছিল অন্যরকম, তখনকার

নিতান্ত ডাকাবুকো ছেলেও মাথা তোলবার সাহস পেত না।

সান্যাল সাহেব কখনোই ক্লাসের ভেতরে নিজের জায়গায় বসতেন না, ছাত্রদের ড্রয়িং টেবিলগুলির মধ্যে ঘুরতেন। সুতরাং ক্লাসে তাঁকে খুঁজে বার করা আর হোগলার ঝোপে বাঘকে খুঁজে বার করা একই রকম দুঃসাধ্য ছিল। আর সেইটাই ছিল ভীষণ বিপদের ব্যাপার। তিনি আসার পরে যে-ই ক্লাসে আসুক না কেন, খুঁজে খুঁজে তাঁকে বার করে তাঁর কাছে গিয়ে মাপ চেয়ে, খিঁচুনি খেয়ে, তবে নিজের জায়গায় বসার অনুমতি পেতে হত।

একদিন আমার এক বন্ধু রমেন চক্রবর্তী বেশ কয়েক মিনিট দেরি করে ক্লাসে এসে সটান নিজের জায়গায় ড্রয়িংবোর্ড পেতে কাগজপত্র লাগিয়ে আঁকা শুরু করেছে। সান্যাল সাহেব তাকে গিয়ে ধরলেন, ''তুমি দেরি করে এসেছ, ঢোকবার আগে আমার পারমিশন নিয়েছিলে?''

রমেনের চটপট উত্তর, ''আমি তো আপনাকে দেখতেই পাইনি, স্যার। দেখতে পেলে তো পারমিশন নেব।''

ক্লাসময় চাপাহাসির ঢেউ বয়ে গেল, সান্যাল সাহেবের মুখ লাল।

রমেনের যথাবিহিত ধোলাই হল। রমেন নির্বিকারচিত্তে তার মধ্য দিয়ে গেল এবং অল্প কয়েকদিন বাদে শিবপুর ছেড়ে দিয়ে যাদবপুরে গিয়ে ভর্তি হল। অন্তিম বাণী দিয়ে গেল, ''এমুন ছোটোলোকের কলেজে কোন হালায় পড়ে!'' রমেন উত্তরকালে আমেরিকায় বিশাল ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিল, এখনো সেইখানেই আছে।

সান্যাল সাহেব প্রায়শই মধ্যমপুরুষের ক্রিয়াপদকে উত্তমপুরুষে টেনে আনতেন, অর্থাৎ কাউকে ''কাল কলকাতা গিয়েছিলে?'' জিজ্ঞাসা করতে গেলে বলতেন ''কাল কলকাতা গিয়েছিলাম?'' এইরকম—''আজকাল কি সন্ধেবেলায় মায়াপুরীতে সিনেমা দেখেই কাটাই?'' অথবা ''কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছি কেন, বাড়ির প্ল্যানটা কি ওখানে আঁকা আছে?''

একটি ছেলে একটি বাড়ির নকশা আঁকতে গিয়ে কোণাগুলি বিশ্রীভাবে ভুল করে এঁকেছে। তাকে ধরে কিঞ্চিৎ শুদ্ধিক্রিয়া করবার পর সান্যাল সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ''ম্যাট্রিকুলেশন-এ কি কোনোদিন জিওমেট্রি পড়েছিলাম?''

ছেলেটি ভয়ে সিঁটিয়ে বোবা হয়ে গেছে। সান্যাল সাহেব আবার বজ্রনির্ঘোষে বললেন, ''পড়েছিলাম?''

এতক্ষণে ছেলেটির মুখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কথা ফুটল। ভাষা শুনে বোঝা গেল, সে আদি উত্তর কলকাতার বাসিন্দা, ''আপনি স্যার... জিওমেট্রি... পড়ে... ছেলেন কিনা, সেটা আমি কী করে জানব, স্যার?''

এক নম্বর গেট এবং দু-নম্বর গেটের কাছে দুটি খাবারের দোকান ছিল, একটি 'রাণুবালা' অন্যটি 'জ্যাঠামশায়ের দোকান'। ছাত্রদের কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজের কফি হাউসের বিকল্প। কোনো সন্ধ্যায় সিনেমা দেখা বা ব্যাতাইতলা বাজেশিবপুর

অঞ্চলে ঘোরাঘুরি না থাকলে এই দুটিই ছিল আমাদের জমবার জায়গা।

অধ্যবসায়, বিশেষ করে অসাধু অধ্যবসায় যে বাঙালির ব্যবসায়ে উন্নতির কতবড়ো সহায়ক তা রাণুবালায় না গেলে বোঝা যেত না। একদিন আমি ডবল ডিমের ওমলেট এবং দু-পিস টোস্টের অর্ডার দিয়ে বসে আছি। ম্যানেজার সুরেনবাবু পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় নানা প্রিয়বাক্য বলে খদ্দেরের মন ভেজাচ্ছেন। ওমলেট-টোস্ট যখন পৌঁছোল তখন দেখি, টোস্ট দুটি তৈরি হয়েছে পাঁউরুটির দুটি প্রান্ত, উত্তরমেরু আর দক্ষিণমেরুর থেকে, দু-দিকের দুটি পিঠ, শক্ত চামড়াওয়ালা।

টোস্ট দুটি সুরেনবাবুর কাছে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আজকাল এ-সব কী শুরু করেছেন?"

দেখেই জিভ কেটে সুরেনবাবু হুংকার ছাড়লেন, "হরা! অ'-রে হরা!! অহনি এদিগৎ আয়, নচ্ছার কুথাকার!"

হরা ওঁর দোকানের তিন-চারটি ছোকরার একটি। এসে দাঁড়াল নিতান্ত নির্বিকার মুখে, সুরেনবাবুর সম্ভাষণে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। আর এক চক্কর বাপান্ত করে সুরেনবাবু বললেন, "পালটাইয়া লইয়া আয়, মাইঝখানের স্লাইস, তাড়াতাড়ি!!" হরা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল, পনেরো মিনিট কেটে গেল, ওমলেট ঠাণ্ডা অখাদ্য হয়ে যাচ্ছে, মাছি তাড়িয়ে মরছি, হরার দেখা নেই।

শেষ অবধি যখন রুটির প্লেট ফেরত এল, তখন আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম যে এবারের রুটি দুটি মাঝখানের স্লাইস মোটেই নয়, সেই আদি অকৃত্রিম দুটি পিঠ। একটা ছুরির আগা দিয়ে খুব যত্নসহকারে পিঠের শক্ত চামড়াটা খুঁটে খুঁটে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে, বলা বাহুল্য, ব্যর্থ চেষ্টা।

সুরেনবাবুকে ডেকে দেখিয়ে বললাম, এর যদি বিহিত না করেন তবে আমি অন্যান্য ছাত্রদের ডাকব। তারপরে তারা কী করবে বুঝতেই পারছেন।

আবার তিনি হুংকার দিয়ে হরাকে ডাকলেন, হরা আবির্ভূত হল। সুরেনবাবু বললেন, "হা-রা-ম-Zা-দা! Zা, নান্টুর দোকান থিক্যা নূতন পাঁউরুটি লইয়া আয়, আমার কাছে লইয়া আইবি আমি স্লাইস কাইট্টা দিমু!" এই বলে তিনি রুটিসুদ্ধ প্লেটটা হরার মাথা লক্ষ করে ছুঁড়ে মারলেন।

যেভাবে অবলীলাক্রমে হরা প্লেটটাকে ক্যাচ লুফে নিল, আমার মনে হয়, তাই দেখলে জন্টি রোডস লজ্জায় গলায় দড়ি দিতেন।

মিনিট পঁয়তাল্লিশেক বাদে হরা ফিরে এসে নিবেদন করল, নান্টুর দোকানে পাঁউরুটি শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। কাজেই ও পাঁউরুটি পায়নি। আমি দাঁতে দাঁত চেপে অখাদ্য ওমলেটটাকে গিলে হোস্টেলমুখো রওয়ানা দিলাম।

পরে শুনেছিলাম সমস্ত ব্যাপারটাই সাজানো, নিতান্তই অভিনয়, একই অভিজ্ঞতা আরো অনেকের হয়েছে।

সাহেবি খাওয়া-দাওয়া ছিল একমাত্র হিটন হোস্টেলে, কারণ সেখানে অবাঙালি এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছাত্রদেরই রাখা হত। স্লেটার এবং ডাউনিং নামে সাহেব হলেও

খাওয়া ছিল পুরো বাঙালি। আমাদের প্রথম বছর এই হোস্টেলগুলির কোনোটাই জোটেনি। আমাদের রাখা হয়েছিল কতকগুলি ফুড কর্পোরেশনের গুদামের মতো করোগেটেড টিনের ঘরে, এক একটিতে ষোলোটা লোহার হসপিট্যাল বেডের মতো খাট এবং লকার, জানলা-দরজার পাল্লা মধ্যে মধ্যে থাকত না এবং থাকলেও বিশেষ বন্ধ হত না, রাত্রে খুলে রেখে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতাম, কোনো চোরের ক্ষমতা ছিল না যে ওখানে ঢোকে। তার কারণ আমাদের অতি বিশ্বস্ত প্রহরী ছিল খান-চল্লিশেক নেড়ি কুকুর। দুই সারি হোস্টেল শেড-এর মাঝখান দিয়ে যে-রাস্তাটা গেছে ওরা তার ওপরেই থাকত এবং আমাদের ভুক্তাবশিষ্ট খেয়ে মহানন্দে জীবনধারণ করত।

আমাদের খাবার ঘণ্টা পড়লেই ওরা বুঝতে পারত যে, আধঘণ্টার মধ্যেই ওদেরও খাবার জুটবে। তারই প্রত্যাশায় এবং উল্লাসে তারা সকলে একসঙ্গে আকাশের দিকে মুখ করে ও-উ-উ-উ-উ করে এমন একটি ঐকতান ছাড়ত যে খাবার ঘণ্টা কানে না-গেলেও ওদের এই ডাক শুনতে পেয়ে আমরা বুঝতাম খাবার সময় হল। খাবার ছিল সম্পূর্ণ বাঙালি মতে, মাসে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা খরচে রাজকীয় আহার এবং মধ্যে মধ্যে ফিস্ট।

করুণা রায় সাহেবের ভাষায় 'জুতে যাবার' মাস-ছয়েক পর একটি কলেজ সোশ্যালে বাজিয়ে আমার কিছুটা পরিচিতি হল। ব্যারাকে থাকতে থাকতে কলেজের

স্কেচ : সোমেশ রায়
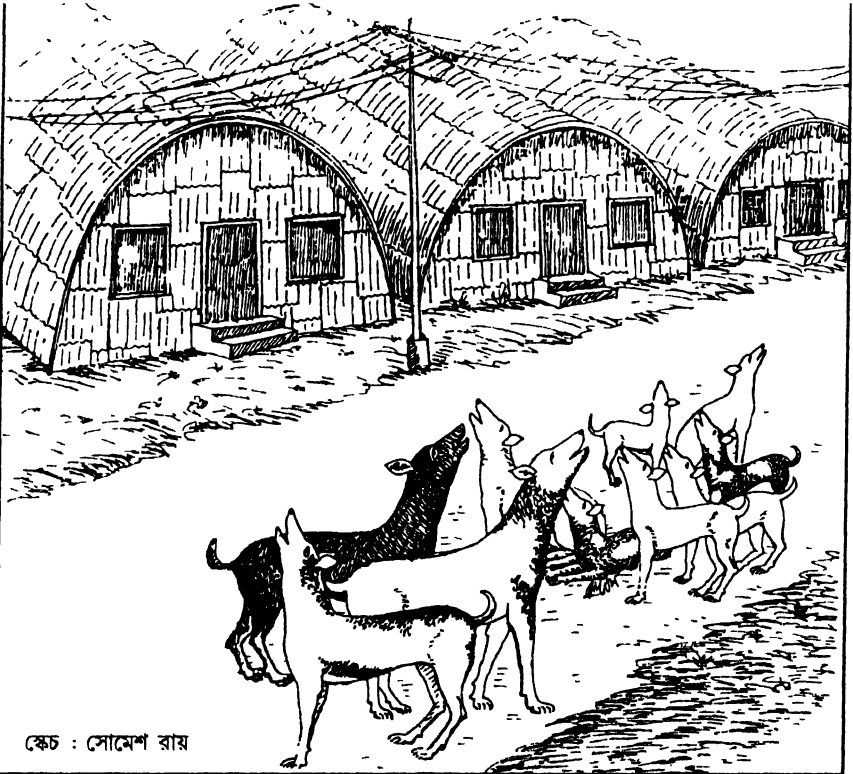
সমস্ত চোখরাঙানো নিয়মগুলির উপরে সমীহটা একটু ফিকে হয়ে এসেছিল, কারণ দেখলাম অনেক নিয়মই মানা হয় না। তাই একদিন সাহস করে সরোদটা ব্যারাকে নিজের বিছানায় নিয়ে গেলাম।

ব্যারাক-মেটরা সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ধরল। সরোদ অনেকেই দেখেনি, কেউ বলছে ওটা গিটার, কেউ বলছে ব্যাঞ্জো, কেউ বলছে ম্যান্ডোলিন। কেউ বলছে ওটার বিদঘুটে বেঢপ সাইজের জন্য ওটা গিটারের মতো কোমরে ঝুলিয়ে গান গাইতে গাইতে নাচা যাবে না, এ-এক useless যন্তর।

প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষ হল। পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় ব্যারাকে ফিরে রেয়াজ করতে বসলাম। আধঘণ্টাও রেয়াজ করিনি, একজন ছুটে এসে বলল, "থাম থাম, রক্ষে কর।"

"কেন, কী করলাম আমি?"

"ওই একটা লাইনই বার বার ঘ্যানর ঘ্যানর করছিস, পাগল হয়ে যাব যে? তুই কি শুধু ওটুকুই শিখেছিস?"

নাও ঠ্যালা। রেয়াজ মানে যে এক-একটা জিনিসকে ধরে ধরে বহুবার সেধে পালিশ করা, সেটা এদের কে বোঝাবে? তবুও বোঝাবার চেষ্টা করলাম, ওদের ওই এক কথা, লাইনটা তো আমি ঠিকই বাজাচ্ছি, তবে আর প্র্যাকটিস করা কেন?

মাথায় রক্ত চড়ে গেল। চেঁচিয়ে বললাম, "ছোটোবেলায় একটাই লাইন পাতার পর পাতা জুড়ে হাতের লেখা প্র্যাকটিস করিসনি শালারা? কেন করেছিলি বল! তখন যদি বলতিস লাইনটা তো একবার ঠিক লিখেছি আর কেন লিখব, তাহলে চড়-থাপ্পড় গাঁট্টা কানমলা খেতিস। প্রতিটি অক্ষর যেন সুন্দর স্পষ্ট হয়, লাইন এ্যাঁকাব্যাঁকা না-হয় তার জন্যই বারবার প্র্যাকটিস! মাথায় ঢুকল?"

তখনকার মতো ওরা চুপ করে চলে গেল। খানিকক্ষণ বাদে ফিরে এসে বলল, "একটা সিনেমার গান বাজা না!"

আমি খিঁচিয়ে উঠলাম, "ও সব ওঁচা গান আমি বাজাই না!"

"বাপরে বাপ, কী তেজ!" বলে ওরা আবার চলে গেল। খানিকক্ষণ বাদে আবার ফিরে এল, বলল, "অনেকক্ষণ তো ডঙ ডঙাডঙ ভঙ ভঙাভঙ হল, এবার একটা কেত্তন বাজা।"

আমার ঠাকুরমার ঝুলির গল্প মনে পড়ে গেল। লালকমল নীলকমল বন্ধ ঘরে রাত কাটাচ্ছে, আর বাইরে খোক্কসের পাল বার বার ফিরে এসে নানা উৎপাত করছে! একবার বলছে তোদের নখ কেমন দেখি, একবার বলছে তোদের থুতু কেমন দেখি, একবার বলছে তোদের জিভটা দেখব। বিপন্ন অবস্থায় মনে হল, আবার করুণা রায় সাহেবের পায়ে কেঁদে-পড়ে ওঁর বাইরের ঘরটাতেই সরোদ রেখে আসি।

এই সময়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন আমাদের একজন শিবপুরের দাদা, এক বছরের সিনিয়র, অমিতাভ দাশগুপ্ত। ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হচ্ছে? তোমরা ওকে উত্যক্ত করছ কেন?"

তখনকার দিনে এক বছরের সিনিয়র হলেও দাদাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। সামনে সিগারেট পর্যন্ত খাওয়া চলত না। খোক্কসের দল মিনমিন করে বলল, আমরা একটু

কয়েকটা গানের সুর শুনতে চাইছিলাম, ও এত ভালো বাজায়, কিছুতেই কথা শুনছে না। অমিতাভদা তখন আমাকে বললেন, ''বন্ধুত্বের খাতিরে এমন একটু-আধটু তোমায় করতে হবে, চার বছর এদেরই সঙ্গে কাটাতে হবে তো। তবে ওসব ইয়ার্কি-মারা গান তুমি ক্লাসের পরে পনেরো মিনিট ওদের শোনাবে। তারপর আমি এসে দু-ঘণ্টা বসে থেকে তোমাকে রেয়াজ করাব, দেখি কে টুঁ শব্দ করে!''

এইভাবে রফা হল। আধঘণ্টার মধ্যেই আমার হাতে পৌঁছে গেল একটুকরো কাগজ, তাতে লেখা আছে সাত নম্বর ব্যারাকের state musician হিসাবে কী কী গান আমাকে বন্ধুদের বাজিয়ে শোনাতে হবে :

১. ছি ছি এত্তা জঞ্জাল

২. তকদির, তকদির, তকদির বনা লে

৩. পাতলি কমরি হ্যায়, তিরছি নজরি হ্যায়

৪. শাম ঢলে, খিড়কি তলে তুম সিটি বাজানা ছোড় দো

৫. বরসাত মে তুমসে মিলে হাম

৬. হাওয়ামে উড়তা যায়ে মেরা লাল দুপাট্টা মলমল কা

৭. দিল কে টুকড়া হাজার হুয়ে, কোই ইঁহা গিরা কোই উঁহা গিরা

৮. এক ভুল্লর-ভাল্লর লড়কি, এক পাগল-উগল ছোঁড়া,
দোনো পিয়ার করতা দেখো, ও দেখো দেখো—!!!

(এখানটায় গলা একেবারে তার সপ্তকের মগডালে গিয়ে চড়বে, তারপর পোড়া হাউইয়ের মতো নেমে আসবে।)

দ্বা দ শ প রি চ্ছে দ

সফর

দিল্লি শহরের সঙ্গে আমাব পরিচয় ১৯৪৯-৫০ সালে। তখন আমার পিতৃদেব কিছুদিন কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টেব কাজ করতেন এবং বঙ্গভবনের একাংশে থাকতেন। বঙ্গভবন তখন আজকালকার মতন বিশাল আকাব ধারণ করেনি। একটি বড়োসড়ো একতলা বাংলো ছিল, চারপাশে ছিল প্রচুর জমি, গাছপালা।

তখন আমি শিবপুবে পড়ছি। ছুটির সময় দিল্লি গেলাম। বড়ো শখ ছিল একবার ফার্স্ট ক্লাসে চড়ব। পয়সা জমিয়ে বাহান্ন টাকা দিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটলাম। নিউদিল্লি স্টেশনে নেমেই বাবার কাছে ধোলাই—কেরানির ছেলে ফার্স্ট ক্লাসে চড়েছে, এ কীরকম লাটসাহেবি!

পরের দিন সকাল থেকে দেখি সাইকেলে করে নানারকম ফেরিওয়ালার মিছিল। মা-জি, দুধ চাই? মাছ চাই? সবজি চাই? রান্নার মশলা, ফিনাইল, সানলাইট সাবান চাই? এরকম ব্যবস্থা থাকলে গৃহস্থকে তো বাজারে যেতেই হবে না। ক্রমে জানলাম এইসব ফেরিওয়ালারা দেশভাগের আগে ছিল না, এরা সবাই পাঞ্জাব, সিন্ধু, পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত উদ্‌বাস্তু। এই কাজ করে জীবিকা নির্বাহ শুরু করেছে। বাঁচার লড়াই। এদের পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের তুলনা মেলা ভার। দুঃখের বিষয়, আমরা যারা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এসেছি, কথাটা খারাপ শোনালেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমরা এরকম পরিশ্রমী হতে পারিনি কোনোদিনই। আমরা 'ডোল' চেয়েছি, পয়সা-কড়ি গভর্নমেন্ট যা দিয়েছে তা খেয়ে উড়িয়েছি। তার কিছুটা অংশ দিয়ে নতুন জীবিকার ব্যবস্থা আমরা অধিকাংশ লোকেরাই করিনি, আরো 'ডোল' দাও বলে চেঁচিয়েছি। দণ্ডকারণ্যে সরকার বিনামূল্যে জমি আবাসন দিলে সে-জায়গা বনজঙ্গল-অধ্যুষিত এবং বাসের অনুপযুক্ত বলে চিৎকার করেছি। কখনো ভাবিনি যে, নিজে পরিশ্রম করে সেটাকে বাসযোগ্য করে তোলা যায়। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্‌বাস্তুরা একহাত জমিও না-পেয়ে

স্রেফ রাস্তায় থেকে আজ কীভাবে ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছে। এরা ঠিক বুঝেছে, ক্রেতা-সাধারণের কী চাই, কী ধরনের সেবা করলে ওদের সহানুভূতি পাওয়া যাবে।

হত্যা, রক্তপাত, গৃহদাহ, ধর্ষণের মধ্য দিয়ে এদের দেশত্যাগের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সে-যাত্রায় যারা পথের সাথী ছিল তাদের সকলকে পরম মমতায় আঁকড়ে ধরে এরা সবাই এক অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ এবং সমব্যথী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। বিপদে পড়লে কেবল নিজের স্বার্থটাই দেখব আর বাকি সকলে চুলোয় যাক, এরকম মানসিকতা ওদের কখনোই ছিল না। তরকারিওয়ালা যাবার সময় জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছে আর-কোনো জিনিসের বা সেবার প্রয়োজন আছে কি না। কারো হয়তো সাইকেল, রেডিও কিংবা মোটরসাইকেল খারাপ হয়ে পড়ে আছে, মেরামতির প্রয়োজন, জানতে পারলে তরকারিওয়ালারই প্রচেষ্টায় অল্পক্ষণের মধ্যে রেঞ্চ-স্প্যানার-হাতুড়ি নিয়ে মেকানিক হাজির।

মাছওয়ালার প্রতি আমার একটু বেশি দুর্বলতা, কারণ সে মাছ বিক্রি করবার পরে বিনাপয়সায় চার-পাঁচটা মাছের মুড়ো দিয়ে যেত। মাছের মাথার মর্ম অর্থাৎ মুড়িঘণ্টের স্বাদ ও-দেশের লোকেরা জানত না। আর-একটি ছেলের কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। সে কাঠের বাক্সভর্তি সানলাইট সাবান নিয়ে এসে দোকানের থেকে দু-পয়সা কম দামে বিক্রি করে যেত। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এভাবে তার চলে কী করে? সে বলল, পাইকিরি দরে সাবান কেনে, কোম্পানি কাঠের বাক্সভর্তি করে সাবান দেয়, সারাদিনে দশ-পনেরো মাইল মহল্লা ঘুরে ওর গোটা দুয়েক বাক্স সাবান বিক্রি হয়। দোকানের থেকে দু-পয়সা কমে বিক্রি করলেও তার কিছুটা তো লাভ থাকে। কিন্তু তারপরের ব্যাপারটাই আমার কাছে অচিন্তনীয়—ছেলেটি রাত্তিরবেলায় ওই কাঠের বাক্স দিয়ে খাঁচা, লেটারবক্স, ইঁদুর-ধরা কল এসব বানিয়ে বিক্রি করে, তাতে বেশ কিছু লাভ হয়। আমি একটি লেটারবক্স তার কাছ থেকে নিয়েছিলাম।

এখানেই শেষ নয়। অপিসের কাজকর্মে, মিটিং ইত্যাদিতে বাবার একটা নতুন কোট করাবার দরকার হয়েছিল। তখনকার দিনে শেরওয়ানি, প্রিন্স কোট ইত্যাদিতে প্রায়শই যে-কাপড়টা ব্যবহৃত হত তার নাম 'শার্ক স্কিন'। কনট প্লেসের কাপড়ের দোকানে শার্ক স্কিনের দাম জানা গেল আঠারো-উনিশ-কুড়ির কাছাকাছি। অত টাকা লাগবে জানা ছিল না। সেদিনকার মতো বাড়িমুখো হাঁটতে শুরু করলাম। কনট সার্কাসের বাইরের গোল চত্বরটা ছেড়ে হেইলি রোডে ঢুকতেই দেখি, ফুটপাথে কিছু লোক কাপড় বিক্রি করছে। প্রত্যেকেরই দোকানের সীমানা হচ্ছে দু-পাশে দুটো খাড়া করা খাটিয়া এবং দু-তিনটে ট্রাঙ্ক-ভর্তি কাপড়ের. কাটপিস, দু-একটা থান। আমাদের দেখেই তারা সাধ্যসাধনা শুরু করল—"সাহেব, আমাদের কাছ থেকে একবার কাপড় কিনে দেখুন!" সে কী অনুনয়-বিনয়!

বাবা শেষ অবধি বিব্রত এবং কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি যে-কাপড় চাই, তা তোমাদের কাছে নেই।"

"মেহেরবানি করে নামটা একটু বলুন না।"

"শার্ক স্কিন।"

যে-লোকটির সঙ্গে কথাবার্তা চলছিল তার কাছে শার্ক স্কিন ছিল না ঠিকই কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে হাঁকাহাঁকি করে পাশের একটি বেরাদরের বাক্স থেকে শার্ক স্কিন বার করে

হাজির করে দিল।

বাবা সন্দিগ্ধ চিত্তে কাপড়টা নেড়েচেড়ে দেখছেন আর লোকটি বাবার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণ করছে। বাবা কাপড়টার উপর ঠিক ভরসা করতে পারছেন না বুঝে সে বলল, ‘‘সাহেব, আমরা বাড়ি-ঘরদোর, বাপ-মা-ভাই-বোন-স্ত্রী অনেককে হারিয়ে এখানে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। আমরা যদি কাউকে ঠকাবার চেষ্টা করি তাহলে যে আমাদের কী সর্বনাশ হবে তা আমরা ভালো করেই জানি। আপনি বলুন আপনার কতটা কাপড় চাই, আমি থানের থেকে কেটে দিচ্ছি। আপনার টেইলারের কাছে কিংবা ওই কনট সার্কাসে বড়ো বড়ো দোকানে যাঁচ্ করিয়ে নিন এটা সেই একই কোয়ালিটির কাপড় কি না। না-হলে আমাকে ফেরত দিয়ে যাবেন।’’

‘‘দাম কত করে।’’

‘‘চোদ্দো টাকা করে গজ।’’

আবার আমরা ধন্দে পড়ে গেলাম। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। কিন্তু তখন বুঝতে পারলাম যে, ভালো সেলসম্যান হতে গেলে থট-রিডারও হতে হয়। লোকটি বলল, ‘‘এই মাল বড়ো দোকানে আঠেরো-উনিশ টাকায় গজ, আর আমি চোদ্দো টাকায় দিচ্ছি, সুতরাং ভাবছেন বাজে মাল! হিসেবটা খুব সোজা, সাহেব। ওদের বিরাট দোকান, কাচের শো-কেস, কাউন্টার, পাখা, এয়ার কন্ডিশনার, চার-পাঁচটা সেলসম্যান। আর আমার আছে এই খাটিয়া দুটো, ট্রাঙ্ক দুটো আর ফুটপাথটা। সাহেব, আপনাকে পয়সাও এখন দিতে হবে না, নিয়ে গিয়ে যাচাই করে নিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার মতো রইস এবং শরিফ আদমি এই মুমূর্ষু গরিবকে মারবেন না।’’

শেষ অবধি বাবার কোট ওই কাপড়েই তৈরি হয়েছিল। অবশ্য বাবা বিনাপয়সায় কাপড়টা নিয়ে যাচাই করতে যাননি, একেবারেই টাকা দিয়ে কিনেছিলেন, এবং পরে দেখা গেল ওটা সেই বড়ো দোকানেরই শার্ক স্কিনের সঙ্গে হুবহু এক। লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তার নাম গুরপ্রিত সিং, বাড়ি লাহোরের কাছাকাছি ছিল।

পরেরবার দিল্লি এসেই গুরপ্রিতের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আর খাটিয়া-ট্রাঙ্ক-ফুটপাথ সম্বল নয়, সেখানে কাঠের পাটাতন এবং কাঠের পার্টিশন দিয়ে একচিলতে দোকান দাঁড়িয়ে গেছে। গুরপ্রিত সিং জিন্দাবাদ!

উত্তরকালে এই রিফিউজিদের দোকানগুলি কনটসার্কাসের হোমরা-চোমরা দোকানগুলিকে এমনই ভয়ংকর প্রতিযোগিতায় ফেলে দিয়েছিল যে গভর্নমেন্ট তাদের সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র দোকান করে দিতে বাধ্য হন। এখনো এদের পরিশ্রম করবার ক্ষমতা এবং কাজ করবার গতিবেগ ঈর্ষণীয়। যে-কোনোদিন বিকেলে কাপড় কিনে অর্ডার দিলে পরের দিন সন্ধ্যায় টু-পিস স্যুট ডেলিভারি দিতে পারে। আমি নিজে কয়েকবার করিয়েছি। সে-জায়গায় আমাদের দর্জির কাছে যান না! হয়তো পনেরো দিন বাদে দেবে বলল। পনেরো দিন বাদে আপনি যখন গেলেন তখন মোটামুটি এই ধরনের বাক্য বিনিময় হওয়া নিতান্তই প্রত্যাশিত :

‘‘আপনার স্যুট? ওঃ, বসুন, বসুন। কী কাপড় দিয়েছিলেন বলুন তো।’’

‘‘আপনার স্যুট...হচ্ছে...প্রায় হয়ে এসেছে...সামনের বেস্পতিবার পেয়ে যাবেন।’’

সামনের বেস্পতিবার গিয়ে হয়তো শুনবেন ওস্তাগরের (যার বাড়ি মেটিয়াবুরুজ)

মায়ের দয়া হয়েছে। অন্তত কুড়ি দিন বাদে সে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে।

তারপরে যখন স্যুট হস্তগত হল তখন দেখলেন প্যান্টের একটা পকেট পুরো সেলাই হয়নি, টাকাপয়সার ব্যাগ রাখলেই সেটা পরহিতার্থে ভূমিষ্ঠ হবে, অথবা কোটের লাইনিং-এর খানিকটা সেলাই না-হয়ে ঝুলে আছে। সেটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, যেন ওটা কোনো ব্যাপারই নয়—এইভাবে হাত থেকে নিয়ে বলবে, শনিবার বিকেলে আসুন।

এই আমাদের কর্মসংস্কৃতি। কেন বাইরের লোকেরা আমাদের ঘেন্না করবে না?

বিভিন্ন সময়ে দিল্লি শহরের কাছ থেকে যে-সব মূল্যবান দান পেয়েছি তার মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে পণ্ডিত রবিশংকরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া। তিনি তখনো আজকের পণ্ডিত রবিশংকর হননি। অল্প বয়স, কিন্তু ইতিমধ্যেই সেতার বাজিয়ে সারা ভারতবর্ষে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। দিল্লি রেডিওতে কাজ করছেন।

বাবার বরাবরের বাতিক ছিল, যেখানেই যাবেন সেখানকার সংগীতজ্ঞদের খুঁজে বার করে তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন। সেভাবেই রবিশংকরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, মধ্যে মধ্যে ওঁর বাড়ি গিয়ে বাজনা শোনা এবং সাংগীতিক আড্ডা। ওঁর বাজনা বেশ কয়েকবার শোনা গেল, কিন্তু ওঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণার বাজনা বহু সাধ্যসাধনা সত্ত্বেও শুনতে পারলাম না। বাবা-মা, বিশেষ করে মা, যতবারই বলেন, একটু বাজনা শোনাও, ততবারই উনি বলেন, আমি কী জানি, কী বাজাব!

শেষকালে আমার মা একদিন বললেন, "দ্যাখো অন্নপূর্ণা, তুমি বাবার কাছে বিদ্যা এবং বিনয় দুটোই সমানভাবে শিখেছ। তুমি যে কত ভালো বাজাও সেটা আমরা বহু লোকের কাছ থেকে, এমনকী তোমার বাবার কাছ থেকেও শুনতে পাই। সুতরাং, তুমি বারবার এইরকম করাতে আমার মনে হচ্ছে, আমার মতন গানবাজনায় নির্বোধের সামনে তুমি বাজাতে চাচ্ছ না। তোমার বাবা কিন্তু আমার অনুরোধ ফেলে দেননি, বরঞ্চ অনুরোধ করার আগেই তিনি নিজ-হাতে চাদর পেতে আমাকে বসিয়েছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী শোনাব মা, আদেশ করেন।' "

অন্নপূর্ণা দেবীকে কোনোমতেই টলানো যায়নি। বাড়ি গেলেই অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা, আদর-যত্ন, খাওয়ানো-দাওয়ানো, কিন্তু বাজনা? নৈব নৈব চ।

এর মধ্যে একদিন রবিশংকর আমার মাকে বললেন, "বউদি, বুদ্ধদেবকে বাবার (আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের) কাছে দিয়ে দিন না! রাধুবাবু খুবই সুন্দর শেখাচ্ছেন, কিন্তু বাবার কাছে গেলে ও একটা অন্য ব্যাপার হয়ে যাবে।"

মা উত্তর দিলেন, "ভাই, ও কেরানির ছেলে, কেরানিগিরি করেই ওকে খেতে হবে। বাবার কাছে শিখবে, সে তো আমাদের সৌভাগ্য, কিন্তু দুটি কারণে আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। প্রথমত, শুধু শিক্ষা পেলেই যে ও বড়ো সংগীতজ্ঞ হবে তার কোনো স্থিরতা নেই। বিশেষ করে, আপনাদের উচ্চতায় পৌঁছতে ও কোনোদিনই পারবে না, কারণ রবিশংকর, আলি আকবর শুধু তালিম আর রেয়াজে তৈরি হয় না, তারা জন্মায়। দ্বিতীয়ত, রাধুবাবু হয়তো সম্মতি দেবেন, কিন্তু সবার অলক্ষে তাঁর বুক চিরে একটা

যৌবনে রবিশংকর

দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরোবেই। যে-গুরু বাল্যকাল থেকে ওকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের ছোটোবেলার যন্ত্র ওর হাতে দিয়ে একটি কপর্দকও না-নিয়ে, এমনকী সরোদের তার কোথায় পাওয়া যায় জানতাম না বলে নিজে তার কিনে দিয়ে ওকে শিখিয়েছেন, তাঁর দীর্ঘশ্বাস আমার ছেলের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না কখনোই। তার চেয়ে ভাই, ওকে আশীর্বাদ করুন, পড়াশুনার, চাকরি-বাকরির ধকলে ওর বাজনাটা যেন টিকে থাকে, একেবারে শেষ না হয়ে যায়। যদি বেঁচে থাকে, যতটুকু পারবে বাজাবে।"

প্রায় ত্রিশ বছর পরে, রবিশংকর কলকাতায় হিরুবাবুর (হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়) বাড়িতে বাজাতে এসেছেন। আমি এবং আমার মা বাজনা শুনতে এসেছি জানতে পেরেই গ্রিনরুমে আমাদের ডেকে পাঠালেন। মাকে বললেন, "বউদি, মনে আছে, বহুদিন আগে দিল্লিতে বুদ্ধদেবের বিষয়ে আপনাতে আমাতে কী কথা হয়েছিল? আপনার এই প্রিন্সিপলের জন্যেই সকলে আপনাকে সম্মান করে। আপনার ইচ্ছেই পূর্ণ হয়েছে। বুদ্ধদেব তো চাকরি করেও বাজাচ্ছে এবং ভালোই বাজাচ্ছে! আমাদের আশীর্বাদ বরাবর ওর ওপর ছিল এবং থাকবে।"

মা বললেন, "সেই আশীর্বাদটা আরো একটু বেশি করে দেবেন। চাকরি করে গানবাজনা হয়তো কেউ কেউ করেছে কিন্তু ওর মতন এরকম ভয়ংকর চাকরি— দিন নেই, রাত নেই, শনি-রবিবার নেই, উদয়াস্ত লোহালক্কড়-কয়লা-ধোঁয়া-আগুন, লেবার ঠ্যাঙানো অথবা লেবারের ঠ্যাঙানি, বসদের কানমলা, ল্যাজমলা, এর মধ্যে আর যাই থাকুক, গানবাজনা থাকতে পারে না। কতদিন টিকবে জানি না।"

আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে আমি না-যাবার জন্য মাইহার ঘরের সকলে আমার প্রতি বিরূপ তো হননি, বরং আমাকে তাঁদের বাড়ির ছেলেদের একজন করে নিয়েছেন। এটা আমার এক পরম প্রাপ্তি।

আমাকে দিল্লির দ্বিতীয় দান দেবেন্দ্র মূর্ধেশ্বর। আমার এক ভগ্নীপতি সেতারবাদক নরেন ঘোষের বন্ধু, সেই সূত্রে আলাপ। দেবেনদা ছিলেন উচ্চকোটির বংশীবাদক, পান্নালাল ঘোষের শিষ্য, জামাই এবং একমাত্র উত্তরসূরি। দিল্লি রেডিওতে স্টাফ-আর্টিস্টের কাজ করতেন। বাজনা ছাড়াও আরেকটি বিষয়ে তাঁর সমধিক ব্যুৎপত্তি ছিল,

সেটা হচ্ছে ক্যারিকেচার। অসাধারণ ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, যে-কোনো লোককে অল্পক্ষণ দেখেই তিনি তার চলাফেরা, গলার স্বর, বাচনভঙ্গি এবং বক্তব্যের নিখুঁত নকল করতে পারতেন। শিল্পীজীবনে যে-সব বড়ো বড়ো ওস্তাদ এবং পণ্ডিত যথা ফৈয়াজ খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, গোলাম আলি খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, গজানন রাও যোশি, আলি আকবর খাঁ ইত্যাদি আরো অনেককে তিনি দেখেছেন এবং তাঁদের নিয়ে যে-সব বিবিধ ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, এক নিমেষে সে-সব মানুষকে বা ঘটনাকে চোখের সামনে উপস্থিত করে ফেলতে পারতেন দেবেনদা। ফলে কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে রেডিওর ক্যান্টিনে তাঁকে ঘিরে ভিড় এবং হাস্যরোল লেগেই থাকত।

দেবেনদার আরেকটা গুণ ছিল ছবি আঁকা। তার পরিচয় এখনি পাঠকের সামনে উপস্থিত করছি। একবার বোম্বেতে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। উনি তখন বম্বে রেডিওতে বদলি হয়ে এসেছেন। টেবিলের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম, উনি এমনভাবে তাকালেন যেন আমাকে চেনেনই না। আমার প্রণামটা যেন পায়ের ওপর একটা মাছি বসল কি না-বসল সেইভাবে নিলেন এবং নির্বিকারভাবে চুপ করে রইলেন।

আমি তো হতভম্ব। যে-লোকটা আমায় দেখেই লাফিয়ে উঠে, জড়িয়ে ধরে, হয় মাথায় তিনটে মৃদু গাঁট্টা অথবা পিঠে তিনটে থাপ্পড় মেরে কাছে বসাতেন, তাঁর এ কী রূপান্তর! কী বলব ভেবে পাচ্ছি না, এই সময় উনি সামনের চেয়ারে আমাকে বসবার ইঙ্গিত করে একটা কাগজ টেনে নিয়ে তার ওপর পেনসিল চালাতে লাগলেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কীসের রিপোর্ট লিখছেন। উনি ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে চুপ করিয়ে দিলেন।

আরো মিনিট দশেক কাটল। এবার আমি বলতে গেলাম, ''দেবেনদা, আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি?'' ঝাঁঝালো স্বরে উত্তর এল, ''Shut up''। অগত্যা আমি বসেই রইলাম মাথায় রক্ত-চড়ে-যাওয়া অবস্থায়। মনে মনে ঠিক করলাম, আর পাঁচ মিনিট বাদে কোনো কথা না বলে স্রেফ উঠে চলে যাব।

কিন্তু তা আর করতে হল না। তার আগেই উনি কাগজটা আমার সামনে ফেলে দিলেন। আমার মুখের একটা পেনসিল-স্কেচ! ওঁর রূঢ় ব্যবহারে মুখের যা অবস্থা হয়েছে, তার নিখুঁত চিত্রায়ণ, কপালে ভ্রূকুটির রেখাগুলি শুদ্ধ। এতক্ষণ তাহলে উনি এই কাণ্ড করছিলেন আমাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে রেখে।

অট্টহাস্য করে দেবেনদা বললেন, ''তোর ওইরকম প্যাঁচার মতন মুখটাই আমি আঁকতে চেয়েছিলাম। যত্ন করে বাঁধিয়ে রাখিস। আমি যখন থাকব না, তখন ওটা দেখে আমার কথা তোর মনে পড়বে।''

দেবেনদা চলে গেছেন, ছবিটা আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি। ছবিটা একটু হয়তো ফিকে হয়ে গেছে, কিন্তু দেবেনদার স্মৃতি কোনোদিন ফিকে হবার নয়।

দিল্লির তৃতীয় উপহার যেমন আকস্মিক তেমনি অভাবনীয়। সৈয়দ মুজতবা আলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, যা স্বপ্নেও কোনোদিন সম্ভব হবে বলে ভাবিনি।

তখন আমার বাবা দিল্লির কাজ শেষ করে আবার কলকাতায় ফিরে গেছেন। আমার গুরুদেবের দিল্লি রেডিওতে প্রথম ন্যাশনাল প্রোগ্রাম। আমি যথারীতি তাঁর সবকিছু-বরদার। আমরা আতিথ্য গ্রহণ করলাম যাঁর বাড়িতে তিনি ডক্টর সমর সেন, প্রখ্যাত

অর্থনীতিবিদ, অতিশয় সুজন, কিন্তু গানবাজনার বিন্দুবিসর্গও বুঝতেন না।

দিল্লির বড়ো বড়ো বাংলো প্যাটার্নের বাড়িগুলির একটিতে তিনি থাকতেন, যার সামনে বিস্তৃত বাগান এবং পেছনে বিরাট লন। গরমের দিনে সন্ধ্যাবেলায় এই লনগুলিই ছিল সবচেয়ে ঠাণ্ডা জায়গা। সেখানে চেয়ার-টেবিল-খাটিয়া পেতে বসা হত, এমনকী অনেকে রাত্রে সেখানে ঘুমোতেনও।

ডক্টর সেনের লনে আমরা সবাই বসে আড্ডা মারছি, গুরুজি জিজ্ঞাসা করলেন, "এত বড়ো বাংলো আর আপনারা দুটি ছেলে নিয়ে ছোটো একটি পরিবার, ফাঁকা-ফাঁকা লাগে না?" উত্তর এল, "পরিবারটা ঠিক ছোটো নয়, আর-একজন আছেন, তিনি সৈয়দ মুজতবা আলি। অল ইন্ডিয়া রেডিও দিল্লির অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডাইরেক্টর।"

"তাঁকে দেখছি না কেন?"

"দেখতে পাবেন আটটা সাড়ে-আটটা নাগাদ। রেডিও থেকে উনি একটা ক্লাবে যান, সেখানে জনি ওয়াকার, সাদা ঘোড়া ইত্যাদির সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে কিঞ্চিৎ রঙিন অবস্থায় বাড়ি আসেন। আমার বাড়িতে ওসবের পাট বিশেষ নেই কিনা!"

গালগল্প চলতেই লাগল। হঠাৎ ডক্টর সেন বললেন, "আচ্ছা রাধুবাবু, আপনি দিল্লি এলেন, আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলেন, আর এখানে একটু বাজালেন না, এটা কি ঠিক হচ্ছে?"

গুরুজি তখনি আমাকে দিয়ে যন্ত্র আনিয়ে খাটিয়ার ওপর বসে বাজাতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেক হয়নি, ডক্টর সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা রাধুবাবু আপনি মালকোষ জানেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি। বাজাব?" গুরুজি বুঝে গেছেন যে শ্রোতা কীরকম। মালকোষ কয়েক মিনিট চলবার পরে—

"আচ্ছা রাধুবাবু, শুনেছি মালকোষ গাইলে বাজালে মৃত ওস্তাদদের আত্মা বা ভূত নেবে আসে, কথাটা কি সত্যি?"

"তেমন তেমন মালকোষ হলে নাবে বই কী।"

আবার মালকোষ চলতে লাগল। আরো কয়েক মিনিট পরে ডক্টর সেনের নিরীহ প্রশ্ন, "কই রাধুবাবু, আপনার মালকোষে তো আত্মা, ভূতপ্রেত কিছুরই সাড়া পাচ্ছি না?"

অকস্মাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে লনের অন্ধকার কোণ থেকে উচ্চৈঃস্বরে শোনা গেল, "বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! কে বলে মালকোষে ভূতপ্রেত আসে না? এই তো আমি এসে গেছি!"

মুজতবা আলি সাহেব!

পরিচয়ের পালা শেষ হলে আড্ডা আর বেশি জমল না। গুরুজি তাড়াতাড়ি শুতে গেলেন, কারণ পরের দিন ওঁর ন্যাশনাল প্রোগ্রাম। আড্ডা জমল প্রোগ্রাম শেষ হবার পরে বাড়ি ফিরে এসে। বগলে একটি জনি ওয়াকার নিয়ে আলি সাহেব বাড়িতে ঢুকে গুরুজিকে বললেন, "মত্তির মশায়, আপনি হচ্ছেন বারিন্দির কুলচূড়ামণি, আর আমি হচ্ছি সৈয়দকুলচূড়ামণি। এই চূড়ামণিযোগ লাগল রাত্তির ১২/৩৪ ঘং গতে, ছাড়বে ভোর চারটেয়।"

পরের দিন চূড়ামণিযোগের ধাক্কায় গুরুজি, আলি সাহেব সব শয্যাশায়ী। ডক্টর সেন আমাকে কিছুক্ষণ দিল্লি ঘুরিয়ে দেখালেন। নতুন-দিল্লি শহরটিকে এমনই সুন্দরভাবে

সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেব
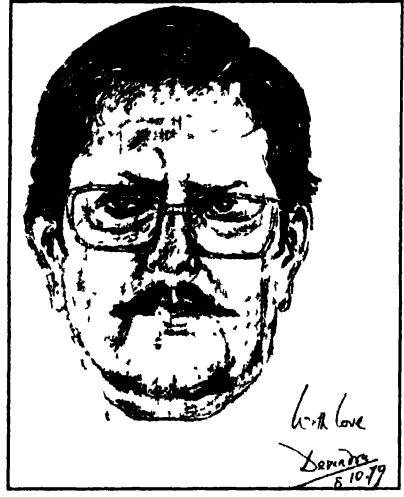
দেবেন্দ্র মূর্ধেশ্ববেব আঁকা আমাব ছবি

ভেবেচিন্তে তৈরি করা হয়েছিল যে, জনসংখ্যা বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গেলেও আজও কলকাতার তুলনায় তাকে অনেক ফাঁকা মনে হয়। রাস্তার দু-ধারে অসংখ্য গাছ, প্রায় সবই নিমগাছ। এটাও ভেবেচিন্তে করা হয়েছিল, নিমগাছ নাকি বাতাসকে শুদ্ধ কবে।

সোমবার দিল্লি-রেডিওতে আমাব একটা রেকর্ডিং হল, সঙ্গে বাজালেন চতুরলালজি। এই রেকর্ডিংটা থেকে পরে আমার কিঞ্চিৎ ভাগ্যোন্নতি হয়।

দিল্লি থেকে ফেরবার পর আলি সাহেবেব সঙ্গে দেখা হয় পাটনায়। তখন উনি পাটনা রেডিওর স্টেশন ডাইরেক্টর। আমার পাটনার অভিভাবক সমীর ঘোষ পাটনা রেডিও স্টেশনে আমার প্রোগ্রামের পরদিন ওঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। দেখি, আলি সাহেব নিবিষ্টচিত্তে তাঁর টিয়েপাখির সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে দেখেই বললেন, "এই যে খুদে ওস্তাদ, এসো, বসো। সমীরভাই আসতে আজ্ঞা হোক।"

সমীরদা জিজ্ঞাসা করলেন, "স্যার, আপনার বাড়িতে সাহিত্য-প্রেমিকদের ভিড় লেগে থাকবার কথা, এরকম ফাঁকা দেখছি কেন?"

আলি সাহেব বললেন, "আমি যে-ধরনের সুরার মাতাল, তার রসগ্রাহী কয়জন পাটনা শহরে আছেন বলুন! যাঁরা দু-একজন আছেন তাঁরা এখন প্রায় আসা বন্ধ করে দিয়েছেন, কারণ আমার নামে দুর্নাম রটে গেছে—আলি সাহেবের একটু হোমোসেক্সুয়াল প্রবণতা রয়েছে—ওঁর বাড়ির চাকর-বাকর, ওঁর কুকুর মায় ওঁর টিয়েপাখিটা, সবই পুরুষ। মনের দুঃখে ওঁর স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশে গিয়ে আছেন"—বলে, তারপরেই টিয়েপাখিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দ্যাখ রে মিঞা, এই সেই ওস্তাদ, যার বাজনা রেডিওতে কাল শুনেছিলি। কেমন লেগেছিল বল তো?"

টিয়েপাখি জবাব দিল, "কেয়াবাৎ!" আমরা স্তম্ভিত।

"স্যার, আপনার টিয়েপাখিও এতটা গানবাজনা বোঝে?"

"বোঝে কচু। এ হচ্ছে প্রাণীবিজ্ঞানীদের ভাষায় যাকে বলে conditioning। আমি

কোন শব্দ ব্যবহার করি, কীভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে ওর দিকে তাকাই, আমার গলার স্বর কীরকমভাবে বেরোয় তার ওপরে নির্ভর করে ও জবাবে কী বলবে। এ ছাড়া অনেক চোখা-চোখা মারাত্মক খিস্তি এবং বাপ-মা তুলে নানারকম উপাদেয় গালাগালও ওকে আমি শিখিয়েছি। অবাঞ্ছিত লোক আসলে ওর মুখ দিয়ে তা বার করতে আমার এক মুহূর্তও সময় লাগবে না। শোনামাত্র তারা কানে আঙুল দিয়ে পালাবে।"

আলি সাহেবের স্ত্রী অত্যন্ত শিক্ষিত এবং বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিনি ছেলেকে নিয়ে বাংলাদেশেই থাকতেন, কারণ ওখানে তিনি একটি শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। আলি সাহেব সেজন্য মধ্যে মধ্যে বাংলাদেশে যাতায়াত করতেন। শেষ অবধি আরো বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে ছবি দেখলাম আলি সাহেব একটি 'তাবুৎ'-এ শায়িত। বাংলাদেশেই তাঁর দেহান্ত হয়েছে, স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশের কৃতী সন্তান বাংলাদেশেই রয়ে গেলেন। যাই হোক, এটা অনেক পরের কথা। পাটনার পরে আলি সাহেব কলকাতা রেডিওর অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডাইরেক্টর হয়ে আসেন এবং তখন রাধুবাবুর মাধ্যমে জ্ঞানবাবু এবং অন্যান্য কলকাতানিবাসী সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা হয়।

কোনো সময় আমি একবার দেরাদুন হয়ে হরিদ্বার গিয়েছিলাম। সেখানে এক সাধুবাবার আশ্রমে আমার সাংগীতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু কথাবার্তা হয়। উনি আমাকে ভয় দেখিয়ে বলেন, গানবাজনা ছেড়ে দে, তোর জীবনে এ-পথ খুবই ক্লেশকর এবং বাধাবিঘ্নসংকুল হবে। আলি সাহেবকে একটা চিঠি লিখে এই ব্যাপারটা জানিয়েছিলাম। তার উত্তরে তিনি আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন, সেটা আমি সযত্নে রক্ষা করেছি।

4, Rouse Avenue Lane,
New Delhi-1

(২)

প্রীতঃ
পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হল ; কিছু মনে করো না।
বাহাদুরের সাকরেদকে এত ভয় কেন — AIR-এর পরীক্ষা পাশ করো নাই? তাজ্জব কী বাত!
[illegible] ছিল কিন্তু [illegible] গিয়েছিলুম।
এখন খবর নিয়ে দেখি [illegible] হয়ে গিয়েছে। তোমার 4th August [illegible] [illegible]।

ওস্তাদজী তো আমাকে [illegible] করবেন না।
সবকিছুর কিস্মৎ ; আমাকে কলকাতা স্টেশন দেবে না খুব সম্ভব — তাই দোমনা হয়ে আছি। কি লিখি বলো?
ভালোবাসা নিয়ো, ওকে নমস্কার জানিয়ো।

মু. আলী

সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের সেই চিঠি

চিঠির বিষয়বস্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু আলি সাহেবের মুক্তোর মতো হস্তাক্ষর আমার কাছে খুবই মূল্যবান বলে।

কলকাতায় উনি পার্ক সার্কাস অঞ্চলে একটি বাড়িতে থাকতেন। সময় পেলেই আমি তাঁর বৈঠকখানার এক কোণায় বসে থাকতাম। থাকতেন অনেক সাহিত্যপ্রেমী এবং উদীয়মান লেখকরা। বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনায় এবং রসিকতায় ওঁর মুখ থেকে অনর্গল যে-মণিমুক্তো ঝরে পড়ত, সেগুলি সংগ্রহ করে রাখলে অবলীলাক্রমে আরো কয়েকটি 'দেশে বিদেশে' 'চাচা-কাহিনী'র সৃষ্টি করা যেত। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। সেখান থেকে মধ্যে মধ্যে বিস্ময়কর কিছু সংগ্রহ আমাদের সামনে তুলে ধরতেন। একদিন হঠাৎ একজন প্রাচীন ফরাসি কবির রচনা অনুবাদ করে আমাকে চমকে দিলেন। কবিতাটির বক্তব্য হচ্ছে, 'আজ থেকে একশো বছর বাদে কেউ হয়তো আমার কবিতা পড়বে, অধীর আগ্রহে।'

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, "এ তো রবীন্দ্রনাথের 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'র অনুবাদ।"

উনি বললেন, "এ ভদ্রলোকের রবীন্দ্রনাথ পড়ার উপায় ছিল না, আর গুরুদেবও এই চিন্তাটা ওঁর কাছ থেকে ধার করেননি। দুজনই কবি, যাঁদের মধ্যে সাতসমুদ্রের এবং শতাব্দীর ব্যবধান। তাঁদের মধ্যে কি একই রকমের ভাবনা আসতে পারে না? এরকম আরো অনেক আছে।"

এইসব সাহিত্যমন্থনের মাঝে মাঝে অকস্মাৎ নেমে আসত ওঁর কিছু কিছু মারাত্মক রসিকতা, তা কখনো কখনো এমনই বিধ্বংসী যে আমাদের মাটিতে আছড়ে ফেলে দিত, উঠে দাঁড়াবার উপায় থাকত না। অথচ যে-পরিপ্রেক্ষিতে সেটি বলা হয়েছে, তার বিচারে কথাগুলি এতই উপযুক্ত যে, প্রতিবাদ করাও যায় না।

একদিন গিয়ে দেখি, ওঁর কোনো একটা লেখার কয়েকজন লোক খুব তীব্র-সমালোচনা করেছেন তাই নিয়ে ওঁর বন্ধুরা ওঁকে বলেছেন, কিছু একটা প্রতিবাদ করতে। কিন্তু আলি সাহেব কিছুতেই তা করবেন না। উপস্থিত সকলে বারবার বলছেন, না-করলে অনেক লোকের মনে তাঁর লেখাটার সম্বন্ধে ভুল ধারণা হবে। আলি সাহেব বলছেন, ওঁদের যা-খুশি বলতে দিন না। আমার লেখাটির প্রতিপাদ্য বিষয় ওদের স্থূলমস্তিষ্কে ঢোকেনি, ঢুকবে না। প্রতিবাদ করে ওদের নিরস্ত করা যাবে না। আমি তো মোটেই উত্তেজিত হচ্ছি না, বরং সমস্ত ব্যাপারটাকে enjoy করছি।

"আপনি এইরকম একটা ব্যাপার enjoy করছেন?"

"শুনুন মশায়রা, when a woman sees that rape is inevitable, she should stop resisting and enjoy it."

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
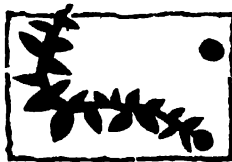
বোম্বাই সফর

ঝকঝকে কামরা, তকতকে গদি। কাঠের দেওয়ালগুলিতে মনে হচ্ছে কেউ এইমাত্র বার্নিশ লাগিয়ে গেছে। বাথরুমে সাবানের টুকরো, তোয়ালে, টয়লেট পেপার, গরম তাড়াবার জন্য ছোটো একটা ফ্যান। কয়েক ঘণ্টা বাদে-বাদে সুইপার ঢুকে কামরার মেঝে বাথরুম সাফ করে দিয়ে যাচ্ছে। রাত নটার সময় উর্দি-পরা বেয়ারা এসে তোয়ালে-ঢাকা ট্রেতে করে খাবার দিয়ে যাবে, ইউরোপিয়ান স্টাইলের খাবার—স্যুপ, ফিশফ্রাই, রোস্ট মাটন উইথ ম্যাশ্‌ড পট্যাটো অ্যান্ড ভেজিটেবল, কাস্টার্ড পুডিং।

রূপকথা মনে হচ্ছে? এই ছিল স্বাধীনতার তিন-চার বছর পরেও ট্রেনের উচ্চশ্রেণির কামরায় ভ্রমণের কাহিনি। ব্রিটিশের করে-যাওয়া জিনিসগুলিকে আমরা তৎসম্বন্ধীয় নিয়মকানুন না-মেনে, ধুলো না-ঝেড়ে, পানের পিক এবং থুতু-নাকঝাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে চারদিকে লেপে, বাথরুমে পেচ্ছাপ পায়খানা করে জল না-ঢেলে যে-নরকে পর্যবসিত করেছি সেটা তখন আমরা নিজেরাই দেখলে আঁতকে উঠতাম। রূপান্তরটা ধীরে ধীরে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে হয়েছে বলে আমাদের এতদিনে গা-সওয়া হয়ে গেছে। খাটালে মোষরা যেমন কাদা এবং নিজের মলমূত্র ইত্যাদি মিশ্রণে তৈরি পয়ঃসাগরে মহানন্দে গা ডুবিয়ে, আধবোজা চোখে চিটিরপিটির করে লেজ নাড়ে, আমরাও এখন ঠিক সেই অবস্থায়।

এ পর্যন্ত লেখাটা একটু লেকচারের ঢঙে হয়ে গেল। আত্মসমীক্ষা বলতে পারেন, কিন্তু মহাদুঃখে পড়েই এই আত্মসমীক্ষা।

বাস্তবে ফিরে যাই। গুরুজির সঙ্গে বোম্বে যাচ্ছি, জীবনে প্রথমবার বোম্বে যাওয়া। গুরুজির কয়েকটা প্রোগ্রাম হবে, সঙ্গে জ্ঞানবাবু যাচ্ছেন, ভ্রমণসঙ্গী এবং তবলাবাদক হিসেবে। আর আছেন বর্ধমানের উকিল দেবীপ্রসাদ মজুমদার, দুজনেরই প্রিয় বন্ধু।

আমার কলেজ ছুটি ছিল, তাই আমার মা গুরুজির সঙ্গে আমাকে যেতে দিয়েছেন। শর্ত অনেকগুলি—গুরুজির জামাকাপড় কাচা, জুতো পালিশ করা, তাঁকে না-বলে এক পা-ও কোথাও না-যাওয়া।

গাড়িতে চড়ে বসার একটু পরে একটা মৃদু ধাক্কা লাগল। দেবীকাকা বললেন, এই ইঞ্জিন লাগল। ইঞ্জিনের কথা শুনে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। দুটো জিনিসের প্রতি বাচ্চা বয়স থেকে আমার প্রবল আকর্ষণ ছিল—এরোপ্লেন আর স্টিম ইঞ্জিন। সে-সময়কার বিরাট ইঞ্জিনগুলি (কেন জানি না ওদের বলা হত ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন) আকারে চেহারায়, আওয়াজে, চলনে এমন একটা আভিজাত্য বহন করত যে, ওদের দেখলে বিস্ময় এবং সম্ভ্রমের উদ্রেক না-হয়ে যায় না।

আর লোভ সামলাতে পারলাম না। গুরুজনদের 'আমি এখনই আসছি' বলে কামরা থেকে নেমে দৌড় লাগালাম ইঞ্জিনের দিকে, তিন-চারটে কামরার সামনে। একেবারে কয়েক হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই বিশাল লৌহদানবকে দেখার সুযোগ আগে বিশেষ হয়নি, যার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজেও বুক দুরদুর করে। আজকালকার পাঁউরুটির মতো চেহারার ডিজেল অথবা ইলেকট্রিক ইঞ্জিন তুলনায় নিতান্তই মেনিমুখো।

সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে আছি, অকস্মাৎ পেটের নাড়িভুঁড়ি কাঁপিয়ে দিয়ে লৌহদানবটি ভোঁ করে চেঁচিয়ে উঠল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মনে হল আমার কামরা তিন-চারটের পরে, দৌড়ে যেতে যেতে যদি গাড়ি চলতে শুরু করে, তাহলে চলন্ত গাড়িতে ওঠার হিম্মত আমার হবে না, আমি দৌড়ঝাঁপে মোটেই দড় নই।

কিন্তু না, আমার বরাত ভালো, ওটা ছিল প্রাথমিক হুইস্‌ল, গার্ড সাহেবকে মনে করিয়ে দেবার জন্য যে, সময় হয়ে গেছে ছাড়বার। গার্ড সাহেব বাঁশি বাজিয়ে আলো নাড়তে নাড়তে আমি যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম। দেবীকাকা আতঙ্কগ্রস্ত মুখে কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন আর 'বুদ্ধ! বুদ্ধ!' বলে চ্যাঁচাচ্ছেন। কলার ধরে আমাকে কামরায় ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এই যে রাধুদা। পাওয়া গেছে।"

লম্বা হুইসল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। জ্ঞানবাবু বললেন, "ভেরি ইনকুইজিটিভ অ্যান্ড রিসার্চ-মাইন্ডেড বয়!"

গুরুজি কিন্তু এতটা ঠাট্টার মুডে ছিলেন না। আগুন হয়ে বসে আছেন। চোখ দিয়ে আমাকে খানিকক্ষণ ভস্ম করে বললেন, "দেবীবাবু খড়্গপুরেই নেবে ওটার কান ধরে ফিরতি ট্রেনে বউদির কাছে ফেরত দিয়ে একদিন বাদে বোম্বেতে চলে আসুন, আমি ওকে নিয়ে যাব না।" জ্ঞানবাবু, দেবীকাকা ওঁকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি গরুচোরের মতো মুখ করে তাকিয়ে থাকলাম। আকাশে ঘন মেঘ জমেই রইল, মধ্যে মধ্যেই গুড়গুড় করতে থাকল, আমি খড়্গপুর স্টেশনে বজ্রপাতের অপেক্ষায় রইলাম।

জ্ঞানবাবু বললেন, "এ যখন উধাও হয়ে গেছিল, আপনার তখনকার মুখচোখের অবস্থা আমার মনে আছে রাধুবাবু। অস্থির হয়ে গেছিলেন। এখন ও ফেরত আসামাত্র সংহারমূর্তি ধারণ! অ্যাঁ? এ যে দেখছি সেই নিরুদ্দেশের ব্যাপার, এদিকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন 'খোকন ফিরে আয় তোর বাবা-মা বিছানায় খাবি খাচ্ছে', ওদিকে খোকনের

বাবা জুতো, বেত, খড়ম নিয়ে রেডি হয়ে আছেন, 'হারামজাদা একবার আসুক না!' ভুলে যান মশায়, ভুলে যান। ছেলেমানুষ একটা অন্যায় করে ফেলেছে।"

দুনিয়ার এমন সংগীতজ্ঞ খুব কমই আছেন, যাঁরা সামনে ভালো খাবার দেখলে আর সব কিছু ভুলে যান না। খড়্গপুরে ট্রেন থামতে-না-থামতেই বয় এসে সামনে ডিনারের ট্রে রেখে ঢাকনা তুলে নিল। গুরুজির মুখমণ্ডলের মেঘ কেটে রোদ্দুর উঠে গেল তখনি। বজ্রপাতের থেকে বেঁচে গেলাম।

বয় জিজ্ঞাসা করল, কালকে ব্রেকফাস্টে কী দেবে। জ্ঞানবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "রাধুবাবু, বলে দিন কাল সকালে আমি যদি শুয়োরের বাচ্চার মুখ না দেখি তবে ব্রেকফাস্ট ছুঁড়ে ফেলে দেব।"

বয় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। গুরুজি বললেন, "বেকন, সসেজ, ডিম, টোস্ট, কফি এবং তার আগে অবশ্যই কর্নফ্লেক-দুধ।" বয় বলল, একটু আগে জানলে সে হাওড়া থেকেই বেকনের ব্যবস্থা করতে পারত। যাই হোক, এখন টাটানগরে টেলিফোনে চেষ্টা করছে, ওখানে হয়তো বেকন সসেজ পাওয়া গেলেও যেতে পারে কেলনার-এর ঘরে।

কলকাতা-বোম্বে রুটে তখন নাগপুর অবধি খাবারের কন্ট্রাক্ট ছিল কেলনার কোম্পানির, নাগপুর থেকে বোম্বে অবধি সোরাবজি কোম্পানি। দুই কোম্পানিই পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিত আরো ভালো খাবার, আরো ভালো সার্ভিস দেবার জন্য। প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের গলা টিপে মেরে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে আজ ট্রেনের খাবারের কী দশা হয়েছে সবাই জানেন।

জ্ঞানবাবুর 'শুয়োরের বাচ্চা' কিন্তু ঠিক পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের ট্রে চড়ে পৌঁছে গেল। সকলের কী ফুর্তি। গুরুজি বললেন, "বাস্তবিক জ্ঞানবাবু, এই যে শ্বেতপদ্মের মতো ডিমের পোচ, তার পাশে নৈবিদ্যি বেকন, সসেজ শোভা পাচ্ছে, কোলেস্টরল-মোলেস্টেরল
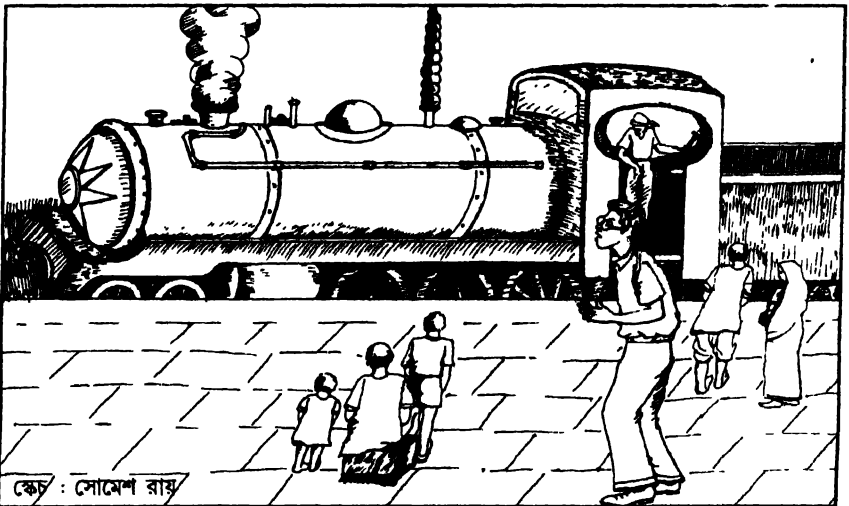
স্কেচ : সোমেশ রায়

সব মারুন গুলি, এ নিঃসন্দেহে ফুড ফর দি গডস।''

নাগপুর স্টেশনে এক ভদ্রলোক এসে দেখা করে গেলেন, নাম আর্কট ভেনুগোপাল মদনগোপাল, গায়ক এ. কাননের বাল্যবন্ধু, অমরাবতীতে থাকেন, ওই অঞ্চলের নামকরা চোখের সার্জন। বললেন, ''ফেরবার সময় অবশ্যই হপ্তাখানেক আমাদের ওখানে কাটিয়ে যাবেন, আমাদের বঞ্চিত করবেন না।'' গুরুজি, জ্ঞানবাবু সঙ্গে সঙ্গে রাজি। আমি ভাবলাম একজন চোখের ডাক্তারের বাড়িতে সাতদিন কাটাবার কী প্রয়োজন। তখন বুঝতে পারিনি যে ওঁর বাড়িতে কীভাবে সময় কাটবে।

আফতাব-এ-মৌসিকি, সংগীতের সূর্য, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ তখন অস্তাচলগামী। যক্ষ্মায় দুটি ফুসফুসই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, কাশির সঙ্গে রক্ত উঠছে। আমাদের দেশের লোকেরা বারবার যা করে—একজন শিল্পীর ভালো সময়ের গানবাজনা সংরক্ষণ না-করে তিনি কবরে বা চিতায় যাবার সময় হুঁশ ফিরে পেয়ে তাঁর শেষ চিহ্নটুকু রাখার জন্য ধড়ফড় করে, তাই করছে। বরোদার স্টেশন-ডাইরেক্টর সুনীল বোসের ঐকান্তিক চেষ্টায় ব্যবস্থা হয়েছে রোজ রাত্রে ওস্তাদকে রেডিওতে গাওয়ানো হবে, যতক্ষণ গান করবেন, ট্র্যান্সমিশনের সময় শেষ হয়ে গেলেও স্টেশন বন্ধ করা হবে না। আর, সমস্ত গান রেকর্ড করে রাখা হবে।

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি সে-সময় উদীয়মান নন, দস্তুরমতো উদিত এবং মধ্যাহ্নগগনে। তাঁর গান এবং সুরের জোয়ার সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, উঠতি গাইয়েরা তাঁর অনুকরণ বা অনুসরণ যার যেমন সাধ্য করছে। এর আগে অধিকাংশ গায়ক ফৈয়াজ খাঁকে অনুসরণ করেছেন। এমনকী যাঁর গলা ফৈয়াজ খাঁর মতো নয় তিনিও গলাকে ওঁর মতো করবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের অনেকে ভোল পালটে ফেললেন। যাঁরা ফৈয়াজ খাঁর গান যথার্থ হৃদয়ঙ্গম এবং আত্মস্থ করেছিলেন, তাঁরাই শুধু অপরিবর্তিত রয়ে গেলেন।

গানের জগতের যখন এই পরিস্থিতি, তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে আর-একজন গায়ক ফৈয়াজ খাঁ এবং বড়ে গোলাম আলির গায়নরীতির থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং ভিন্নশৈলীর ওপর নির্ভর করে ধীরে ধীরে পরিচিতিলাভের পথে এগোচ্ছিলেন। ছিপছিপে তলোয়ারের মতো চেহারা, দীর্ঘদেহী, সুদর্শন, চোখে রিমলেস্ চশমা। তাঁর নাম আমির খাঁ। ইন্দোরের ছেলে। সারেঙ্গিয়াদের বংশ, কিন্তু বাবা শাহমির খাঁ কিরানা ঘরানার ওস্তাদ বন্দে আলি খাঁর কাছে বীণের তালিম নিয়েছিলেন, এবং সেই ধ্রুপদ অঙ্গের গায়নরীতি ও নানা বন্দিশ ছেলেকে শিখিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু ও গুরুভাই দেওয়াসের ওস্তাদ জবরদস্ত খেয়ালিয়া রজব আলি খাঁ সাহেব প্রায়ই এসে তাঁর বাড়িতে থাকতেন। কিশোর আমির খাঁ তাঁর কাছে খেয়ালের তালিম নিলেন। এখানেই থামলেন না, ভিন্ডিবাজার ঘরানার ওস্তাদ আমান আলির কাছে নানা মনোমুগ্ধকর বন্দিশ সংগ্রহ করলেন। পরিশেষে ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁর গানের থেকে 'দিল্' এবং ওস্তাদ বহেরে ওয়াহিদ খাঁর গানের থেকে 'দিমাগ্' এই দুটির প্রয়োগ আয়ত্ত করলেন। তারপর নিজের প্রখর সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব দিয়ে এই সমস্ত উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি

করলেন তাঁর নিজের গায়নশৈলী, যেটা ফৈয়াজ খাঁ এবং বড়ে গোলাম আলি খাঁর পরে তৃতীয় একটি গায়কি হিসাবে স্বীকৃতি পেল। তাঁর কলকাতায় পরিচিতিলাভের একজন বড়ো সহায়ক ছিলেন জ্ঞানবাবু। কাজেই দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়।

বোম্বে স্টেশনে নেমেই দেখা গেল, আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন আমির খাঁ সাহেব।

স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে হোটেলে যাবার পথেই গুরুজি এবং জ্ঞানবাবুর সঙ্গে আমির খাঁ সাহেবের জোর আলোচনা শুরু হয়ে গেল। আলোচনার বিষয়বস্তু হল, সারা ভারতের বহু রেডিও-আর্টিস্ট রেডিওকে বয়কট করেছেন। কারণ, রেডিও হঠাৎ সকলের পুনর্মূল্যায়ন করেছে। পরীক্ষক হচ্ছেন পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ রতনঝঙ্কার এবং আর কয়েকজন গভর্নমেন্টের বাছাই করা প্রবীণ গুণী। তার ফলে অনেক 'এ' গ্রেডের শিল্পীকে 'বি' গ্রেডে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার উলটোটাও হয়েছে। অনেক বড়ো বড়ো শিল্পী এই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে রাজি হননি। তাঁরা বলেছেন, আমাদের যাঁরা পরীক্ষা নিচ্ছেন, তাঁদের কে কত বড়ো তালেবর? তাঁদের মান নির্ধারণ করবে কে?

আমি চুপ করে বসে আলোচনা শুনছি। আমার মধ্যে এ ধরনের ক্ষোভ নেই, কারণ এই একই অডিশন-বোর্ডের কাছে পরীক্ষা দিয়ে আমি পঁচিশ টাকা দক্ষিণার থেকে পঞ্চাশ টাকায় লাফিয়ে উঠেছি। আমি ভাবছি, এই হট্টগোলের ফলে রি-অডিশনের দরুন নতুন করে করা গ্রেডেশনটি গভর্নমেন্ট খারিজ করে না দেন। মানুষ চিরকালই স্বার্থপর!

পাশ দিয়ে বোম্বে শহরের বিভিন্ন মহল্লা চলে যাচ্ছে, বিরাট বিরাট বাড়ি, ব্রিটিশ স্থাপত্যের কীর্তি। কলকাতার ছেলের কাছে বড়ো বড়ো বাড়ির জায়গা তখন একমাত্র এসপ্ল্যানেড-ডালহৌসি। বোম্বেতে মনে হল সর্বত্রই তাই, ডজন ডজন এসপ্ল্যানেড-ডালহৌসিতে ভর্তি।

হোটেল এসে গেল, নাম 'হোটেল ম্যাজেস্টিক', ছাইরঙের ওপর সাদা বর্ডার দেওয়া পাঁচতলা বাড়ি। ভাড়া মাথাপিছু পঁচিশ টাকা। বাস্তবিকই সস্তাগণ্ডার দিন, ট্যাক্সি মিটার ডাউন করলে প্রথম মাইলের ভাড়া ছয় আনা, তারপর চার আনায় মাইল।

আমির খাঁ সাহেব রোজই আসতে লাগলেন, পরে একদিন নেমন্তন্ন করলেন ওঁর বাড়িতে যাবার এবং দুপুরে খাওয়ার জন্য। ঠিকানা দিলেন অমুক নম্বর 'কেনেডি ব্রিজ', তিনতলায় বাঁদিকের দরজা। কেনেডি ব্রিজ শুনে মনে হল, নিশ্চয় কট্টর সাহেব পাড়া। গাইয়ে বাজিয়েরা ওরকম মহল্লায় থাকবেন কেন? তবে আমির খাঁ সাহেবের অনেক ভক্ত আছেন। তাঁদেরই মধ্যে বিরাট ধনী এবং পশ্চিমিভাবাপন্ন কারুর বাড়ি হতে পারে।

ভুল ভাঙল যাবার সময়। দেবীকাকা পাংশুমুখে এসে জানালেন, একটা ট্যাক্সিও কেনেডি ব্রিজে যেতে চাচ্ছে না, নাম শুনেই মুখ বেঁকিয়ে চলে যাচ্ছে। একজন আবার নাকি বলছে "হাঁঃ শেঠ্, (ওখানকার সম্বোধনের রীতি, বাবু বা সাহেবের বদলে শেঠ) ইস টাইম মে আপ কেনেডি ব্রিজ যানা চাহতে হ্যাঁয়? কেয়া মামলা?" কোনো ট্যাক্সিই রাজি হচ্ছে না, সবারই ওই একরকমের জবাব। শেষকালে একজনকে বহু কষ্টে রাজি করানো গেল। কথা হল, সে কেনেডি ব্রিজের রাস্তার মুখ অবধি আমাদের পৌঁছে দেবে, রাস্তায়

ঢুকবে না, বাকিটা আমাদের হেঁটেই যেতে হবে। যেতে যেতে সে আবার একটা বিচিত্র মন্তব্য করল, "আপলোগ চার আদমি এক হি সাথ যা রঁহে হ্যায়?"

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, রহস্যটা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। কেনেডি ব্রিজের রাস্তার মুখে আমাদের নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি চম্পট দিল। বহু খোঁজাখুঁজির পরে শেষে একটা জীর্ণ পোস্টঅফিসে 'আমির খাঁ সাহেব গাওয়াইয়া'র বাড়ির অবস্থান জানা গেল। বাড়িটির সামনে পৌঁছে দেখি সেটি একটি ছ'তলা বাড়ি, প্রতিটি তলায় চারটে করে ছোটো ছোটো ব্যালকনি এবং প্রতিটিতে চোখে গগল্‌স লাগিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন এক একজন ললনা, সবারই উৎসুক দৃষ্টি আমাদের দিকে, যদিও গগল্‌সের মধ্য দিয়ে ঠিক ঠাহর হচ্ছে না কে-কাকে তাক করছেন।

রাধুবাবু বললেন, "সর্বনাশ! এ তো বোম্বের সোনাগাছি অথবা হাড়কাটা গলি মশায়! আমি বুদ্ধদেবকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দেব না।"

জ্ঞানবাবু বললেন, "তবে কী করবেন? ওকে এই মহল্লায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখবেন? আমরা কি ওই ভদ্রমহিলাদের কোঠায় যাচ্ছি, না আমির খাঁ সাহেবের বাড়ি যাচ্ছি? অ্যাই বুদ্ধদেব, একদম ডানদিক-বাঁদিক-ওপরে-নীচে কোনোদিকে তাকাবে না, আমাদের পিছু পিছু এসো।"

আমির খাঁ সাহেবের ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়া হল। দরজা খুললেন পৃথুল কলেবরা কৃষ্ণবর্ণা এক মহিলা, মুখে সিগারেট। তাঁর পেছনে আমির খাঁ সাহেব। অতিশয় উষ্ণ অভ্যর্থনা হল। ভদ্রমহিলা আমির খাঁ সাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী মুন্নিবাঈ, আমির খাঁ সাহেবও ওঁর দ্বিতীয় স্বামী। আমির খাঁ সাহেবের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন ওস্তাদ এনায়েত খাঁ সাহেবের কন্যা এবং বিলায়েত খাঁ সাহেবের ভগ্নী। তাঁর সঙ্গে ডাইভোর্স হবার পর এই দ্বিতীয় বিবাহ। এ-ভদ্রমহিলাও বরাবরের জন্য টেকেননি। কিছুকাল বাদে আলাদা হয়ে যান এবং তারপরে মারা যান। তখন আমির খাঁ সাহেব তৃতীয়বার বিবাহ করেন এবং সেই বিবাহের সন্তান টেলিভিশনখ্যাত শাহবাজ খান।

নানরকম গল্পগাছা হতে থাকল—আগেকার দিনের গানবাজনা এবং ওস্তাদদের বিষয়ে। কোন বীণকার কবে কোন নবাবকে খুশি করে পুরস্কার হিসেবে নবাবের সব থেকে সুন্দরী নর্তকীকে দাবি করেন এবং বিবাহ করেন; কোথায় কোথায় তর্কাতর্কি মারামারি হয়েছিল রাগ-আস্থায়ী-অন্তরা এইসব নিয়ে; কোন গায়িকা প্রেমঘটিত ব্যাপারে ছাপ্পান্নবার ছুরির ঘা খেয়েও বেঁচে গেছিলেন বলে তাঁর উপাধি হয়েছিল ছপ্পন-ছোরি; কোন ওস্তাদের পোষা কুকুর মালকোষ রাগের স্বর নির্ভুলভাবে গলা দিয়ে বার করত ইত্যাদি।

দুপুর গড়িয়ে যাবার দাখিল, তখন সকলের খেয়াল হল এবার খাওয়াদাওয়া সেরে নেওয়া উচিত। খাবার এল, আমাদের প্রচলিত সুভাষিতে 'থোড় বড়ি খাড়া'র মতো কাবাব পরোটা বিরিয়ানি। এই দ্রব্যগুলি আজকাল প্রায় প্রত্যেক রেস্টুরেন্টেই পাওয়া যায়, কিন্তু তার থেকে এই খাবারের জাত সম্পূর্ণ আলাদা। একেবারে আলাদা 'ঘরানা'র রন্ধন। মুসলমান সংস্কৃতিতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের যে চূড়ান্ত চর্চা হয়েছে তারই একটি দিকের ফল। কাবাবই তিনটি বিভিন্ন রকমের, নাম মনে না-থাকলেও জিভে

তাদের স্পর্শে যে শিহরণ সৃষ্টি হয়েছিল সেটা বিলক্ষণ মনে আছে।

আমীব খাঁ সাহেব

রাধুবাবু নিজে রন্ধনরসিক ছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যেই মুন্নিবাঈকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কোন জিনিসটা কীভাবে রাঁধা হয়েছে, কী কী মশলা দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। মুন্নিবাঈ প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে মুচকি হাসছেন। রাধুবাবুও নাছোড়বান্দা। ক্রমাগত চাপাচাপি করাতে শেষে উনি জবাব দিলেন, "রাধুবাবু, আপ যব কোই মশহুর গাওয়াইয়াকে গানা শুনতে হেঁ, তব কভি উনকো পুছতে হৈঁ কি কিস্ তরিকে সে উনহোনে রিয়াজ কিয়া, কিতনে ঘণ্টে কৌন কৌন তানকো সাধা? আপ সির্ফ গানা কে হি মZা লেতে হেঁ, অ্যায়সাহি খানা কে ভি মZা লিজিয়ে। মুহ্সে বাতানে সে ইয়ে তালিম হাসিল নহি হোগা।"

আমির খাঁ সাহেব বললেন, "আমি কতদিন কতবার ওর কাছে জানতে চেয়েছি, কিছুতেই বলে না। রান্নাঘরে ঢুকলে তেড়ে আসে হাতা খুন্তি নিয়ে। বলে, এসব যদি শিখতে চাও তাহলে গান করা ছেড়ে দাও, আমার কাছে গান্ডা বেঁধে বছর পাঁচেক মশলাচির কাজ করো, তবে হবে।"

বিলায়েত খাঁ সাহেবের বাড়িতে আর-এক রকমের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। উনিও তখন বোম্বে-নিবাসী, জ্ঞানদাদা, রাধুদাদা এসেছেন শুনেই উনি হোটেলে এসে দেখা করেছেন এবং ওঁর বাড়ি যাবার নেমন্তন্ন করেছেন। পরপর তিনদিন সকাল-বিকেল ওঁর বাড়িতে আড্ডা, বিকেলে ওঁর পাটশিষ্য অরবিন্দ পারেখের গাড়িতে করে বোম্বাই ভ্রমণ।

প্রথম দিন সকালবেলা যখন ঢুকছি, তখন শুনলাম একটি ঘরে বন্ধ দরজার পেছনে কে যেন সেতারের একটি সাপট তান প্র্যাকটিস করছে, তবে সাপটের মতন ঝড়ের বেগে নয়, একেবারে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে আস্তে আস্তে। এ তানটি সেতারি মহলে খুবই পরিচিত, সেতারের গায়ত্রীমন্ত্রও বলা যেতে পারে। সেতারিরা স্বরলিপি দেখলেই চিনতে পারবেন— নিসা রেগামাগারেসা, গামাপাধানিধাপামা, নিসারেগা-মাগারেসা, নিধাপামাগারেসা—।

সেতারের তানকারিতে কোনো-না-কোনো জায়গায় এই তানটির আবির্ভাব

অবশ্যম্ভাবী। বিকালবেলায় গিয়ে দেখি, সেই একই তান সেই একই স্পিডে বেজে চলেছে। জ্ঞানবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কে রেয়াজ করছে?" বিলায়েত খাঁ সাহেব বললেন, "ও আমার ছোটো ভাই, ইমরত।"

পরের দিনও শোনা গেল, সেই একই তান বেজে চলেছে, তবে তার গতিবেগ কিছুটা বেড়েছে। রাধুবাবু বললেন, "এরকম টানা প্র্যাকটিস কদিন চলবে? উত্তর এল, "যতদিন না তানটা মনের মতো পালিশ হয়।" দরকার হলে একদিন দুদিন নয় চল্লিশ দিনও হতে পারে, যাকে রেয়াজের ভাষায় বলা হয় 'চিল্লা'। এ-সময় সারা দুনিয়া, আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধব টেলিফোন খবরের কাগজ সব নির্বাসিত, ছোটো একটা কুঠুরিতে শুধু তুমি আর তোমার যন্ত্র অথবা কণ্ঠ, আর-কোনো চিন্তারই সেখানে স্থান নেই। জেলের কয়েদিদের মতন দরজার ফাঁক দিয়ে কেউ একজন তোমার খাবার ঢুকিয়ে দিয়ে যাবে আর এঁটো বাসন নিয়ে যাবে। জলের কুঁজো পাশেই আছে। নেহাত বাথরুমে যাওয়া, স্নান, মুখ-ধোওয়া ইত্যাদির জন্য যেটুকু বাইরে যাওয়া, সে-সময়ও কারো সঙ্গে কোনে কথাবার্তা নয়। চল্লিশ দিনেও কারো যদি কিছু ইতরবিশেষ না হয় তবে বোঝা যাবে তার দ্বারা আর কিছু হবে না।

বিলায়েত খাঁ সাহেব আরো একটি কথা বলেছিলেন, "এ-রেয়াজ করতে গেলে অনেকেরই ধৈর্য থাকবে না, কেউ কেউ হয়তো পাগলও হয়ে যেতে পারে।"

চল্লিশ দিনের দরকার হল না, এর দুই একদিন পরে শেষবারের মতো যখন বিলায়েত খাঁ সাহেবের বাড়ি গেলাম, তখন শুনি তানটা একেবারে বিদ্যুৎগতিতে বেজে চলেছে, একবারও না-থেমে। আজও যখন ইমরত খাঁ সাহেবের বাজনা শুনি, এই ঘটনাটির কথা মনে পড়ে যায়।

বিকালবেলা বিলায়েত খাঁ সাহেব এবং অরবিন্দ পারেখের গাড়ি করে ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রের ধারে কাদাভর্তি নোংরা একটি জায়গার পাশে উপস্থিত হলাম। সারা বাতাস ম' ম' করছে একটি বিচিত্র গন্ধে, যেটা পচা মাছের এবং মানুষের মলের সংমিশ্রণ, বোম্বাই শহরের সমুদ্রতীরবর্তী বহু জায়গা জুড়ে বিরাজ করে।

অরবিন্দ পারেখ বললেন, "জ্ঞানদা, রাধুদা, এইখানে হাজার দশেক টাকা খরচ করে এক খণ্ড জমি কিনে ফেলে রাখুন, দেখবেন তিন চার বছরের মধ্যে তার দাম দশগুণ হয়ে যাবে।" রাধুবাবুর উত্তর, "ভাই, আমরা গরিব মানুষ, দশ হাজার টাকা সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার সাধ্য আমাদের নেই। তুমি বিশাল ব্যবসায়ী, তুমি এ-কথা ভাবতে পারো।"

উত্তরকালে, প্রায় পাঁচ দশক পরে, এই দুর্গন্ধ কাদামাটিময় অঞ্চলটির এককাঠা জমির দাম এক কোটি কী তারও বেশি হবে, বোম্বের 'নেপিয়ান সি রোডের' লাগোয়া মহল্লা এটি। সংগীতজ্ঞদের বিষয়বুদ্ধির চিরকালই অভাব। রাধুবাবু অবশ্য জমিদারের ছেলে, কিন্তু তাঁর মাথায়ও এই বুদ্ধি আসেনি।

বোম্বের দিনগুলি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সকালে হোটেলের ঘরে বসে গুরুদেবের যন্ত্রটির পরিচর্যা করছি এমন সময় মুখে-দাড়ি চোখে-চশমা একজন আগন্তুক উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখামাত্র বললেন, "তুমি বুদ্ধদেব না? চিনতে পারছ আমায়?" আমার

দৃষ্টিতে চিনতে পারার লেশমাত্র নেই দেখে আবার বললেন, "না চেনারই কথা। বরিশালে আমাকে দেখেছ, তোমাদের বাড়িতে অনেক গানবাজনা করেছি, তুমি তখন ছোট্টোটি ছিলে। আমি নিখিল ঘোষ, আমার দাদা পান্নালাল ঘোষ। মনে নেই, দাদার কাছে একটা বাঁশি চেয়েছিলে বলে তোমার মা তোমাকে কী রকম বকাঝকা মারধোর করেছিলেন?"

নিখিল ঘোষ জ্ঞানবাবুর কাছে তবলার তালিম নিতেন, এবং পরে আহম্মদ জান থিরাকুয়া, আমির হোসেন খাঁ, আজিম খাঁ প্রমুখ বহু ওস্তাদের কাছে শিক্ষালাভ করেন। ভারতের সমস্ত তবলা ঘরানার এবং তার ধরন, বিভিন্ন ওস্তাদের মূল্যবান তালিম এবং রচনাবলীর এক বিশাল সংগ্রহ তাঁর কাছে ছিল। সারা তবলাজগৎ ওঁকে একডাকে চিনত। কিন্তু তবলাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি কণ্ঠসংগীত এবং সেতার এই দুটি বিষয়েও যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন এবং বহু হৃদয়স্পর্শী গান রচনা করে গেছেন। বোম্বের মতন জায়গায় একাকী বঙ্গসন্তান হয়েও প্রাণপণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের জোরে এমন একটি সংগীত মহাবিদ্যালয় ('সংগীত মহাভারতী') প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যা আজ ভারতবিখ্যাত নয়, জগদ্‌বিখ্যাত। একটি সাংগীতিক বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, শেষ করতে পারেননি, সেটি এখন প্রকাশনার কাছাকাছি। মনেপ্রাণে বাঙালি ছিলেন তিনি, ধূমপান করতেন হুঁকো-কল্কে দিয়ে, স্নান করতেন গামছা দিয়ে, তোয়ালের ধার ধারেননি। উত্তরকালে তাঁর আরো অনেক কাছাকাছি আসতে পেরেছি এবং তাঁর অকৃপণ স্নেহ লাভ করেছি। বাংলার বাইরে কীর্তিমান বাঙালিদের মধ্যে নিখিল ঘোষ একটি অবিস্মরণীয় নাম।

এর পরের পর্ব আহমেদাবাদে। প্রোগ্রামগুলির ব্যবস্থা করেছিলেন আমার গুরুভাই রসিকভাই মেহতা, গুজরাটের ছেলে, আমার গুরুর কাছে সেতার শিখতেন। অনেকগুলি জায়গায় প্রোগ্রাম হল, তার মধ্যে পরমাণু-বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই এবং তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী সারাভাইয়ের বাড়ির প্রোগ্রামটি মনে আছে। সায়েন্টিস্ট যে কতটা গানপাগলা এবং সমঝদার হতে পারে তা বিক্রম সারাভাইকে না-দেখলে বোঝা কঠিন।

এরপরেও আরো কয়েকটা প্রোগ্রাম। তাতে অনেকগুলি গুজরাটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হল, অধিকাংশই যেমন সুন্দরী তেমনই সপ্রতিভ। বিশেষ করে একটি মেয়ে, যতদূর মনে পড়ে তার নাম রুক্মিণী মেহতা, আমাদের প্রোগ্রামে তানপুরা ছাড়ছিল, তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। গুরুজির সঙ্গে আমিও সরোদ নিয়ে বসেছিলাম। আমরা হাঁ-করা অবস্থা লক্ষ করে গুরুজি হঠাৎ বললেন, "ওহে ছোকরা! নজরটা এবার একটু এদিকে দাও, বাজাও কিছু!" বাংলায় বললেও তাঁর বক্তব্য বুঝে সবাই হেসে উঠল, আমি কান লাল করে আবোল-তাবোল যা পারি বাজাতে লাগলাম।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, রুক্মিণীর মতো একটি মেয়েকে যদি বিয়ে করতে পারতাম! কিন্তু সংস্কার, সমাজ এবং সম্প্রদায়ের দুস্তর বাধা। আমার ক্ষোভটা তারপরে গিয়ে পড়ল দেশের নেতা এবং রাজনীতিকদের ওপরে। ভাবলাম এরা কত বড়ো নির্বোধ, খালি খালি সারা ভারতবাসীর মিলেমিশে এক জাত হবার কথা আওড়ায়, আসল জায়গায় হাত দেয় না। আমি যদি ওদের জায়গায় থাকতাম, তাহলে

স্বাধীনতালাভের পরেই আইন করে দিতাম— কেউই আর নিজের প্রদেশে নিজের সম্প্রদায়ে বিয়ে করতে পারবে না, করলেই গ্রেপ্তার এবং কারাবাস। তুমি বাঙালি, বিয়ে করতে চাও? যাও পাঞ্জাব কিংবা গুজরাট কিংবা মাদ্রাজ কিংবা নিদেনপক্ষে আসাম। ইউ.পি. বিহারের লোক? কেরালা, অন্ধ্র, উড়িষ্যা, হিমাচল প্রদেশ যাও পাত্রীর খোঁজে। এইরকমটা যদি সত্যি চলতে থাকে তাহলে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরের প্রজন্মে কে কার গলা কাটছে? সত্যিকারের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম। রুক্মিণী স্বপ্নেই রয়ে গেল। ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনও।

এরপর কলকাতা প্রত্যাবর্তন, আবার সেই বোম্বে মেল। খেয়াল ছিল না যে মাঝপথে অমরাবতীতে নামতে হবে। নাগপুরের দু-একটি স্টেশন আগে বাদনেরা নামে একটি ছোটো স্টেশন, সেখানে ট্রেন থামামাত্র ডক্টর মদনগোপাল লোকলস্কর-সমেত কামরায় ঢুকে আমাদের লটবহরসুদ্ধ নামিয়ে নিলেন। মাইল দশেক দূরে অমরাবতী, গাড়িতেই যাওয়া হল। বাড়ির একতলার বারান্দায় বসে আছেন এক বৃদ্ধ, বয়স আশি কি একাশি হবে, চুল এবং গোঁফ তুষারধবল। আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "আমি ডক্টর মুদালিয়র, মদনগোপালের শ্বশুর, আপনাদের স্বাগত জানাবার জন্যে বসে আছি, এই রুখাশুখা রসকষহীন জায়গাকে আপনারা পাদস্পর্শে ধন্য করলেন। আমি এখন যাই, কাল আবার দেখা হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার এই বোধোদয় হল যে, এ বাড়িতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা কেউ কোনোদিন জল খায় না। খায় বিয়ার। সর্বত্র বিয়ারের বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। একতলার বারান্দায় একটা টেবিলে গণ্ডা কয়েক বোতল নিয়ে গুরুজি জ্ঞানবাবু দেবীকাকা আর মদনগোপাল বসে গেলেন। মদনগোপালের এক ছেলে দুই মেয়ে, তিন এণ্ডিগেণ্ডির ওপর হুকুম হল আমাকে বাড়ি-বাগান ঘুরে দেখাতে। তারা মহাসমাদরে আমায় নিয়ে উপস্থিত করল মদনগোপালের স্ত্রীর কাছে। ভদ্রমহিলা তামিল ছাড়া অন্য কোনো ভাষা একবর্ণও জানেন না, আমি তামিলের একবর্ণও জানি না। কিন্তু আন্তরিকতা থাকলে ভাবের আদানপ্রদান ঠিকই হয়, ভাষায় আটকায় না। তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝে গেলেন যে, আমাকে বিয়ারের টেবিল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তিনি একটা বিকল্প পানীয়ের খোঁজ করতে লাগলেন।

উনুনের একপাশে একটা বিরাট তামার ডেকচিতে একটি কমলা রংয়ের জলীয় পদার্থ ছিল, তিনি একটি মগে সেটা নিয়ে আমাকে দিলেন 'স্যুপ! স্যুপ!' বলে।

মহানন্দে এক চুমুক দিয়েই আমি প্রায় ছাত অবধি লাফিয়ে উঠলাম, লাললঙ্কার গোলা! ছেলেটি অল্পস্বল্প ইংরেজি জানে, আমাকে বুঝিয়ে দিল, ওটি হচ্ছে রসম, পেটের পক্ষে নাকি খুবই উপকারী, সারাদিন যার যখন খুশি নিয়ে নিয়ে খায়।

রাত্রের ভোজন নাকের জলে চোখের জলে সারা হল। জ্ঞানবাবু রাধুবাবু নিবেদন করলেন, আমাদের জন্য যেন লঙ্কাবিহীন কিছু রান্না হয়।

ভোর পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা হবে। আবছা আলো-অন্ধকারে খালি গায়ে শুধুমাত্র আন্ডারওয়্যার-পরিহিত একটি ছায়ামূর্তি হাতে এক মগ বিয়ার নিয়ে ঘরে ঢুকল। সটান

ডা মদনগোপাল

ডা মুদালিযব

গিয়ে গুরুজির বিছানায় বসে পড়ল। বিযাবে ফুচফুচ করে চুমুক দিচ্ছে আব সাদা গোঁফের প্রান্ত বেয়ে বিয়ারের ফেনা পডছে। জ্ঞানবাবু উঠে পড়ে চোখ গোল্লা গোল্লা কবে বললেন, "এ কোন ভুঁড়োশেয়ালি বাঁশবন থেকে বেরোল রে বাবা!" গুরুজি বললেন, "ডক্টব মুদালিযব।" তখন ডক্টব মুদালিযর উঠে দোদুল্যমান গতিতে জ্ঞানবাবুর বিছানায় গিয়ে আদর করে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। "জ্ঞানবাবু, বাধুবাবু, অমরাবতীর অশেষ সৌভাগ্য যে আপনারা এসেছেন, আপনারা এইখানেই থেকে যাবেন, আমি আর আপনাদেব যেতে দেব না। বাড়ি-ঘবদোব, খাওয়াব ব্যবস্থা সব করে দেব।"

এই সময়ে ঘরে ডক্টব মদনগোপালের প্রবেশ। শ্বশুরকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ কী! আপনি এত ভোরে এইখানে? ভদ্রলোকদেব একটু বিশ্রাম নিতেও দেবেন না? আর এখনি বিয়ার শুরু করে দিয়েছেন?"

শ্বশুরোচিত গাম্ভীর্যে বৃদ্ধ জবাব দিলেন, "তোমার কি মনে আছে, যেদিন তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হল, সেদিন আমিই তোমাকে বিয়ার ধরিয়েছিলাম। আর তুমি আজ আমাকে বিয়ারের সময়-অসময় শেখাচ্ছ?"

জামাই হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে নাতি এসে মাতামহের কাছে দাঁড়িয়েছে। তাকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "যা তোর দিদিমার কাছ থেকে আর একটা বোতল নিয়ে আয়!"

নাতি বলল, "এই সকালে বিয়ারেব বোতল চাইলে she will kick me out."

ডক্টর মুদালিয়াব আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে হেসে বললেন, "You gets a kick, but I gets a bottle" (বিয়ারের কল্যাণে ইংরিজি গ্রামারের ণত্বষত্ব লোপ পেয়েছে)। তারপরে বললেন, আমার স্ত্রী নাতির কোনো কথায় না বলতে পারেন না। যা না দাদা, যা, লক্ষ্মীটি!"

নাতি প্রস্থান করল এবং বলাবাহুল্য, আর ফিরে এল না। আরও কতক্ষণ উনি রাধুবাবু-জ্ঞানবাবুকে আদর-আহ্লাদ করেছিলেন মনে নেই। বোধহয় আটটা সাড়ে আটটার সময়ে নিজের বাড়ি চলে গেলেন, বাড়িটা পাশেই।

ঠিক দশটার সময় একটি প্রাচীন শেভ্রলে গাড়ি বাড়ির সামনে এসে থামল, তার ড্রাইভারের সিট থেকে নামল ধবধবে সাদা স্যুট পরিহিত একটি ঋজু দেহ, দাঁড়াবার ভঙ্গি ইস্পাতের মূর্তির মতো, চোখের ঘোলাটে ভাব অন্তর্হিত, সে-জায়গায় শিকারোদ্যত বাঘের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চাহনি। ডক্টর মুদালিয়র!

আমাদের কাছে এসে বললেন, ভোরবেলা মদ খেয়ে আপনাদের কাছে এসে ঝামেলা করবার জন্য ক্ষমা চাইছি। আসলে আজকে আমার সারাদিন অনেকগুলি অপারেশন, তার আগের রাত্রে আমার confidence বাড়াতে এইরকম কাণ্ড করতে হয়, আপনারা কিছু মনে করবেন না। আজ রাতে আমার বাড়িতে আপনারা খাবেন। বলে গটগট করে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

রাধুবাবু বললেন, "বুঝে নিন জ্ঞানবাবু, এই আপনার ভোরবেলার সেই ভুঁড়োশেয়াল!"

সারাদিন ধরে অমরাবতীর বিদগ্ধ লোকেরা দেখা করতে আসতে লাগলেন— সংগীতজ্ঞ, প্রফেসার, স্কুলমাস্টার ইত্যাদি। সকলেরই একরকম জামাকাপড়। মালকোঁচা মারা ধুতিতে গোঁজা শার্ট, ওপরে কোট, মাথায় টুপি, পায়ে কেড্‌স জুতো। বাহন প্রায়শই একটি সাইকেল। একমাত্র ডাক্তার আর উকিলরা ট্রাউজার্স পরিহিত।

সন্ধ্যাবেলা ডক্টর মুদালিয়র ফিরে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জামাই এক মগ বিয়ার অর্ঘ্য নিয়ে নিবেদন করলেন। শোনা গেল তাঁর সেদিনকার অপারেশনের তালিকায় ছিল খানতিনেক অ্যাপেনডিক্স, দুটো হার্নিয়া, একটি হাইড্রোসিল, খুচরো ফোঁড়া-কার্বাঙ্কল গণ্ডাখানেক, এবং শেষমেশ একটি মহিলার পেট চিরে আড়াই পাউন্ড ওজনের একটি টিউমার এবং একটি বাচ্চা ভূমিষ্ঠ করানো, বাচ্চা এবং মা দুজনেই সুস্থ আছে। কথায় কথায় ওঁর জামাই বললেন, উনি স্রেফ এম.বি.বি.এস. পাস, সার্জারিতে কোনো স্পেশাল ট্রেনিং নেই, কিন্তু হাতযশ এমন হয়ে গেছে যে, দূরদূরান্ত গ্রামাঞ্চল এবং শহর থেকেও গোলমেলে কেস ওঁর কাছে আসে, নাগপুরে এফ.আর.সি.এস. ডজনখানেক থাকা সত্ত্বেও।

রাত আটটা নাগাদ ওঁর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। ওঁর স্ত্রী একটু দেখা দিয়েই চলে গেলেন। খাদ্য আসার আগে অবশ্যই পানীয়ের সম্ভার। দুটি তিনটি মদের নাম জানা ছিল, যথা বিয়ার, হুইস্কি এবং ব্র্যান্ডি। এখানে অসংখ্য রকমের এবং মনোহারী নামের মদের বোতল দেখে মাথা ঘুরে গেল। জ্ঞানবাবু, রাধুবাবু একেবারে বাঁশবনে ডোম কানা।

হাতের ইশারায় তাঁদেরকে খুশিমতন ঢালবার এবং খাবার ইঙ্গিত করে ডক্টর মুদালিয়র আমাকে বললেন, "ইয়ং ম্যান তুমি কী খাবে?" গুরুজি সঙ্গে সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বৃদ্ধের উত্তর, "তা কী হয়? আমরা মদে গা-ডুবিয়ে বসে থাকব আর ও কেবল দেখবে? আমার কাজই হয়েছে ওর বয়সি ছেলেদের ব্যাপটাইজ করা। বিয়ার দিয়েই শুরু হোক!"

আমি মৃদু আপত্তি করে বললাম, "আমি শুনেছি বিয়ার খুব তেতো হয়, আমার ভালো লাগবে না।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, "ও, তোমার মিষ্টি কিছু চাই? সাইডার খাও,

একদম আপেলের রস, নিউবর্ন বেবিও খেতে পার।" অগত্যা গুরুজি মত দিলেন। সাইডারের গ্লাসে এক চুমুক দিয়েই বুঝলাম, সেটা সদ্য নিষ্কাশিত আপেলের রস মোটেই নয়, তার মধ্যে উত্তেজক বস্তু দস্তুরমত আছে। নিউবর্ন বেবি খেলেই তার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হতে পারে।

মদের সঙ্গে চাট হিসেবে উপস্থিত হল একটি গামলাভর্তি চড়ুই-এর সাইজের পাখি ভাজা। শুনলাম তার নাম 'বটের'। গুরুজি জ্ঞানবাবু খুঁটে খুঁটে তার হাড় মাংস আলাদা করতে চেষ্টা করছেন দেখে ডক্টর মুদালিয়র বললেন, ওভাবে খেলে একঘণ্টায় একটাও খেতে পারবেন না, তৃপ্তিও হবে না। এই দেখুন, বলে সটান একটি আস্ত বটের মুখে চালান করে দিলেন, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে তার সারাংশ শুষে নিয়ে হাড়গুলি ডাঁটা চিবোনোর মতো ছিবড়ে করে ফেলে দিলেন।

পরের দিন মদনগোপাল আমাদের স্থানীয় একটি জলসায় নিয়ে গেলেন। মনে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে গেলাম, এখানকার গানবাজনা আর শুনব কী! এক ভদ্রলোক গান গাইছেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের চুপ করে মন দিয়ে শুনতে বাধ্য করলেন। অপ্রচলিত একটি রাগ, গোরখ-কল্যাণ, তার সুন্দর একটি বন্দিশ। গাইবার ঢঙ এবং বিস্তার ও তানেব কাজ পবিষ্কার সুরেলা এবং ক্ষমতার বাইরে ওস্তাদি দেখাবার কোনো প্রচেষ্টা নেই। মদনগোপাল সাহেবকে ওঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম উনি জয়ন্তরাও দেশপাণ্ডে, অমরাবতী রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশনমাস্টার! কিছুকাল রতনজনকার সাহেবের কাছে শিখেছিলেন, পরে জীবিকার তাগিদে এখানে চলে এসেছেন, এখনো মাঝে মধ্যে দেখা করে আসেন।

জীবিকায় রেলের লোক, এই করেই তাঁর জীবন কাটবে, তবু অল্পবয়সে যে গান শিখেছিলেন, পরম নিষ্ঠা এবং মমতা সহকারে তাকে বাঁচিয়ে রাখছেন ভদ্রলোক। কোনো বড়ো কনফারেন্সে তিনি গাইবার জায়গা পাবেন না, কোনো কাগজে তাঁর প্রশস্তি বেরোবে না, তাতে কিছু যায় আসে না। স্টেশনে ওঁর অফিসে বসে বসে ভাটিয়ার, মালুহা কেদার, শুক্লা বিলাওল ইত্যাদি রাগের কিছু দুষ্প্রাপ্য বন্দিশ আমাকে শোনালেন। পরে যাচাই করে দেখেছিলাম সেগুলি সর্বতোভাবে খাঁটি। এখনো অমরাবতীর স্টেশনমাস্টার জয়ন্ত দেশপাণ্ডেকে মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে, সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

কিন্তু এরপরেও আরো বিস্ময় আমাদের জন্য তোলা ছিল। ওখানকার একজন গায়ক, রাজাভাউ নৌশলকার, তাঁর গান। চেহারাটি সেই আটপৌরে, মালকোঁচামারা ধুতিতে শার্ট গোঁজা, তার ওপর কোট, টুপি এবং কেড্‌স জুতো। মুদির দোকানে মুদি হয়ে বসে থাকলেও ঠিক মানাত।

ভদ্রলোক গান শুরু করতেই আমরা চমকে গেলাম। ওস্তাদ আবদুল করিমের কণ্ঠ যেন কেউ তুলে নিয়ে ওঁর গলায় বসিয়ে দিয়েছে। সুরে মাখামাখি, আবেগে আপ্লুত আওয়াজ, কিরানা ঘরানার নির্ভেজাল তালিম। দু-ঘণ্টা আমাদের একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন করে রাখলেন। তারপর নমস্কার করে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। নৌশলকারজির গান শুনে উপলব্ধি করতে পারলাম, এই বিশাল ভারতবর্ষের কোন

অজানা কোণায় কোন সংগীতরত্ন অপরিচিত থেকেই জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন কেউ তার খোঁজ রাখে না।

এর বেশ কিছুকাল পরে বারকয়েক অমরাবতী গেছি, একা-একাই, মদনগোপাল সাহেবের সস্নেহ আহ্বানে। তখন আমার দুজন মনের মানুষ আর নেই। নৌশলকারজির অকালমৃত্যু হয়েছে, দেশপাণ্ডে সাহেব রিটায়ার করে পুণায় চলে গেছেন। বেঁচে আছেন, এবং দস্তুরমতন বেঁচে আছেন, ডক্টর মুদালিয়র। দেখেই চিনতে পারলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "ও, ইউ আর দ্যাট ডুং ডুং ফেলো! হাউ ইজ রাধুবাবু, হাউ ইজ জ্ঞানবাবু?" এর পরের প্রশ্নটি আমাকে বিলক্ষণ চমকে দিল : "আর ইউ স্টিল সিপিং সাইডার, অর হ্যাভ ইয়ু গ্র্যাজুয়েটেড টু হুইস্কি ব্র্যান্ডি ভদ্‌কা?"

ভদ্রলোক চুরানব্বই বছর অবধি বেঁচে ছিলেন। ওঁর নব্বই বছর বয়সে অমরাবতীর লোকেরা ওঁর ব্রোঞ্জের মূর্তি টাউন হলে প্রতিষ্ঠা করেছিল।

আরো বলবার আছে। চুরাশি বছর বয়সে একদিন একটি হার্নিয়া অপারেশন করতে গিয়ে ওঁর হাত কেঁপে কাটাটা (incision) এ্যাঁকাব্যাঁকা হয়ে যায়। থমকে দাঁড়ালেন। কিন্তু রোগি তখন অ্যানাসথেসিয়ায়, তার পেট কাটা হয়ে গেছে, আর কোনো উপায় নেই। কোনোমতে সেই অপারেশনটা শেষ করে ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বলললেন, "আমি আর কোনোদিন অপারেশন করব না। বাকি কেসগুলিকে এক্ষুনি আমার গাড়ি এবং মদনগোপালের গাড়ি করে নাগপুরে পাঠিয়ে দাও। আমি টেলিফোন করে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

চ তু র্দ শ প রি চ্ছে দ
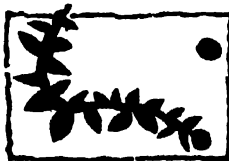
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ : দ্বিতীয় পর্ব

একটা ভয়ংকর, গম্ভীর উত্তেজনাময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোস্টেলের ঘরে। ঘরটি আমাদের সহপাঠী প্রসূন ব্যানার্জির, যার আয়তনের জন্য তাঁকে আমরা 'বড়দা' বলে ডাকতাম। মোটামুটি খানতিনেক বুদ্ধদেবকে কিমা করে তাই দিয়ে তার দুই তৃতীয়াংশ উচ্চতায় যদি একটা মানুষ গড়া যায়, আমাদের বড়দা ছিল ঠিক তাই। অথচ এইরকম একটা শরীর থেকে যে গলাটি বেরোত, তা ছিল যেমন মিহি তেমনি প্রেমী। বড়দার ঘরের পাশ দিয়ে গেলেই, বড়দা মধুমাখা স্বরে আহ্বান করতেন : এ—ই Sালা- !

গলার উত্থান-পতন পাশের ড্যাস চিহ্ন থেকে আন্দাজ করা যাবে। সে-আহ্বান উপেক্ষা করার সাধ্য কারোর ছিল না, এসে দু-দণ্ড বড়দার সান্নিধ্যে থেকে তাঁর নানারকম বাণী এবং উপদেশামৃত লাভ করে যেত। বড়দা ছিলেন গানবাজনা, সিনেমা, সাহিত্য, সাইকোলজি, প্ল্যানচেটবিদ্যা, সেকসোলজি ইত্যাদি সবকিছু শাস্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট এক অবধূত।

যাই হোক, আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বড়দার ঘরে বড়দা যোগনিদ্রায় শায়িত। তাঁর নাভিকুণ্ডলকে ঘিরে ছ-টি ছেলে তাঁর ভুঁড়ির ওপর মাথা রেখে, ঠ্যাংগুলি চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, যেন পদ্মের পাপড়ি। কারো ঠ্যাং খাটের ধারের রেলিং-এর ওপর, কারো বা ছত্রির ওপর। হোস্টেল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট কী একটা কথা বলতে এসে দরজা থেকে এই দৃশ্য দেখে 'Oh my God!' বলে দ্রুত পলায়ন করলেন। বড়দা আমাদেরকে নায়িকা ডিস্ট্রিবিউট করছেন, অথবা তার থেকেও বলা ভালো, প্রেসক্রাইব করছেন। আমরা এতগুলি জোয়ান ছেলে, বয়স আঠারো থেকে কুড়ি-একুশ, বাড়ি থেকে উৎপাটিত, সদ্য কলেজ (কোনো কোনো ক্ষেত্রে কো-এডুকেশন্যাল) ছেড়ে শিবপুরে এক

সাহারা মরুভূমিতে এসে পড়েছি। মেয়েদের সঙ্গ দূরে থাক, দর্শন মেলা ভার। মাস্টারমশাইদের বাড়ির দু-একটি মেয়ে যখন স্কুল-কলেজে যায় তখন তাদের দিকে কথামালার শৃগালের মতো সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। আরো দূরে, কলেজের বাইরে, রাস্তা দিয়ে যে-কয়েকটি মেয়ে চলাফেরা করে তাদের তো বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করাই যায় না! কেউ কেউ আবার দূরবিন আমদানি করেছে এইজন্য।

চিত্তের এরকম ফুটন্ত অবস্থায় পড়াশুনোতে কী করে মন বসবে? তাই বড়দার এই নায়িকাথেরাপি। কোন ছেলের কী ধরনের মেয়ে পছন্দ, তার মানসিক 'ধাত' কী রকম, তাই বিচার করে বড়দা প্রেসক্রিপশন দিতেন—'তুই অমুক নায়িকাকে নিয়ে নে'। নিয়ে নেওয়া মানে, শয়নে-স্বপনে তার চিন্তা করা, তার অভিনীত ছবি দেখা এবং ফোটোগ্রাফ বা ছবি জোগাড় করে পড়ার বইয়ের পেজমার্ক হিসেবে রেখে দেওয়া। এই কাজের জন্য বড়দার ফি ছিল এক প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট।

তিনটি সিনেমা হল, যেখানে গিয়ে অভীষ্ট নায়িকাদের দেখে আমাদের তাপিত হৃদয় শীতল হত, সেগুলি হল ঝর্না, মায়াপুরী ও অলকা—এখনো শিবপুর অঞ্চলে সগৌরবে বিরাজমান। যে-সব বিভিন্ন চেহারার এবং বিভিন্ন স্বাদের নায়িকা তখন রুপোলি-পর্দা আলো করে বিরাজ করতেন তাঁরা এইভাবে আমাদের পড়ার বইতে অবতীর্ণ হলেন। যেমন থিওরি অফ মেসিনস-এ নিম্মি, থারমোডাইনামিকসের মধ্যে মীনাকুমারী, ইলেকট্রিক্যাল সারকিটসে নার্গিস, হাইড্রলিকসে গীতাবালী, ননফেরাস মেটালস-এর বইতে কল্পনা কার্তিক, হিট ইঞ্জিন্স-এর বইতে হেলেন অথবা বেগম পারা।

আমার বেলায় প্রেসক্রিপশন হল মধুবালা। বড়দার বক্তব্য : তুই গাইয়ে-বাজিয়ে, ভাবুক ছেলে, আর ও অত্যন্ত শান্ত সংযত ঠান্ডা মহিলা। নিয়মিত দ্যাখ, বাজনাতে ভাবের একেবারে বান ডাকবে।

যথাসত্বর সম্ভব মায়াপুরীতে মধুবালার একটা ছবি দেখলাম। দেখে মেজাজ একেবারে খিঁচড়ে গেল। কোথায় শান্ত ঠান্ডা মধুবালা! অতিশয় কিলবিলে, বাগানে ঘুরে ঘুরে নাচছে, একদণ্ডও স্থির থাকছে না। টিকিটের পয়সাটাই মাটি। হোস্টেলে ফিরে বড়দার ভুঁড়িতে খান দুই ঘুঁষি ঝেড়ে বললাম, "শালা! এই তোর মধুবালা! ফেরত দে আমার ক্যাপস্টানের প্যাকেট।"

বড়দা কুঁইকুঁই করে বলল, এই ছবিটা দেখতে তোকে কে বলেছিল, ইডিয়েট কোথাকার! আমি তোকে যে-মধুবালার কথা বলছি সে হল 'মহল'-এর মধুবালা। ছায়ার মতো সামনে আসে, ছায়ার মতো মিলিয়ে যায়। একদম চ্যাঁচায় না, আস্তে আস্তে কথা বলে, যখন মুচকি হাসে, মোনালিসার হাসি পানসে হয়ে যায়, আর যখন কাঁদে তখন নীচের ঠোঁটটি একটু কামড়ে ধরে, গাল বেয়ে মুক্তোর মতো জল ঝরে। Enough to melt a heart of stone!

'মহল' দেখলাম। দেখে সে-রাত্রে আর ঘুম হল না। মনে হতে লাগল, আমি

আমাব শিবপুবেব সহপাঠী 'বড়দা'

আমাব পিসতুতো ভাই সোমেশ বায়েব চোখে আমি

অশোককুমার হয়ে সেই ভুতুড়ে বাড়ি 'মহল'-এর ভেতর-বাইরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, গম্বুজের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্তির দুটো বাজলেই কোথা থেকে ছায়ার মতো মধুবালা নেমে আসছে, মুখে তাব গান, 'আয়েগা আনেওয়ালা'। যতবার ধরতে-ছুঁতে যাচ্ছি, কোথাব থেকে কোথায়, বাগান থেকে দোতলায় বারান্দায়, সেখানের থেকে ছাদের কার্নিশে, ঘড়ি-গম্বুজেব পাশে আলেয়ার মতো সরে সরে যাচ্ছে। আমার জন্মজন্মান্তরের প্রেমিকা।

আজ পরিণত বয়সে এইসব কথা মনে পড়ে হাসি পায় ঠিকই, কিন্তু তখন ছবিটা আমাকে সত্যি সত্যি যাকে বলে গ্রাস করেছিল, বারো-চোদ্দোবার দেখেছিলাম। ছবিটা অত্যন্ত সংযত এবং সিরিয়াস, ছ্যাবলামি নাচনকোঁদন বিন্দুমাত্র ছিল না। আর গানগুলো ছিল সত্যিই অসাধারণ, বিশেষ করে লতাজির গলায় গাওয়া 'আয়েগা আনেওয়ালা' (শুরুর কথা দুটি যেমনই হোক, পাঠকদের অনুরোধ করব গানটি জোগাড় করে শুনতে, যিনি অভিভূত হবেন না, তাঁর ভেতরে সংগীত নেই)। মাঠেঘাটে, পুজোপ্যান্ডেলে, বিয়েবাড়িতে, পানের দোকানে সর্বত্র আয়েগা আনেওয়ালা। লোকে তখন এ-সুরটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি, ঠাট্টা করে বলত দ্বিতীয় ন্যাশনাল অ্যান্থেম, এমনকী এ-গানটিকে নিয়ে কমিকও তৈরি হয়েছিল—যথা, কন্যাদায়গস্ত পিতা সারাদিন পাত্রের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে, বিফল মনোরথ হয়ে, সন্ধেবেলা যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন আইবুড়ো মেয়ে একটি হাঁপানি-ধরা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছে, 'আয়েগা আনেওয়ালা'। বাপের মাথায় আগুন ধরে গেল। চিৎকার করে উঠলেন—"হা-রা-ম-জা-দি, আয়েগা আনেওয়ালা? ঘরদোর বন্ধক রেখে একটা পাঁঠার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে পারছি না, ষাঁড়গুলো তো ধরাছোঁয়ার বাইরে, আর উনি কঁকিয়ে মরছেন আয়েগা আনেওয়ালা! দশ হাজারের কমে কো—ই নেই আয়েগা।"

গানটিকে নিয়ে যতই হাসিঠাট্টা হোক, এর সুরটি সত্যি তুলনাহীন, ছায়াছবির গানের মধ্যে একটি রত্ন বিশেষ। আজও মধ্যে মধ্যে এ গানটির মধ্যে ডুবে যাই।

আমাদের প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক বীরেন মাস্টারমশাইয়ের হাতে একটি সিনেমার নায়িকার ছবি একটি ছেলের ল্যাবরেটরি নোটবুক থেকে আবির্ভূত হল। তিনি কয়েক মুহূর্ত সেটিকে নিরীক্ষণ করে বললেন, "বা-বা-বা-বাবাজীবনরা! একে তো বাবার পকেট মেরে সিনেমা দেখা হয়, তার ওপর একে এখানে আমদানি করেছ? পরীক্ষার হলেও এই ছবি নিয়ে যেও, একবার কোশ্চেন পেপারের দিকে একবার ছবির দিকে, আবার কোশ্চেন পেপারের দিকে তারপর আবার ছবির দিকে তাকিয়ে থেকো, খাতায় উত্তর আপনিই গড়গড়িয়ে লেখা হয়ে যাবে।"

বীরেন মাস্টারমশায়ের ক্লাসে এরকম কয়েকটি অগ্ন্যুদ্গীরণ না-হলে মনে হত ক্লাসটা সেদিন নিতান্ত ফিকে হয়ে গেল। উনি ছিলেন সমস্ত প্রফেসরের বয়োজ্যেষ্ঠ, সবাইকে নাম ধরে ডাকতেন এবং তুমি-তুমি করে কথা বলতেন। একটি ছাত্র একদিন কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় তাকে উপদেশ দিলেন, "বাড়ি ফিরে যাও। বাবাকে বোলো তোমায় একটি কানা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে, যাতে সে কখনো তোমার চাঁদমুখটি দেখতে না-পায়। তারপর মনের আনন্দে ছাগলের সংখ্যা বাড়াও।"

বয়লারের কয়লা পুড়িয়ে জল ফুটিয়ে স্টিম তৈরি হয়, তাই দিয়ে স্টিম ইঞ্জিন চালানো হয়। এই বয়লারের প্র্যাকটিকাল ক্লাসে একদিন একটা মারাত্মক ভুল করে বসেছি, মাস্টারমশাই আমাকে বললেন, "আর বই পড়া কেন! ল্যাবরেটরিতে তোমার ওই গদাটা (মানে সরোদটা) নিয়ে আর হেলেনের ছবি নিয়ে বসে যাও, গদা বাজাতে থাকবে, হেলেন নাচতে থাকবে, বয়লারের স্টিম আপনিই তৈরি হবে।"

ওঁর তিরস্কারের ভাষা যে কল্পনার দৌড়ে কোনদিকে কতদূর গিয়ে পৌঁছবে তা কিছুই আন্দাজ করা যেত না। একটি ছেলে পর পর দু-দিন ক্লাসে দেরি করে এসেছে, কৈফিয়ত চাওয়াতে আমতা আমতা করে বলছে, "ঠিক... পেরে উঠিনি স্যর।"

"ঠিক পেরে ওঠোনি! আহা, দুধের বাছা রে আমার! মাকে বোলো একটা ঝি রেখে দেবে। ঝি রোজ কোলে করে ঠিক সময়ে ক্লাসে পৌঁছে দেবে—"

মাস্টারমশাইয়ের একটি অতিশয় প্রিয় অঙ্ক ছিল চিমনির অঙ্ক। বয়লারের চুল্লিতে কয়লাটা ভালোভাবে জ্বালাতে প্রচুর বাতাস লাগে, সেই বাতাস জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে দিয়ে টানবার ব্যবস্থা করে চিমনি। চিমনি যত উঁচু হবে ততই বেশি বাতাস টানবে। অতএব একটি বয়লারে ঘণ্টায় ১০০ টন কয়লা ঠিকভাবে পোড়াতে গেলে চিমনি কতটা উঁচু হবে? অঙ্কটা কষতে গেলে আরো কয়েকটি তথ্য জানা দরকার, যথা বায়ুমণ্ডলের টেম্পারেচার, চিমনি থেকে বেরোনো গ্যাসের টেম্পারেচার ইত্যাদি।

মাস্টারমশাইয়ের চিমনির অঙ্কে এই জিনিসগুলির পরিমাণ বরাবর একই থাকত, অর্থাৎ সংখ্যাগুলি কিছুমাত্র বদলাত না, কাজেই উত্তরটাও একই থাকত—১৫০ ফুট উঁচু হবে চিমনি।

একবার একটি টারমিনাল পরীক্ষায় দেখা গেল সেই অঙ্কটি এসেছে। ব্যাস, প্রতিটি স্টেপ মুখস্থ, সবাই চোখ বুজে উত্তরে পৌঁছে গেল, ১৫০ ফুট।

মাস্টারমশাই কিন্তু কয়লার পরিমাণ ১০০০ টন করে দিয়েছিলেন, সেটা অধিকাংশ ছেলের নজরেই পড়েনি। যে দু-একজনের নজরে পড়েছে তারা অঙ্ক কষে অন্য একটা উত্তর পেয়েছে। তাই নিয়ে পরীক্ষার পরে উত্তর মেলাতে গিয়ে মহা অশান্তি। তর্কাতর্কিতে কয়লার পরিমাণটা যে ১০০ টন নয় ১০০০ টন, সেটা তখনো ঠিক নজরে পড়েনি। এমন সময় দেখা গেল মাস্টারমশাই পরীক্ষার খাতার বান্ডিল বগলে করে হল থেকে তাঁর অফিসঘরের দিকে যাচ্ছেন। কয়েকজন গিয়ে ধরল, "নমস্কার স্যার।"

"এত ভক্তি কেন? পরীক্ষায় ধেড়িয়েছ?"

"আজ্ঞে, এই বয়লারের অঙ্কের উত্তরটা যদি দয়া করে বলে দেন!"

"উত্তর? কীসের উত্তর?"

"মানে অঙ্কটার ফলাফল।"

"আঁকের ফলাফল দু-রকমেরই হয়—হয় ফুলমার্ক, নয় গোল্লা। এখন কেটে পড়ো, যথাসময়ে জানতে পারবে। কোশ্চেনটা মন দিয়ে একবার পড়ো গিয়ে।"

তারপরে জানা গেল, মাস্টারমশাই টেলিফোনে হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট দুর্গা ব্যানার্জিকে বলেছেন, 'দুগ্‌গা, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই—বীরেন মাস্টারের অঙ্ক তো, অতএব সব ১৫০ ফুট। একবার ন্যাজ উলটে দেখারও দরকার নেই। ছোঁড়াগুলো গরিব বাপের পয়সা ধ্বংস করতে আসে। ওদিকে বাপেদের হাঁপ ধরে যাচ্ছে টাকার জোগান দিতে। দেখো, কয়েক মার্ক গ্রেস দিয়ে যদি আর কয়েকটাকে পাস করানো যায়, চোটটা তো গিয়ে পড়বে বাপের ওপর।"

শিবপুরের প্রফেসর সান্যালের হামানদিস্তায় অনবরত ছ্যাঁচা খেয়ে আমরা ড্রয়িংটা মোটামুটি ভালোই রপ্ত করেছিলাম। ইঞ্জিনিয়ারের একমাত্র ভাষা ড্রয়িং। বাড়ি-ঘরদোর, রাস্তাঘাট, ব্রিজ এবং মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন, জাহাজ, এককথায় দুনিয়ার ছোটোবড়ো যে-কোনো যন্ত্র সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে গেলে এবং তৈরি করতে গেলে লাগবে তার বিভিন্ন অংশের নক্‌সা, ওপর-নীচ-ডানদিক-বাঁদিক থেকে কেমন দেখায়, কী তার মাপ ইত্যাদি।

প্রথম দু-বছর এই বিদ্যেটা আয়ত্ত করা এবং তারপরের দু-বছর তার নানাবিধ প্রয়োগ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের বাড়ি-ঘরদোর, মেকানিক্যালদের স্টিম ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন, ক্রেন, লেদ মেশিন, টারবাইন, বয়লার। সবকিছুব ডিজাইন এবং ড্রয়িং সারা বছরের পরীক্ষার নম্বরের একটা বড়ো অংশ জুড়ে থাকত এবং তাই নিয়ে চলত নানা কর্মকাণ্ড। নিজের মস্তিষ্ক ছাড়াও অপরের মস্তিষ্কের সাহায্য যথাসাধ্য নেওয়া হত, বিশেষ করে আগেকার বছরগুলিতে পাস করে যাওয়া কোনো কোনো পরিশ্রমী 'দাদা'র ড্রয়িং সংগ্রহ করে সেগুলিকে বেমালুম টুকলিফাই করা ছিল একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। তার জন্য আমরা দুটি বিশেষ ক্রিয়ার সাহায্য নিতাম—একটি হচ্ছে 'কাঁটা মারা', অন্যটি

হচ্ছে 'চাপান দেওয়া'।

কাঁটা মারা হচ্ছে, ডিভাইডার দিয়ে অন্যের ড্রয়িং-এর বিভিন্ন অংশের মাপ বেমালুম তুলে নিয়ে তাই দিয়ে নিজের ড্রয়িং তৈরি করা। এই মহাবিদ্যায় কেউ কেউ এমনই পারদর্শী হয়ে উঠত যে, ডিভাইডার বা কাঁটা আর মূল ড্রয়িং-এ বসাতেও হত না, দূর থেকেই বন্দুক তাগ করার মতো একচোখ বুজে আরেকটি চোখের সাহায্যে প্রায় নির্ভুলভাবে আন্দাজ করা যেত। এটা খুব বেশি কাজে লাগত পরীক্ষার হলে।

চাপান দেওয়া—যার সভ্য এবং নির্দোষ নাম ছিল ট্রেস করা, তার পদ্ধতি এইরকম—একটি টুলকে উলটিয়ে মাটিতে রাখো যাতে তার চারটে পায়া আকাশের দিকে উঁচিয়ে থাকে। পায়াগুলির ওপরে একটা বড়ো মোটা কাচ (টেবিলের ওপরে যেমন থাকে) চাপিয়ে দাও, কাচের নীচে একটা জোরালো একশো ওয়াটের বাল্‌ব জ্বালিয়ে দাও। কাচের ওপরে আগের বছরের কোনো দাদার করা ড্রয়িং পাতো, তার ওপরে নিজের সাদা ড্রয়িং শিট্‌। নীচের ড্রয়িং এবং তোমার সাদা শিট্‌ ভেদ করে পুরো ছবিটাই পরিষ্কার দেখা যাবে। মনের আনন্দে পেনসিল বুলিয়ে যাও। দাদার পনেরো দিনের পরিশ্রমের ফসল দেড় ঘন্টায় তোমার ঝুলিতে।

প্রফেসাররা এই কীর্তির কথা জানতেন না, বুঝতেন না এমন নয়, কিন্তু ছেলেগুলোর ঘাড়ে গন্ধমাদনতুল্য টাস্কের কথা বিবেচনা করে হয়তো কিছুই বলতেন না। এই ড্রয়িংগুলির ওপর সারা বছরে কিছু নম্বর দেওয়া হত, যেটা ফাইনাল পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে যোগ হত, এর নাম ছিল 'সেশন্যাল মার্কস'।

আমাদের মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের বড়োকর্তার নাম ছিল আর. জি. পি. এস. ফেয়ারবার্ন, আগেই বলেছি, আমরা আড়ালে ডাকতাম রসগোল্লা পান্তুয়া সন্দেশ ফেয়ারবার্ন বলে। সাহেব ছিলেন একজন কট্টর স্কচম্যান এবং স্কচম্যানদের সুবিদিত কিপ্টেমি তাঁর টাকাকড়ির ব্যাপারে টের না-পেলেও পরীক্ষার নম্বরে আমরা বিলক্ষণ টের পেতাম। তাঁর প্রশ্নপত্র তৈরি করা এবং খাতা দেখার ধরন ছিল এইরকরম : প্রথম চল্লিশ মার্ক অর্থাৎ পাসমার্ক তুমি সহজেই তুলতে পারবে, বিষয়টা যদি মোটামুটি বুঝে থাকো। কিন্তু তার ওপর প্রতিটি নম্বরের জন্য উনি তোমার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বার করে ছাড়বেন। ফার্স্টক্লাস মার্ক প্রায়শই কেউ পেত না, এমনকী ফাইনাল পরীক্ষাতেও শিবপুরে মেকানিক্যালে এক-আধবার শুধু সেকেন্ড ক্লাস পেয়েই সবাই বেরোল। তাতে সাহেব বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না। তাঁর হাত দিয়ে বেরোনো সেকেন্ড ক্লাসরা অন্য জায়গায় বহু ফার্স্টক্লাসকে ঘোল খাওয়াতে পারে, এই ছিল তাঁর বিচিত্র এক আত্মপ্রসাদ।

তাঁর বহু স্মরণীয় গুণের মধ্যে একটি ছিল, নিতান্ত প্রশান্ত চিত্তে হাসি হাসি মুখে তিনি আমাদের যখন-তখন বংশদণ্ড দিতে পারতেন, সে-বংশদণ্ড একেবারে প্রাণঘাতী না-হলেও বিলক্ষণ ক্লেশকর ছিল। কখন সেটি আসবে তার একটা সিগন্যাল ছিল। সাহেব হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকলেই আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতাম—'এইবার বাঁশ নামছে রে!' বাঁশের নমুনা হল এমন একটি টাস্ক, যেটা সারারাত্তির জেগে

'কাঁটা মেরে' 'চাপান দিয়ে' ঠিক সময়ে শেষ করা অসম্ভব।

সাহেব সর্বদাই অর্ধসমাপ্ত কথা বলতেন। ব্ল্যাকবোর্ডে একটি ঘাড়-ভাঙা টাস্ক লিখে, মাথা চুলকে বললেন, 'তোমাদের...বৃহস্পতিবার...মহেন্দ্র...সাড়ে তিনটে...'। অর্থাৎ আমাদের বুঝে নিতে হবে বৃহস্পতিবার সাড়ে তিনটের মধ্যে কাজটি শেষ করে খাতা-ড্রয়িং ইত্যাদি জমা দিতে হবে ডিপার্টমেন্টের বেয়ারা মহেন্দ্রর কাছে।

তারপরে যথারীতি রাত্রি জাগরণ, ঘনঘন সিগারেট ধ্বংস, শিটের খসখসানি, টি-স্কোয়্যারের ঠকাঠক এবং মধ্যে মধ্যে বড়দার মিহি গলায় আর্তনাদ—'এ Sালা Sাহেবের CSSন্যাল একেবারে রক্তবীজের ঝাড় মাইরি, কিছুতেই CSS হবে না।'

এমনি একটি কিস্তিতে আমরা দুর্গানাম জপ করে যে যার কাগজপত্র জমা দিলাম। বড়দার ড্রয়িং ছিল খুবই পরিষ্কার ঝকঝকে, তা সে নিজের মস্তিষ্কপ্রসূতই হোক বা অন্য কোনো দাদার ড্রয়িং টুকেই হোক। সাহেব বড়দার ড্রয়িংটার দিকে খুবই মনোযোগ সহকারে স্মিতহাস্যে তাকিয়ে আছেন দেখে বড়দার একটু ভরসা হল, বোধহয় সাহেবের পছন্দ হয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, "ইজ ইট অলরাইট স্যার?"

সাহেব বললেন, "ইয়েস... ভেরি বিউটিফুল ওয়ার্ক..., বাট..." বলে বাংলার পাঁচের মতো হাসি হেসে লাল পেনসিল দিয়ে ড্রয়িং-এর নীচে ডানদিকের কোণায় বড়োসড়ো একটা গোল্লা আঁকলেন। দেখা গেল, বড়দা এতই তন্ময় হয়ে ড্রয়িংটা ট্রেস করেছে যে, ডানদিকের কোণায় যেখানে নিজের নাম-রোল নাম্বার-ইয়ার ইত্যাদি লিখতে হয়, সেখানে ড্রয়িংটার আদি রচয়িতা-দাদাটির নাম-রোল নাম্বার-ইয়ার ইত্যাদি সবই টুকে ফেলেছে ঘোরের মাথায়।

ভোঁস করে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বড়দা শিটটা ফেরত নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হল। সাহেব আবার একটু বাংলার পাঁচ হাসি সহযোগে বললেন, "তুমি... সোমবার... সাড়ে এগারোটা... মহেন্দ্র... টোয়েন্টি পার্সেন্ট মার্ক ডিডাকশন... পেনাল্টি...।"

এ-ব্যাপারে আমরা কেউই ধোয়া তুলসীপাতা ছিলাম না, এই কীর্তি বহুবার করেছি, না-করলে সেসন্যাল শেষ করা অসম্ভব ছিল এ-কথা আগেই বলেছি। কেবল ড্রয়িং-এর ডানদিকের তলার কোণায় নামধাম লেখার ব্যাপারে যথেষ্ট হুঁশিয়ার ছিলাম, বেচারা ভোলানাথ বড়দা খামোকা লাঞ্ছিত হল।

ফোর্থ ইয়ার ছিল শেষ বছর এবং মর্মান্তিক পরিশ্রমের বছর। তার মধ্যেও এক-আধবার পালিয়ে গিয়ে ওস্তাদের বাড়িতে কিছু সময় কাটাতাম হাঁপ ছাড়বার জন্য, কলেজের ধোলাই-এর বদলে তখন ওস্তাদের ধোলাই নিতান্ত মধুমাখা মনে হত। বাজনা ছাড়াও গুরুর কাছে আরো অনেক বিষয়ে তালিম হয়েছে, বাস্তবিক এই কারণেই অতীতে গুরুগৃহে গুরুর সঙ্গে সর্বদা থাকার নিয়ম ছিল।

গুরুদেব তখন থাকতেন তিলজলায়, নাটোর পার্কে, নাটোরের মহারাজার কতকগুলি বাড়ি ছিল—তার একটিতে। ওঁর বসবার ঘরের জানলার উলটোদিকেই ছিল 'লুম্বিনী উদ্যান', মহিলা-পাগলদের চিকিৎসালয়। গুরুদেব কমলা রঙের একটি লুঙ্গি পরে

জানলার পাশে তক্তাপোষের ওপর বসে একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করছেন, আর পাগলাগারদের জানলায় দাঁড়িয়ে মহিলারা তাঁকে নানারকম রোমাঞ্চকর সম্ভাষণ করছেন : ললিত বাজাতে পারেন কি না, বাজাতে বাজাতে নাচতে পারেন কি না জিজ্ঞাসা করছেন, খালি-গা কার্তিককে লুঙ্গিটাও খুলে ফেলে দিগম্বর হবার উপদেশ দিচ্ছেন; গতজন্মে ওঁকে যেন কোথায় দেখেছেন সেই স্মৃতি আকুল হয়ে রোমন্থন করছেন— গুরুদেব নির্বিকার। এই দৃশ্য প্রায়ই দেখা যেত।

একদিন এই পরিবেশে গুরুদেবের কাছে বসে আছি, এমন সময় জনাকতক লোক এসে নমস্কার করে দাঁড়াল।

"কী ব্যাপার?"

"আজ্ঞে আমরা অমুক পাড়ার অমুক ক্লাব থেকে আসছি, আমরা এবার খুব বড়ো করে সরস্বতীপুজো করছি, আপনাকে সেখানে বাজাতে হবে।"

"বেশ, বাজাব। কিন্তু বাজনার জন্য আমার একটা পারিশ্রমিক আছে, সেটা দিতে হবে।"

"আজ্ঞে, হেঁ হেঁ, এ আপনি কী বলছেন? সরস্বতীপুজো বলে কথা, সেখানে মায়ের সামনে আপনি বাজাবেন, টাকা চাইছেন?"

"অ—! মায়ের সামনে বাজাব অতএব টাকা চাওয়াটা অন্যায়? এক কাজ করুন, বাজারে যখন পুজোর নৈবিদ্যি কিনতে যাবেন, শশা-কলা-আখ-লেবু-বাতাসাওয়ালাদের বলবেন, মায়ের সামনে সেগুলি দেওয়া হবে, সে যেন বিনামূল্যে বিনা পয়সায় দিয়ে দেয়। মায়ের মূর্তি যার কাছে থেকে নেবেন, সে যেন বিনামূল্যে মূর্তিটা আপনাদের দিয়ে কেতাত্থ হয়। পুরুতমশাইকে বলবেন, মায়ের পুজো করবেন, তার জন্য আবার দক্ষিণা কীসের? আচ্ছা এখন আসুন, নমস্কার।"

লোকগুলি হাঁ করে রইল একটুক্ষণ, সে হাঁ আর বন্ধ হল না। তারপরে তারা চলে গেল।

আর একদিন। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে আটটা অবধি গুরুদেব এক জায়গায় বাজাবেন। সাড়ে পাঁচটায় ওঁকে নিতে আসবে, আমি খবর পেয়ে তার অনেক আগেই পৌঁছে গেছি। গুরুদেব সেজেগুজে যন্তর নিয়ে তাঁর সেই বিখ্যাত তক্তপোষের উপর বিরাজমান।

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। ছ'টা। সওয়া ছ'টা, উদ্যোক্তাদের টিকির দেখা নেই। সাড়ে ছ'টা, পৌনে সাতটা, সাড়ে সাতটা...। গুরুদেব জামাকাপড় ছেড়ে সেই কমলা রঙের লুঙ্গি পরে বসে বসে সিগারেট পাকিয়ে খেতে লাগলেন।

পৌনে আটটার সময়ে উদ্যোক্তারা বত্রিশ পাটি দাঁতের হাসি হেসে এসে নমস্কার করলেন। গুরুদেব তদুত্তরে নিঃশব্দে হাসলেন, কিন্তু এত আকর্ণ বিস্তৃত হাসি তাঁকে কোনোদিন হাসতে দেখিনি। একটা বাঘ যেন ভেংচি কাটছে।

"আপনাদের কী চাই?"

প্রশ্নটা তাদের সকলকে চমকে দেবার মতো।

"আপনার তো আজকে বাজনা ছিল।"

"আজ্ঞে ছিল। সাড়ে পাঁচটার সময় আপনাদের আমাকে নিতে আসবার কথা।

এসেছেন পৌনে আটটায়। আপনারা কি মনে করেন, কয়েকটা টাকা দিয়েছেন বলে আমার সমস্ত সময়ই কিনে নিয়েছেন? আমি আর যাচ্ছি না, এই নিন আপনাদের অ্যাডভান্সের টাকা। আচ্ছা আসুন, নমস্কার।"

তৃতীয় তালিমটি যখন লাভ করেছিলাম তখন তার মর্ম বুঝতে পারিনি। নিছকই তামাসা মনে হয়েছিল। বহুকাল বাদে, অন্তত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পরে চাকরি করতে করতে উপলব্ধি হল, ওটা ম্যানেজমেন্টের একটা বড়ো রকমের কৌশল, লোকজনকে সামলাবার জন্য।

গুরুদেবের কাছে পরামর্শপ্রার্থী হয়ে এসেছেন অনন্ত নাগ, আমাদের প্রিয় 'অন্তাদা', আগেই বলেছিলাম তিনি গুরুদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত, ছায়া বললেই চলে, পরিবারের একজন। গুরুদেব তাঁকে যেমন ভালোবাসতেন তেমনি সর্বক্ষণ নানা উৎপীড়ন করে মজা দেখতেন।

অন্তাদা জিপিও-তে কাজ করেন, তাঁর উপস্থিত ফ্যাসাদ হচ্ছে, তাঁর 'বস্' তাঁর নামে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করবেন বলে শাসিয়েছেন। এখন কী করা?

কথোপকথনের উত্তেজনায় দুজনেই অল্পক্ষণের মধ্যে সাধুভাষা ছেড়ে মাতৃভাষা অর্থাৎ বিশুদ্ধ রাজশাহির ভাষায় নেমে পড়েছেন, সে-ভাষার সৌরভ এ অধমের লেখায় ধরা পড়বে কি না সন্দেহ।

"কী হ(ই)য়েচ্ কী? হঠাৎ কেন তোক্ রিপোর্ট ক (ই)রবে?"

"মন দিয়্যা শুনুন দাদা। সেই সকাল থেক্যা গাদা গাদা চিঠিত্ পোস্টাপিসের সিল মা(ই)রছি তো মা(ই)রছি।"

"তোর কাজই সিল মারা, পোস্টাপিসে চাকরি, ওখানে সিল মা(ই)রবি, না তো কি খ্যামটা নাচ দেখাবি?"

"সিল মা(ই)রতে মা(ই)রতে হাত ব্যথা ক(ই)রে উঠল দাদা।"

"তা তো ক(ই)রবেই। অত শ'য়ে শ'য়ে চিঠিত্ সিল মারা কি চাট্টিখানি কথা?"

"তা আমি এট্টু সিট ছাড়্যে বাইরে গেইছি। বলুন দাদা অন্যায়টা কী ক(ই)রছি?"

"বেশ ক(ই)রেছিস্। হাত ব্যথা ক(ই)রলে বিশ্রাম দরকার না? আমিও তাই ক(ই) রতাম। উঠে এট্টু বগলের আইড় ভাঙবি, বিড়ি-সিগারেট ফুঁকবি, চা খাবি, তবে কি না আবার কাজ।"

"আমি তো ঠিক তাই ক(ই)রেছিলাম। আমাক্ সিটে না দে(ই)খে উনি সকলের সুমুখে আমাক্ খুব ঝা(ই)ড়লেন দাদা!"

"কেন ঝা(ই)ড়বেন না? তুমি ব্যাটা চাকরি ক(ই)রতে গেছ, তোমার কাজ চিঠিত্ সিল মারা, আর তুমি সীটে থা(ই)ক্‌বে না। এদিক-উদিক যাবে? বেশ ক(ই)রেছেন ঝা(ই)ড়ছেন।"

"দাদা, আপনি এ আবার কোন দিক্ ঘু(ই)রে গেলেন?"

"যে-দিকপানে যখন ঘোরার দরকার ঘু(ই)রছি। বল, তারপরে হ(ই)লোটা কী?"

"অতগুলান লোকের সামনে গালাগালি, আমার দাদা রাগ হয়্যা গেল খুব।"

"এই তো মরদের মতো কথা। সকলের সামনে তোক্ যা তা ব(ই)ল্‌বে আর তুই কেঁচোর মতন গুটিয়ে থা(ই)ক্‌বি! দিয়েছিলি তো পালটা ঝাড়?"

"আমিও ঝাইড়্যে দু-কথা বু(ই)ল্যে দিলাম।"

"ঠিক ক(ই)রলি। তারপর?"

"তারপর উনি আমাক্ বু(ই)ল্লেন, আমার নামে পি-এম-জিক্ রিপোর্ট ক(ই)রবেন।"

"রিপোট্ ক(ই)রবে না তো কি গালে চুমু খায়্যা আদর ক(ই)রবে? হতভাগা, তুমি কাজের সময় সিটে থাইক্‌ব্যা না, তার ওপর মুখে মুখে চোপা ক(ই)রব্যা, আমি হ(ই)ল্যেও রিপোট করতাম।"

"দাদা, এই কি আপনার বিচার হ(ই)ল?"

"কেন? আগ্যেত্ত্যা বিচার ক(ই)রতে ক(ই)রতে আ(ই)স্‌ছি, একটাও অনেয্য কথা বু(ই)লেছি তোক্?"

"বুইল্লাম দাদা। আচ্ছা আমি আসি।"

অন্তাদা প্রণাম করে ক্ষুব্ধচিত্তে বিদায় নিলেন। গুরুদেব তখন আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন, "এই বিদ্যেটা আমি আমার ঠাকুরদামশাইয়ের কাছে শিখেছিলাম, ওঁর কাছারিতে অসংখ্য প্রজা নানা অভিযোগ নিয়ে হাজির হত, তাদের কারো-কারো ওপর তিনি এটি প্রয়োগ করতেন।

শিবপুরের শেষের বছরটি নিতান্তই ক্লেশকর হয়ে উঠেছিল। ওখানে মেকানিক্যালের ক্লাসে বরাবরের আদত ছিল, ফোর্থ ইয়ারের শুরুতেই একটি বিশাল যন্ত্র বা ইঞ্জিনের ডিজাইন এবং ড্রয়িং ছাত্রদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। ডিজাইন মানে তার প্রতিটি অংশের চেহারা এবং মাপজোক ঠিকভাবে হিসাব করে ঘাতসহ করে তৈরি করা, যার জন্য মেকানিক্যালের প্রতিটি সাবজেক্টের ব্যবহারিক প্রয়োগ জরুরি, এবং তারপর সেই অংশগুলির আলাদা আলাদা ড্রয়িং, যা ওয়ার্কশপে ফেলে দিলে সেখানকার লোকেরা সেটাকে নির্ভুলভাবে তৈরি করতে পারে।

চতুর্থ বর্ষের প্রথম দিনেই এই মহাযজ্ঞের শুরু হবার কথা। আমাদের ডিপার্টমেন্টের বড়োকর্তা ঠিক সেই সময়ে ইংল্যান্ডে চম্পট দিলেন। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করলেন। রানি এলিজাবেথের coronation দেখলেন। ফিরে আসতে তিনমাস কেটে গেল। তাঁর অনুপস্থিতিতে মেইন সেশন্যাল প্রজেক্ট কারোর দেবার এক্তিয়ার নেই, আমরা অধ্যাপক অতুলচন্দ্র রায়ের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়তে তিনি বললেন, "পাগল হইছ নি? আমি দিমু ফাইনাল প্রজেক্ট? ও সাহেবই দিব নে ফিরা্যা আইস্যা। আমি কিছু করলে খুব চেইত্যা উঠবেন, তাতে তোমাদেরও ভালো অইবোনা, আমারও নয়।। চিন্তা কইরো না, হয়তো ছোটোখাটো প্রজেক্ট দিব অনে।"

দুরুদুরু বক্ষে সাহেবের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় রইলাম। সাহেব দর্শন দিলেন।

প্রাণহরা একটি বাংলা পাঁচের মতো হাসি হেসে বললেন, "বাবারা সব... মঙ্গল? ফাইনাল প্রজেক্টের জন্য... মালকোঁচা মেরে তৈরি?"

ফাঁসির আসামিকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়,সে মরবার জন্য তৈরি কি না, তা হলে তার গলার যেমন আওয়াজ হয়, সেইরকম আওয়াজে আমরা বিড়বিড় করলাম। সাহেব চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ঈশাণ কোণে কড়িকাঠের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, জামার আস্তিন গুটিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত প্রজেক্টটির বিবরণ লিখলেন, অতিশয় সুবৃহৎ একটি ফোরস্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিন, যা তখনকার দিনে বড়ো বড়ো সমুদ্রগামী জাহাজে ব্যবহার হত, তার সবকিছু অংশ, স্টার্ট করার যন্ত্র, তেলের ট্যাঙ্ক এবং পাইপ ডিজাইন এবং ড্রয়িং।

রাত্তিরে গ্রামাঞ্চলে শেয়ালের দল যখন সমস্বরে হুক্কাহুয়া করে ওঠে, সেটা কেন করে জানি না, ভয়ে বা মার খেয়ে নিশ্চয়ই নয়, কোনো কিছুর আশায় বা পুলকে তাদের এই সমবেত ঐকতান। ব্ল্যাকবোর্ডে সাহেবের ডিজাইন লেখা শেষ হলে ক্লাসের সমবেত কণ্ঠে সেই রকম একটা হুক্কাহুয়া উত্থিত হল। তবে সেটা পুলকের নয়, আর্তনাদের। সাহেব নির্বিকারভাবে সোনামুখ করে হাসছেন ।

"স্যার, এটা তো একটা বিরাট প্রজেক্ট!"

"হ্যাঁ, তা তো বটে।"

"এটা করতে তো পুরো এক বছর লাগবে !

"Yes...perhaps...লাগতে পারে।"

"তাহলে আমরা কী করব, স্যার?"

"প্রজেক্টটা কমপ্লিট করবে।"

"তা কী করে সম্ভব হয়?"

"যেমন করে সম্ভব হওয়াতে হয়।"

"স্যার, দিনে তো মোটে চব্বিশটা ঘণ্টা!"

"সে তো আমরা সকলেই জানি।"

"আপনি স্যার, বছরের গোড়াতেই এ প্রজেক্টটা দিলে পারতেন?"

"হয়তো পারতাম।"

"আপনি তা না করে তিন মাস দেশে কাটালেন।"

"কাটালাম। খুব enjoy করেছি। সে-সব গল্প তোমাদের বলব।"

"স্যার, এ-অবস্থায় project-টাকে একটু ছোটো করে দিলে ভালো হয় না কি?"

"তা হয়।"

"তবে স্যার, এটাকে এক-চতুর্থাংশ বাদ দিয়ে দিন না!"

"ইঞ্জিনের এক-চতুর্থাংশ বাদ দিলে তিন-চতুর্থাংশে কি চলবে?"

সাহেবের এবংবিধ উত্তরে ব্লাডপ্রেসার চড়তে চড়তে একেবারে ব্রহ্মতালুর শীর্ষদেশে গিয়ে পৌঁছোল। একটি ছেলে আর থাকতে না-পেরে চেঁচিয়ে উঠল— "If we try to

complete this project, we will surely die, Sir—"

"Yes... perhaps... perhaps... you may die..." বলে সাহেব কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন। আমরাও ফাঁসির আসামির মতো টলতে টলতে নিষ্ক্রান্ত হলাম। বড়দা বলল, দিলে Sালা অন্যান্য সাবজেক্টের পড়াশুনোর ভুষ্টিনাশ করে। ওর বোধহয় ছেলেপুলে নেই, থাকলে আমাদের ওপর এতটা অবিবেচক হত না।

অতএব আমরা লেগে পড়লাম। রাত্তির বারোটা-একটা অবধি জেগে থাকা কারোরই পক্ষে কষ্টকর ছিল না। কিন্তু এখন জাগতে হবে রোজ রাত্তির দুটো-তিনটে পর্যন্ত। ওয়ার্ডবয় ভীমা এবং রামদেওর উপর হুকুম হল ঘণ্টায় ঘণ্টায় কড়া কফি সাপ্লাই করবার। কিন্তু তাতেও বিশেষ জুত হল না। একটা পেরিয়ে ঘড়ির কাঁটা দুটো অভিমুখী হলেই চোখের সামনে ড্রয়িংগুলি কেমন আবছা ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। সেখানে ভেসে উঠতে লাগল মধুবালা-নার্গিস-গীতাবালী-নিম্মি-সুরাইয়ার হাসিমুখগুলি।

মহা উৎপাত! শেষকালে একজন ডাক্তারের ছেলে জেনে এল Dexedrine নামে একটা ট্যাবলেট খেলে নাকি ঘুম পায় না, ইন্দ্রিয়ও সজাগ সতেজ থাকে। সেই ট্যাবলেট আমদানি হল। ঘুম পেল না ঠিকই, কিন্তু চিন্তা করবার ক্ষমতা ফিকে হয়ে একেবারে জিরো হয়ে গেল। সবাই খাতাপত্রের দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে আছে, একলাইনও লিখতে পারছে না। এ এক উদ্‌ভুট্টি পরিস্থিতি।

শেষমেষ বড়দা বলল, 'এ-Sব বিলিতি ওষুধে কাজ হবে না। দাঁড়া, আমি অন্য জিনিসের ব্যবস্থা করছি, যা খেয়ে গাইয়ে-বাজিয়ে-তবলিয়ারা একনাগাড়ে আঠারো ঘণ্টা বিনা ক্লান্তিতে রেয়াজ করে। Sিদ্ধির শরবত!

অনতিকাল পরে দেখা গেল বালতিতে ভীমা এবং রামদেও একটি সবজেটে রঙের তরল পদার্থ ঘুঁটছে, তাতে চিনি, বাদাম, পেস্তা, ক্ষীর ইত্যাদি দ্রব্য পুণ্যস্নান করতে নামছে। পাশে বসে বড়দা সুপারভাইজ করছেন এবং কতকগুলি তামার পয়সা শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে চকচকে করছেন। খানিক্ষণ বাদে ভীমা রামদেওকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুয়া?" ওরা বলল, "তামাকে পইসা তো আব ইসমে ডাল দিজিয়ে, উসকে বাদ ফির আধা ঘণ্টা পৌন ঘণ্টা ঘুটনে পড়েগা, তব না-ঘোঁটাই ঠিক হোগা!"

অবশেষে ঘোঁটাই ঠিক হল। বড়দা দরাজ গলায় হুকুম করলেন, "তোরা এক এক গ্লাS লিয়ে লে। দরকার হলে দু-গ্লাS। দেখবি কাজ Sুরু করলে থামতে পারবিনি!"

একগ্লাস চোঁ করে মেরে দিলাম। ভালোই লাগল, সুতরাং তারপরেই আরেক গ্লাস। তারপরে ঘরে গিয়ে ড্রয়িং নিয়ে বসলাম। ড্রয়িংটার শিরোনাম ছিল SECTIONAL ELEVATION OF MAIN BEARING। কাজ আরম্ভ করলে যে আর থামতে পারব না, তার প্রমাণ মিলল অল্পক্ষণের মধ্যেই । ড্রয়িংশিটের কপাল জুড়ে লেখা হতে লাগল—SECTIONAL ELEVATION OF MAIN BEARING SECTIONAL ELEVATION OF MAIN BEARING SECTIONAL ELEVATION OF MAIN BEARING...। প্রায় অর্ধেক শিটটা ভর্তি হয়ে যাবার পরে মনে হল, 'আরে!

বাকি জায়গাতে ড্রয়িংটা আঁটবে কী করে? যাকগে, ও পিঠেই আঁকা যাবে।' আরো বারদুয়েক হেডিংটা লেখার পর হঠাৎ মনে হল SECTIONAL বানানটা বেমালুম ভুল, হবে SEXIONAL। সুতরাং বারকতক SEXIONAL ELEVATION..., তারপর জায়গা আরো কমে এলে SEXIONAL SEXIONAL লিখতে লিখতে শেষে একবার SEX লিখেই পুরো শিটটা ভর্তি হয়ে গেল, আর জায়গা নেই।

বিস্ফারিত চোখে নিজের কীর্তির দিকে তাকিয়ে রইলাম। সকলে আমাকে নিপাট ভালোমানুষ, নিরীহ ছেলে বলে জানে, আমার অবচেতন মনে এসব কী রুদ্ধ হয়ে ছিল, সিদ্ধি ঢুকে গিঁট খুলে সব বার করে এনেছে।

ভীষণ ভয় পেয়ে খাটের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়লাম। মিনিট-খানেক বাদে খাটটা আমায় নিয়ে মেঝে ছেড়ে ফুট খানেক উঠে পড়ল, তারপর হঠাৎ ঘরের জানালা দিয়ে সাঁ-করে বেরিয়ে আমাকে নিয়ে বি. ই. কলেজের ক্যাম্পাস পরিক্রমায় বেরোল। খাট কী করে জানলা দিয়ে গেল—সে প্রশ্ন করবেন না।

প্রথমেই একটা ময়দান, তারপরে কলেজের Administrative Building, তারপরে Mechanical Department-এর গ্যালারি। মহেন্দ্র বেয়ারা উবু হয়ে বসে ড্রয়িংগুলো গুছিয়ে রাখছে। আমার ওপর ওর কিছুটা দুর্বলতা ছিল। বলল, "থার্ড ইয়ার সেশন্যালের মার্ক-এর লিস্ট সাহেবে লেইখ্যা রাখছে, উনার টেবিলের উপ্‌রে, দেইখ্যা লন।"

সাহেবের টেবিলের কাছে গিয়ে result sheet-এ আমার নাম খুঁজে বার করছি এমন সময় আমার প্যান্টের পেছন দিকে কে যেন কামড়ে ধরল, আর ছাড়াতে পারি না, সঙ্গে অবিশ্রান্ত গর্‌র্‌র্ শব্দ। বুঝলাম সাহেবের প্রভুভক্ত অ্যালশেসিয়ান। মহেন্দ্র তাকে একটা T-square দিয়ে কয়েক ঘা ঝাড়তেই সে আমাদের ছেড়ে পালাল।

সেশন্যালের থার্ড ইয়ারের মার্ক আর দেখা হল না। আবার খাটে চড়ে বসলাম, খাট আমায় নিয়ে লেদ মেসিনের ওয়ার্কশপ, কামারশাল, কার্পেন্ট্রি শপ এইসব ঘুরিয়ে নিয়ে উপস্থিত করল অটোমোবাইল শপ-এ। সেখানে প্রফেসর এ.এস. সেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে একটা এঁড়ে-ধরা অস্টিনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন:

"গাড়িখানা আমারে examine করতে কইচস্ কীসের লাইগ্যা?"

"আগে এক গ্যালন প্যাট্রুলে পাচ মাইল যাইত, অহন হালা পাচ গ্যালন প্যাট্রুলে এক মাইল যায়। নির্ঘাৎ ড্রাইভার হালায় কুনো পার্ট খুইল্যা বেইচ্যা দিসে। তারে দিসিলাম দ্যাখনের লাইগা যে কুনো পার্ট missing আসে কি না।"

"আমি দেইখ্যা লইসি। কুনো পার্ট missing নাই। খালি এই জিনিস দুইখান surplus পাওয়া গ্যাসে গিয়া, তর ড্রাইভারের সিটের তলায়।"

বলে সেন সাহেব একটা পেট্রল চুষে বার করবার রবারের নল আর একটা টিন বন্ধুকে ধরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "এই দুইখান জিনিস সমেত ড্রাইভারটারে পোঙায় লাথ্থি মাইর‍্যা বিদায় কর। গাড়ি আবার এক গ্যালন প্যাট্রুলে পাচ মাইল যাইতে লইব।"

আমি আবার খাটে চড়ে চললাম। কলেজের ক্লক টাওয়ার, খেলার মাঠ 'ওভ্যাল',

প্রফেসরদের বাড়ি পরিক্রমা করে কলেজের বাউন্ডারি ওয়াল ডিঙিয়ে একেবারে গঙ্গার তীরে। সেখানে বিশাল বিশাল বর্মাটিকের গুঁড়ি পড়ে আছে, জলে ভাসিয়ে আনা হয়েছে। জায়গাটা খুবই নির্জন, পরে আমার খুব কাজে লেগেছিল।

তারপরে বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি পরিক্রমা শেষ করে খাট আমাকে নিয়ে আবার অবলীলাক্রমে ম্যাকডোনাল্ড হোস্টেলের উনপঞ্চাশ নম্বর ঘরে ঢুকে দড়াম করে মেঝের ওপর স্থিত হল। আমি আমার ড্রয়িংশিটের দিকে একবার 'বিস্মিত আতঙ্কে' তাকিয়ে সেটাকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম।

খানিক বাদে ঘর ছেড়ে বেরোলাম অন্যান্য সকলের কী দশা হয়েছে দেখতে। বড়দা খালি কপাল চাপড়াচ্ছে আর বলছে, ''সত্যদা, আপনি আমাকে মাইরি মাপ করুন, সত্যদা, আপনি আমাকে মাইরি মাপ করুন...।'' কিছুকাল আগে সত্যদার একটা ড্রয়িং কপি করে সাহেবের কাছে ধরা পড়ে পেনাল্টি খেয়েছিল।

হিরু বাথরুমে 'জলত্যাগ' করতে গেছিল, সারারাত্তির সেইখানেই সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তার জলত্যাগ নাকি শেষ হয়নি।

অমর ড্রয়িংবোর্ডে শিট্ লাগাচ্ছে পিন দিয়ে গেঁথে, আর তৎক্ষণাৎ 'উহুঁ' বলে সেটা খুলে ফেলে আবার লাগাচ্ছে।

পূর্ণ গিয়ে হোস্টেলের সুপারিন্টভেন্টের পা-দুটি জাপটে ধরে ভেউভেউ করে কাঁদছে আর বলছে, ''স্যার, আপনার আশীর্বাদেই আজ আমার এই অবস্থা। এই আশীর্বাদ যেন বরাবর থাকে স্যার, আমাকে পায়ে রাখবেন।'' সুপারিন্টেন্ডেন্ট হাঁউমাউ করে কিছুতেই পা ছাড়াতে পারছেন না।

বিকেল তিনটে-চারটে নাগাদ সিদ্ধপুরুষরা সব ধাতস্থ হলেন। ভাগ্যিস দিনটা রবিবার, ক্লাসে যেতে হলে কী ধরনের খিটকেল হত মা গঙ্গাই জানেন।

আর একটা ভয় ভূতের মতন ঘাড়ে চেপে বসল। সেটা হচ্ছে, পরীক্ষার রেজাল্ট কীরকম হবে। সেকালে একটা ধারণা ছিল, ফার্স্টক্লাস না-পেলে জীবন বৃথা। কোনো ভালো জায়গায় চাকরি জুটবে না। কথাটা যে কতখানি ভুয়ো সেটা উত্তরজীবনে ভালোভাবেই টের পেয়েছি। আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনেক সেকেন্ডক্লাস-পাওয়া ছেলে পরে বিশাল বিশাল পোস্টে, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির চেয়ারম্যান হয়ে রিটায়ার করেছে। কিন্তু তখন এই আতঙ্ক এমনভাবেই আমাকে গ্রাস করল যে, হঠাৎ আমার মনে হল ফাইনাল পরীক্ষা না দিলে কী হয়? যেমনি এ কথা মনে হওয়া, আমি বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। বাবা-মা পর পর দু-তিন সপ্তাহ খবর না-পেয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। টেলিফোনে জানলেন, আমি কলেজেই আছি, পালিয়ে যাইনি। কিন্তু আমি টেলিফোন ধরছি না, নানারকম বায়নাক্কার আশ্রয় নিয়ে। শেষকালে বাবা গিয়ে কলেজে উপস্থিত। আমি হোস্টেলে নেই। গঙ্গার ধারে সেই বিশাল বিশাল সেগুন কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে ভবিষ্যৎ চিন্তা করছি। ওয়ার্ডবয় ভীমাকে বলেছিলাম কাউকে বলবি না আমি কোথায় আছি। সে হতভাগা বাবাকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলে দিয়েছে, ''উ দরিয়া কিনার মে

লকড়িকে উপর বইঠা হ্যায়।" বাবা সেখানে গিয়ে উপস্থিত। ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। উনি যে ওখানে গিয়ে আমাকে পাকড়াও করবেন সে-কথা অপরিণত মস্তিষ্কে আমার একবারো উদয় হয়নি।

"কী ব্যাপার বাড়ি যাচ্ছ না কেন?"

আমি তখন বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, "প্রাণপণ পরিশ্রম করে রাত জেগেও পরীক্ষাতে ফার্স্টক্লাস পাবার কোনো আশাই দেখছি না। তুলনায় অনেক কম পরিশ্রম করে সরোদটা ভালোই বাজছে। আমি কি বাজনাকে জীবিকা করতে পারি না?"

বাবা আমার ত্রিকালদর্শী পুরুষ ছিলেন। বললেন, "তুমি সরোদটা ভালোই বাজাচ্ছো, কিন্তু আরেকটি আলি আকবর হওনি, হতে পারবে কিনা ঘোরতর সন্দেহ। কারণ আলি আকবর, রবিশংকররা শুধু রেয়াজ আর তালিমে তৈরি হয় না, তারা জন্মায়। তুমি ভালোই বাজাবে, কিন্তু সেই বাজনা বিক্রি করে তোমার আহার জুটবে না। তুমি তো আমারই ছেলে, আমি তোমার ধাত চিনি, তোমার মধ্যে সেলসম্যানশিপ একেবারেই নেই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বাজনার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এটারও বিলক্ষণ প্রয়োজন হবে, সেখানে তুমি প্রচণ্ড মার খাবে। তার থেকে পরীক্ষাটা দিয়ে দাও। সেকেন্ড ক্লাস পেলেও আমি রাগ করব না, দু-বেলা দু-থালা ভাতের বন্দোবস্তটা তো হবে। তারপরেও তুমি বাজাবে, তোমার বাজনা বন্ধ হবে না, আমি সেই আশীর্বাদ করছি।"

তারপর, মাইকেলের ভাষায় 'পালিলাম মাতৃ-আজ্ঞা'র বদলে পালিলাম পিতৃ-আজ্ঞা। এখনো বাজিয়ে চলেছি বাবার আশীর্বাদে।

ফোর্থ ইয়ারে গানবাজনা খুব বেশি করতে পারিনি, শুধু একবার গুরুজি এবং জ্ঞানবাবুর সঙ্গে বোম্বে গেছিলাম, সে-কাহিনি আগেই বলেছি। আর একবার দু-দিনের জন্য বহরমপুরে এক মিউজিক কনফারেন্সে গেছিলাম, সে-কাহিনি মনে রাখবার মতো।

ট্রেন প্রায় ছাড়ব ছাড়ব করছে, এই সময়ে জ্ঞানবাবু হঠাৎ খুব রেগে গেলেন কী কারণে। একবার বলছেন 'যাব না', একবার বলছেন 'রাধুবাবু আপনি বলুন যাওয়া কি উচিত?' তারপরে বললেন, "এই আমি নেমে যাচ্ছি।" তারপরে— "নামবো?", "না যাবো?"

রাধুবাবুর ছোটোভাই হাবুকাকা (রবীন্দ্রমোহন মৈত্র) হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে ধমকে উঠলেন, "নামবেন তো নেবে যান জ্ঞানদা, এরকম দোনামোনা করে একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটাবেন না।"

জ্ঞানবাবু চুপ করে সিটে বসে রইলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল। রাজশাহির বহু লোক দেশবিভাগের পর বহরমপুর মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে চলে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। এই সংগীত-সম্মেলনটা তাঁদের উদ্যোগেই হয়েছিল, বিশেষ করে বহরমপুরের বিখ্যাত সেতারি পুলিন পাল ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। দু-একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা বলি।

পুলিনদা হঠাৎ হাঁক ছাড়লেন, "জয়া, তোমার সেতারটা নিয়ে স্টেজে চলে এসো এক্ষুণি।" একটি অল্পবয়সি মেয়ে সেতার নিয়ে স্টেজে বসল, তার বাজনা শুনে আমরা

সবাই অবাক হয়ে গেলাম। বহরমপুরে এমন একটি রত্ন আছে জানতাম না। পুলিনদার ছাত্রী, পরে রবিশংকরের কাছে তালিম নেন। ইনিই জয়া বসু, বর্তমানে জয়া বিশ্বাস।

এর থেকেও বড়ো বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। পরদিন সকালের অধিবেশনে আরেকজন অল্পবয়সি মেয়ে সেতারে তোড়ি বাজালেন। যেমন অসম্ভব সুর, তেমনি হাতের 'তাসির', বিলায়েত খাঁ সাহেবের স্টাইল। বাজনার মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা নেই।

গোলাম আলি খাঁ সাহেব সামনের সারিতে বসে শুনছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আহা-আহা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

এই মেয়েটি হচ্ছেন কল্যাণী রায়। কল্যাণীদি বেশ কিছুদিন নিজের অস্তিত্ব উজ্জ্বলভাবে বজায় রেখেছিলেন, এখন তাঁকে মঞ্চে বেশি দেখি না। কেন জানি না।

শুধু এই নয়। বহরমপুর থেকে ফেরবার দু-একদিন পরে গোলাম আলি খাঁ সাহেব হঠাৎ একদিন ২৫নং ডিক্সন লেনে জ্ঞানবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির।

"আরে খাঁ সাহেব যে! আদাবরস্। কী খবর?"

খাঁ সাহেব বললেন, "জ্ঞানবাবু, ম্যাঁয় ভুল নেহি সকতা, উও লেড়কি যো বহরমপুর মেঁ তোড়ি বজাই থি, কিতনা খুবসুরত বজাই, ক্যা সুর, ক্যা বহ্‌তরিন তানাইয়াৎ! ম্যাঁয় বারবার ইয়াদ্ করতা হুঁ, ইয়ে আল্লাহ্‌তালা কা দেন হ্যায়!"

এই কথাটা বলবার জন্য জ্ঞানবাবুর কাছে গোলাম আলি খাঁ সাহেব ছুটে এসেছেন! পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, সংগীত-নাটক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড এ-সবকিছুর থেকে এই প্রাপ্তিটা কি কোনো অংশে কম?

বহরমপুরে সেই কনফারেন্সের শেষ অনুষ্ঠানে শেষ কথাটি কিন্তু বললেন গোলাম আলি খাঁ সাহেব। রাগ বাগেশ্রী। আমরা বাগেশ্রী বাগেশ্রী বলে থাকি, আসল নামটা কিন্তু বাগীশ্বরী (বাক্ + ঈশ্বরী), সরস্বতী। রাগটিকে সেদিন উনি যে স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, পরে অনেকবারই তাঁর কাছ থেকে এই রাগটা শুনেছি, সে উচ্চতায় পৌঁছোয়নি। বিলম্বিত শেষ করে যে দ্রুত মুখড়াটি তিনি ধরলেন তার কথা ছিল—'অব বে-গুণ পর করম করো দাতা!' বেগুণ মানে তরকারির বেগুন নয়, নির্গুণ। স্বরসম্রাট গোলাম আলি দেবাদিদেবের কাছে প্রার্থনা করছেন 'এই গুণহীন হতভাগ্যকে, হে দয়াময়, তুমি এবার দয়া করো।' কথাকে সার্থক করে তোলবার উপযোগী এরকম স্বরপ্রয়োগ আমি জীবনে আর শুনিনি, শুনবও না। দু-হাত ওপরে তুলে, ভিক্ষা চাইবার ভঙ্গিতে, ভগবানের কৃপা প্রার্থনার জন্য সে কী আকুতি! এক-একবার বিস্তার অথবা তান শেষ করে মুখড়া ধরছেন 'অব বে-গুণ পর...', আর সারা হলের সমস্ত শ্রোতার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে 'ও হ্ হ্ হ্...' করে। রাধুবাবু, জ্ঞানবাবু, কেরামৎউল্লা খাঁ সাহেব অঝোরে কাঁদছেন।

পরদিন কলেজে ক্লাস, সেই রাত্রেই ট্রেন ধরার কথা ছিল, ভুলেই গেলাম। প্রস্তরীভূত হয়ে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না।

ফাইনাল পরীক্ষা যত এগিয়ে আসতে লাগল, ততই আর-একটি দুশ্চিন্তা ঘাড়ে চেপে বসতে লাগল। এই যে কলেজ, ক্লাস, হোস্টেল, ল্যাবরেটরি, খেলার মাঠ, মাস্টারমশাইরা, বইপত্র, যন্ত্রপাতি এসব ছেড়ে এবার রাস্তায় বেরোতে হবে ভাগ্যান্বেষণে। কপালে কী আছে কে জানে? এই চারবছর কেবলই মনে হত কবে কলেজ ছেড়ে বেরোব, এখন মনে হতে লাগল বেরিয়ে যাব কোথায়? সেখানে আমার জন্য কী অপেক্ষা করে আছে?

পরীক্ষা তো হল, কিন্তু একটা বিষয়ে প্রবল কৌতূহল আমার ঘাড়ে চেপে বসল। এই যে চারবছর ধরে ঘষটানি, রাত্তির জাগা, নানারকম বিষয়ে জ্ঞান আহরণ, এর সর্বশেষ ফলটা কী হল? আমার তৈরি যন্ত্রপাতি ।ক বাস্তবিকই লোকের কাজে লাগবে, না কাগজপত্রেই তার চিরকালের ঠাঁই? সাহেবের কাছে গেলাম জিজ্ঞাসা করতে। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "Yes Buddha, what can I do for you now?"

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "স্যার, আপনার কাছে তো অনেক কিছুই শিখলাম, সেগুলি কি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দুনিয়ায় কাজে লাগবে? এই যে মেইন সেশন্যাল প্রজেক্টে Four Stroke Diesel Engine-টার ডিজাইন করলাম, এটা তৈরি করলে ঠিকঠাক চলবে তো?"

সাহেব হঠাৎ ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। হাত-পা ছুঁড়ে বিড়বিড় করে বললেন, "What do you mean? What I have taught you over all these years...is it all bullshit? Of course your engine will run. . . but wait..." বলেই হঠাৎ আবার কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন। আমি ভাবলাম, এই রে, সেরেছে। আবার কী বাঁশ নামবে কে জানে!

সাহেব আবার বললেন, "Yes your engine will run... but after sometime... it will run into the Ganges... you forgot to provide the locking nuts on your foundation bolts!!"

ধাঁ-করে আমার মনে পড়ে গেল ব্যাপারটা কী হয়েছে। যে-কোনো ইঞ্জিন, সে যদি মাটিতে বসে কাজ করে তবে তাকে মাটিতে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবার জন্য foundation bolt লাগাতে হয় এবং সেই বল্টুগুলোকে আবার ইঞ্জিনের ঝাঁকুনিতে ঢিলে হয়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্য তার ওপর locking nut লাগাতে হয়। তাড়াতাড়িতে আমি এই locking nut লাগাতে ভুলে গেছি, সুতরাং ইঞ্জিনের ভাইব্রেশনে বল্টুগুলোর ঢিলে হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। তার জন্য সাহেব মার্কসও কেটেছেন কয়েকটা।

আমি চুপ করে রইলাম। সাহেব সম্বন্ধে শোনা যায়, ওঁর বিলেতের কলেজে viva-voce পরীক্ষাতে একটা ইঞ্জিন চালিয়ে ওঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইঞ্জিনটার কোনো গণ্ডগোল আছে কি না। উনি মিনিটখানেক তার আওয়াজ শুনে বলেছিলেন, আর আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার বাদে ওটার তিন নম্বর ক্রঙ্কশ্যাফট্-বিয়ারিং fail করবে।"• হয়েছিলও ঠিক তাই। খানিকক্ষণ বাদে ঘটাং ঘটাং আওয়াজ করে ইঞ্জিনটা থেমে

গিয়েছিল। দেখা গেল তার তিন নম্বর বেয়ারিংটা জ্বলে খাক হয়ে গেছে। এহেন যন্ত্রবিদ্যার ঘুণের কথার আমি কী প্রতিবাদ করব?

ফাইন্যাল পরীক্ষা পাস করবার পর অন্তত এক বছর কোনো-না-কোনো কোম্পানিতে শিক্ষানবিশি করতে হবে, তবে আমি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করবার যোগ্য বলে বিবেচিত হব।

নানারকম বিদেশি কোম্পানির নাম জানলাম, সেখানে দরখাস্ত করতে লাগলাম, গেস্টকিন উইলিয়ামস, কিলবার্ন, জেসপ, অ্যান্ড্রু ইয়ুল, ব্রেথওয়েট, লাডলো জুট মিলস, গার্ডেনরিচ ওয়ার্কশপস, ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং, বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি, জার্ডিন হেন্ডারসন ইত্যাদি। এই নামগুলির ঝংকার মনের মধ্যে বিশাল বিস্ময় এবং সম্ভ্রমের উদ্রেক করত। মনে হত যে-কোনো একটাতে ঢুকতে পারলেই রাজা হয়ে যাব।

সেকালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এই এক বছর শিক্ষানবিশির জন্য বৃত্তি দিতেন মাসিক একশো পঞ্চাশ টাকা করে, সবার ভাগ্যে সেটা জুটত না, পরীক্ষামার্ক এবং ক্লাস দেখে এর বাছাই হত। এখানে আমরা শিবপুরের ছেলেরা প্রচণ্ড মার খেয়ে গেলাম, একটি ছেলের ভাগ্যেও স্কলারশিপ জুটল না। কারণ নম্বরের দিক থেকে আমরা নিতান্তই দরিদ্র ছিলাম, ফার্স্টক্লাস মার্ক ছিল শতকরা সাতষট্টি ও তদূর্ধ্ব। সেখানে ভারতবর্ষের অন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ছেলেরা ৭৫, ৮০, ৮৫, এমনকী ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে বাজার ছেয়ে ফেলেছে, আমাদের দরখাস্ত ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষিপ্ত হল।

গেলাম আমাদের পাগলা সাহেবের কাছে। বললাম, "আপনার এই কম নম্বর দেবার জেদ আমাদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে, আমরা কী করব বলুন?"

সাহেব মাথা চুলকে বললেন, "Yes... I see... you are out on the streets."

"চমৎকার!" আমরা বললাম, "এবার আমাদের কী গতি হবে বলুন।"

সাহেব বললেন, "তাই তো... তোমাদের কী গতি হবে..."

আর কথা বলে লাভ নেই বুঝে আমরা চলে এলাম। শিক্ষকের কাছ থেকে এমন তিক্ততার সঙ্গে বিদায় নিতে হবে ভাবিনি।

দিন দশ-পনেরো বাদে আমার কাছে Board of Apprenticeship Training-এর থেকে একটা চিঠি এল। আমাকে বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। দৌড়ে গেলাম অন্যান্য বন্ধুদের কাছে। তাদেরও অনেকে চিঠি পেয়েছে, সবসুদ্ধ পনেরো জন!

এই ম্যাজিক কী করে সম্ভব হল?

কলেজে গিয়ে খোঁজখবর করলাম, সাহেবের পাত্তা নেই। কিন্তু শুনলাম তিনি নাকি দিল্লিতে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনে গিয়ে একটা জোর ঝাড় দিয়েছেন। তার মর্ম হল : আমার ছেলেদের আমি ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্ট্যান্ডার্ডে মানুষ করেছি, পড়িয়েছি এবং পরীক্ষায় নম্বর দিয়েছি, সুতরাং তারা অন্যান্য জায়গা থেকে আসা আশি-পঁচাশি -নব্বুই পারসেন্টের ধাক্কায় পথে বসেছে। আমি প্রস্তাব করছি, গভর্নমেন্টের বৃত্তিগুলি দেবার আগে একটা Common All India Test নেওয়া হোক একটা Central

প্রফেসর দুর্গাদাস ব্যানার্জি

প্রফেসর আর জি পি এস ফেয়ারবার্ন

Examination Board গঠন করে। দেখা যাক, তাতে আমার ষাট-বাষট্টি পারসেন্টরাই বা কী রেজাল্ট করে আর এই আশি-পঁচাশি-নব্বুই পারসেন্টরাই বা কোথায় দাঁড়ায়!

গভর্নমেন্টের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার বোধহয় সাহস হয়নি, তাঁরা বিনা বাক্যব্যয়ে শিবপুরের পনেরোটি স্কলারশিপ মঞ্জুর করেছেন। আমার বরাতে জুটেছে Tata Iron and Steel Co.-তে এক বছরের ট্রেনিং।

আরো দিন-কয়েক বাদে সাহেবের পাত্তা মিলল। গেলাম তাঁর পায়ের ধুলো নিতে। সাহেব ঠিক আগের মতোই নিরুত্তাপ নির্বিকার, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকোচ্ছেন। আমাদের দেখে বললেন, "Yes. perhaps you have got some scholarship!.. are you still grumbling?"

তারপরে বললেন, "হোস্টেল ছেড়ে যাবার আগে একবার একদিন সকলে আমার সঙ্গে দেখা করবে, কয়েকটা কথা বলব এবং সবাই মিলে একসঙ্গে একটু চা খাব।"

আরেকটা মানুষের কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে কলেজ ছাড়া অসম্ভব, তিনি হচ্ছেন এ. সি. রায়, প্রফেসর অতুলচন্দ্র রায়। তিনি আমাকে পরিষ্কার বলে দিলেন, "ইন্ডাস্ট্রিতে কাম করনের মেন্টালিটি তোমার নাই। আমগো লগে থাইক্যা যাও, আরো পরাশুনা কর, মাস্টার্স ডিগ্রি, পি.এইচ.ডি কইরা ফালাও, বিলাতের অনেক ইউনিভার্সিটির লগে আমগো যোগাযোগ আছে, তোমারে পাঠাইয়া দিমু অনে, ঘুইর্যা আইস্যা পাচনবাড়ি লইয়া এহানেই ছাত্র ঠ্যাঙাও, দিন ভালোভাবে কাটবো, বাZনোডারে ধইরা রাখতে পারবা। কলকারখানায় জুইত্যা গেলে সকালে ভৈরবীর বদলে কারখানার ভোঁ শুনবা, দিনভর ল্যাবার ঠেঙাইবা, রাইত্রে বারি আইস্যা বস্-এর খিচানি, সহকর্মীদের ল্যাং-মারামারি এই সবই মাথায় ক্যাবল ঘুরতে লইব, দরবারি কানাড়া কাছা খুইল্যা দৌড় দিব গিয়া। বাড়ি

যাও, বাবার লগে আলোচনা কর, কী স্থির করলা আমারে জানাইও।”

হিট ইঞ্জিনস-এর প্রফেসর দুর্গাদাস ব্যানার্জিও একই কথা বললেন, “থেকে যাও না হে আমাদের কাছে। পড়াশুনো আর-একটু করতে হবে ঠিকই, কিন্তু বাজাবার অঢেল সময় পাবে। তোমার উপযুক্ত লাইন ইন্ডাস্ট্রি নয়, মাস্টারি। আমরা চাই তুমি আমাদের কাছেই থেকে যাও। বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখ না একবার।”

স্নেহশীল অধ্যাপকদের এই আহ্বানে কর্ণপাত না-করে যে ভুল তখন করেছিলাম, তার মাশুল আমাকে সারাজীবন ধরে দিতে হয়েছে, এখনো দিয়ে যাচ্ছি। মাঝবয়সে একবার মাস্টারমশাইদের কাছে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম, হল না। তখন আমি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের নিউ কাশীপুর পাওয়ার স্টেশনে কাজ করছি। সপ্তাহে সাতদিনই কাজ, কোনো-কোনোদিন সকাল ছ-টা থেকে রাত্তির দশটা অবধি, রবিবার-শনিবার বলে কিছু নেই, অন্যান্য ছুটিছাটাও নেই, যেহেতু আমি ‘অফিসার’ নামক জীব সেইজন্য ক্যাজুয়াল লিভ চিন্তার বাইরে, সারা বছরে তিরিশ দিন ছুটি, তাও আমার সুবিধেমত নয়, কোম্পানি যখন আমাকে ছাড়তে পাববে তখন। একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। নিজের বাড়িতে থাকতে দেয় না, সেখান থেকে উপড়ে ফেলে পাওয়ার স্টেশন সংলগ্ন কোয়ার্টারে কয়েদি করে রেখেছে, যাতে তখন-তখন কান ধরে নিয়ে যেতে পারে, পাওয়ার স্টেশন এসেনশিয়াল এবং এমার্জেন্সি সার্ভিস কি না!

এই সময়ে আমার পিতৃদেব ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেন। আমার মাথায় তো আগুন ধরে গেল। সপ্তাহে মোটে একদিন দু-ঘণ্টার জন্য বাড়ি গিয়ে বাবার গায়ে হাত বুলিয়ে ‘কেমন আছেন’ জিজ্ঞাসা করেই চলে আসব, এই কথা চিন্তা করে নিজের ওপর এবং চাকরির ওপর তীব্র ঘেন্না ধরে গেল। কর্তাদের কাছে দরবার করলাম, আমাকে এমন একটা পোস্টে ট্রান্সফার করতে যাতে আমি বাড়ি থেকে কাজ করতে পারি। কিন্তু তার আশু সম্ভাবনা দেখলাম না। এদিকে বাবার অসুখ বেড়েই চলেছে।

ছুটলাম দুর্গা ব্যানার্জির কাছে। “স্যার, আমার এই দশা হয়েছে। দয়া করে আমাকে একটা লেকচারারের চাকরি দিন, যাতে আমি বাড়ি থেকে কাজ করতে পারি।”

উনি বললেন, “পাগল হয়েছ! তোমার মাইনে তো অর্ধেক হয়ে যাবে।”

“তাতে আমার আপত্তি নেই, স্যার। আমি কলকাতায় একটা, কাশীপুরে আরেকটা, এই দুটো এস্টাবলিশমেন্ট চালাচ্ছি। একটা তো কমে যাবে, খরচ অনেকটা কমবে। আমি যে করে হোক চালাতে পারব।”

প্রফেসর ইনচার্জ অব ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট এ. এস. সেন তখন রিটায়ার করেছেন। তাঁর জায়গায় লোক নেওয়া হবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ইন্টারভিউ। দরখাস্ত ছেড়ে দিলাম। এদিকে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কর্তাদের কাছে তদ্বির চলতে লাগল, কিন্তু বিশেষ ফল হবার লক্ষণ দেখা গেল না।

ওদিকে আমার দরখাস্তের উত্তর আসে না, ইন্টারভিউয়ের দিন আগতপ্রায়। আবার গেলাম প্রফেসর দুর্গা ব্যানার্জির কাছে। “স্যার, আমায় ওরা ডাকছে না কেন?” উনি খোঁজ

করতে গেলেন। ওরা বলল, "এ ছোকরার নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগোল আছে, হয় কাজেকর্মে অকর্মা, নয়তো একটা কিছু মারাত্মক দোষ করেছে যার জন্য সি. ই. এস. সি ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, না হলে অর্ধেক মাইনের চাকরির দরখাস্ত কোনো পাগলে করে?" প্রফেসর ব্যানার্জি বললেন, "মোটেই না। সি. ই. এস. সি ওকে তাড়ানো দূরে থাকুক, ছাড়তে চাইছে না। সি.ই.এস.সি. কাজের জন্যে ওকে বাড়িতে থাকতে দেবে না, তাই ও এই রাস্তা নিয়েছে। ও আমাদের 'prize-boy'-দের একজন, ওকে তোমরা স্বচ্ছন্দে ডাকতে পারো।"

অতএব ইন্টারভিউয়ের চিঠি এল। কিন্তু বরাত ভালো, ইতিমধ্যে আমার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী সিনিয়ার অফিসারের চেষ্টায় আমি সি.ই.এস.সি-তেই অন্য এক ডিপার্টমেন্টে বদলি হয়ে গেলাম, যাতে আমি বাড়িতে থাকতে পারি। দুর্গা ব্যানার্জি বললেন, "বেঁচে গেলে যা হোক।"

আজকাল নানা ছাত্রবিক্ষোভের কথা খবরের কাগজে দেখি আর ভাবি, এরকম মাস্টারমশাইরা সব গেলেন কোথায়!

কলেজ ছেড়ে বেরোবার দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, ততই কলেজের বাড়ি, দেওয়াল, বারান্দা, বেঞ্চি, ব্ল্যাকবোর্ড, ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি সবকিছুকে পরমাত্মীয় মনে হতে লাগল। যাবার আগের দিন আমাদের ফেয়ারবার্ন সাহেবের টি-পার্টি।

সাহেব থেমে থেমে, বারবার মাথা চুলকে যা বললেন, তার সারমর্ম হল : তোমরা ব্যবহারিক ইঞ্জিনিয়ারিং কিছুই শেখোনি, কতগুলি বই মুখস্থ করেছ মাত্র। আসল যন্ত্রপাতির সম্মুখীন যখন হবে তখন থেকেই শুরু হবে তোমাদের আসল শিক্ষা। বইতে যতই সাঁতার শেখার পদ্ধতি মুখস্থ কর, ডায়াগ্রাম দেখো, জলে না-নামা অবধি তার কিছুই কাজে লাগবে না। যেখানে চাকরি পাবে সেখানে কোনো কাজই সম্মানহানিকর মনে করবে না। যদি ঘর ঝাঁট দিতে বলে তাই করবে, কিন্তু try to do it better than anybody else। যে-সমস্ত ওয়ার্কারদের তোমাদের চালাতে হবে, তারা কিন্তু আজন্ম ওই যন্ত্রপাতি ঘেঁটেই মানুষ হয়েছে। সুতরাং তুমি ডিগ্রিধারী, এই অহংকারে দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে তাদের সামনে ঘোরাফেরা করবে না। কাজে হাত লাগাবে, যতটা পার তাদের সাহায্য করবে এবং কাজ শিখবার ব্যাপারে তাদেরকে গুরুর মতো সম্মান করবে। ওরা যদি টের পায় যে যন্ত্রপাতির ব্যবহারে তুমি একেবারেই কানা, তবে ওরা কোনোদিন তোমার কথা শুনবে না।

আর-একটা কথা। এখন তোমাদের সামনে মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নানা দিক, নানা রকমের চাকরি আছে। খুব ভালোভাবে নিজেকে বিচার করে, কোন কাজটায় তুমি comfortable হবে, সেটা ঠিক করে, আস্তে আস্তে সেইদিকে এগোবার চেষ্টা করবে। এমন জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়ো না, যেটা তুমি চাওনি। এমন জিনিস বা এমন ব্যাপার কখনো আকাঙ্ক্ষা করবে না যেটা হঠাৎ এসে পড়লে তাকে গ্রহণ করবার হিম্মত তোমার নেই। আমি আমার বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী **Dr. Walter Bucknell**-কে এ-বিষয়ে তোমাদের কিছু বলবার জন্য এনেছি।

Bucknell সাহেব বললেন, "বন্ধুরা! ফেয়ারবার্ন তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে প্রায় সব কথাই বলে দিয়েছে। যেটুকু বাকি রেখেছে অথবা যেটুকুর আভাসমাত্র দিয়েছে তা আমি একটি গল্পের মধ্য দিয়ে তোমাদের বলে দিচ্ছি :

"একটি মেয়ে, নিতান্তই একাকী জীবনযাপন করে। বিয়ের বয়স পেরোতে চলল, অথচ একটি ছেলেও তার প্রতি কোনো আগ্রহ দেখায় না, date করে না, dance hall-এ তাকে নাচতে ডাকে না, সে একপাশে পড়েই থাকে। বাড়ি এসে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। একদিন হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখল। দেখল, অতিশয় হ্যান্ডসাম জোয়ান একটি ছেলে তাকে নাচতে ডাকল। অনেকক্ষণ দুজনে প্রাণভরে নাচল। তারপর ছেলেটি তাকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে ডিনার খাওয়াল। তারপরে তাকে ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ করল। আদরে আদরে বিহ্বল করে তার গাউনটি খুলে ফেলে তাকে সোফায় শুইয়ে দিল। তারপর নিজের কোটটা খুলে ফেলল। তারপরে শার্ট, টাই। তারপরে ট্রাউজার্স। তারপরে ছেলেটি তখন আন্ডারওয়্যার খোলার জন্য দড়িতে হাত দিয়েছে, তখন মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, "সর্বনাশ! এ তুমি কী করতে চলেছ?"

ছেলেটি বলল, "কী করতে যাচ্ছি তুমি জানো না? ন্যাকামি করছো? এতদিন ধরে এ ব্যাপারটার জন্যই গুমরে গুমরে মরছিলে না? আমি তো নিমিত্ত মাত্র; After all, this is YOUR DREAM, isn't it?

বিপুল হাস্যরোলের মধ্যে আমরা বিদায় নিলাম। আমাদের পাগলা সাহেব সকলের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে লাগলেন, সমুদ্রগামী জাহাজ যখন বন্দর থেকে আস্তে আস্তে সরে যায়, তখন বন্দরে দাঁড়ানো আত্মীয়রা যেভাবে ডেকে দাঁড়ানো যাত্রীদের প্রতি হাত নেড়ে বিদায় জানায়, সেইভাবে। মুখে সেই বাংলার পাঁচের মতো হাসি, তাতে ক[illegible] একটু কান্না মেশানো ছিল, না সেটা আমার চোখের ভুল?"

কলেজের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়েছি।

এবার ভাগ্যান্বেষণের পালা।

১ রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা) ২ রাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী (ময়মনসিংহ) ৩ জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী (নীরদাকান্তের দাদা) কালীপুর ৪ প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী (আঠারো বাড়ি) ৫ মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (সুষঙ্গ) ৬. ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী (কালীপুর) ৭ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা) ৮ বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী (রংপুর) ৯ কুমার ভূপেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী (জগৎকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র, মুক্তাগাছা) ১০ সারদাকিশোর আচার্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা), ১১ অতুলচন্দ্র ভাদুড়ি (বাঘবেড় ময়মনসিংহ) ১২ হরিদাস আচায চৌধুরী (মুক্তাগাছা) ১৩ সতীশচন্দ্র চৌধুরী (ভবানীপুর জ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরীর দাদা) ১৪ সুরেন সেন (সেনবাড়ি)

একটি দুর্লভ আলোকচিত্র . এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলন (১৯৩৭)-এ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-এব সাথে যৌথ-বাদনে রাধিকামোহন মৈত্র।